হিংসা ও অহিংসা

মৌলিক উপন্যাস

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU HOWRAH

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আর, চ্যাটার্জ্জী
৯১ বি, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—দাম ৩॥০ টাকা—

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
১১নং গোউরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার :—শ্রীবিভূতিভূষণ কয়োড়ী
কয়োড়ী প্রেস
৩ নং মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

পরিচয়

'হিংসা ও অহিংসার' বিষয় বস্তুর একাংশ সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় গল্পাকারে বাহির হয়। তৎকালে প্রগতিশীল কোন নূতন পুস্তক-প্রতিষ্ঠান—মহাকাব্যের (epic) গুণসম্পন্ন কতকগুলি মৌলিক উপন্যাস প্রকাশের পরিকল্পনা করিয়া উপযুক্ত গ্রন্থ খুঁজিতেছিলেন। তাঁহাদের আগ্রহেই গল্পটিকে ধারাবাহিকরূপে মাসিক পত্রে প্রকাশের অপেক্ষায় রাখা হয় নাই—লেখার সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রণের কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু বইখানি প্রকাশিত হইবার পরেই ভারত-রক্ষা-বিধি অনুসারে কাগজ সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তাঁহাদের পরিকল্পনাটি সর্বাংশে সার্থক হইয়া উঠে নাই। তবে উপন্যাসখানি স্বল্প কাল মধ্যে নিঃশেষিত হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য তাগিদ আসিতে থাকে। কিন্তু প্রকাশকদের সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকায় পাঠকবর্গের আগ্রহ চরিতার্থ করিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি স্নেহভাজন অনুজোপম তরুণ কর্মী শ্রীমান্ সৌরেন্দ্রনাথ সুর এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হওয়ায় এবং প্রীতিভাজন পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত রামগতি চট্টোপাধ্যায় বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ১ম ও ২য় খণ্ড পর পর প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বহু-প্রত্যাশিত বইখানির প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৫৩

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্পণ

স্বর্গত সুহৃদ বিশিষ্ট চিত্র-শিল্পী

৺নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্মৃতির উদ্দেশে—

হিংসা ও অহিংসা

পিনাকীলাল ক্রমশই বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রসমাজের কৌতূহল ফেনাইয়া তুলিতেছিল। প্রায় সমবয়স্ক আটত্রিশটি ছেলের মধ্যে সে ছিল সকলের চেয়ে মাথায় খাটো, গায়ের জোরেও সে সবার পিছনে গিয়া পড়িত, রূপের লালিমা তাহাকে দেখিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া টিটকারী দিত ; কিন্তু বিতর্কের সময় এই খর্বাকৃতি ছেলেটি সভাজনের দৃষ্টি এমন ভাবে আকৃষ্ট করিত যে তখন তাহাকে আর পিছনে ফেলিয়া রাখা চলিত না। পিনাকীর চেহারার খর্বতা ও উক্তির উগ্রতা লক্ষ্য করিয়া অ-বাঙ্গালী ছেলেরা বলাবলি করিত—'কীন্ ম্যাজ মাষ্টার্ড !' বাঙ্গালী ছেলেরা বলিত—'মাথায় খাটো হ'লে কি হবে, ঝাঁঝে কিন্তু ধানি লঙ্কা !' ইংরেজ ছেলেরা রুক্ষ স্বরে কহিত—'Beware of Indian tongue-wagger !' পিনাকী তাহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য কান পাতিয়া শুনিত, শুনিয়া মনে মনে খুশীই হইত।

তথাপি ছেলেদের সহিত পিনাকীর বনিবনাও হইত না ; অনেকগুলি কারণে পিনাকীকে তাহারা মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। অধিকাংশ ছেলেই যে-পথ ও মত মানিয়া লইত, পিনাকী তাহার ঠিক উল্টা দিকটা ধরিয়া বিরোধ বাধাইতে চাহিত। কিন্তু বিরোধ-সূত্রে দলপুষ্ট বিরোধীদিগের প্রকৃতি যেই হিংস্র হইয়া উঠিত, পিনাকী-লাল তৎক্ষণাৎ অহিংসার দোহাই দিয়া প্রতিযোগীদের নিকট এমন কায়দায় আত্মসমর্পণ করিত যে, তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

এই সাঁইত্রিশটি প্রতিযোগীর মধ্যে পিনাকীর নিকট সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল সত্যব্রত ব্যানার্জী। বয়স চব্বিশ বছর

পূর্ণ না হইতেই এই ছেলেটি ছয় ফিট লম্বা মাপের ফিতাটির সীমরেখা পার হইয়া গিয়াছিল। তাই বলিয়া তাহার দেহটি প্রস্থকে সঙ্কীর্ণ করিয়া শুধু খাড়া হইয়া ওঠে নাই, বুকের ছাতিটিও সেই অনুপাতে বিস্তৃত ও পুষ্ট হইয়া অঙ্গের সৌষ্ঠবকে সুষ্ঠু ও সুশোভন করিয়া তুলিয়াছিল। সমবয়স্ক ইংরেজ সহপাঠীরাও হাতেকলমে নানা সূত্রেই এই গৌরকান্তি বলিষ্ঠকায় বাঙ্গালী যুবকটির দৈহিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল—টাইগার অফ্ বেঙ্গল।

সুরেন্দ্রনাথ তখন বাঙ্গলার নেতা, ভারতের মুকুটহীন সম্রাট। সেই বৎসরই পুনা-কংগ্রেসে সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়া অগ্নিগর্ভ অভিভাষণে ভারতবাসীর যে দাবী তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার রেশ তখনও ভারতের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; সারা ভারতের জনমত উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ভারত-রাষ্ট্রনায়কের প্রশস্তি গাহিতেছে, বিলাতী সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠাতেও ভারতবর্ষ সংক্রান্ত আলোচনার স্তম্ভটি মিষ্টার এস-এন-ব্যানার্জীর কার্যধারার সবটুকু দখল করিয়া রাখিয়াছে। এ অবস্থায় বিলাতের ছাত্রসমাজ তাহাদের সহপাঠী মিষ্টার এস-বি-ব্যানার্জীকেও ইণ্ডিয়ার বিখ্যাতনামা লিডার মিষ্টার ব্যানার্জীর পরিজন সাব্যস্ত করিয়া লইয়া কত প্রশ্নই করে! মিষ্টার ব্যানার্জী তোমার কে হন? তাঁর প্রাইভেট লাইফটা কি রকম? কোথায় তিনি থাকেন? কি তাঁর প্রিয়? এমনই কত সঙ্গত ও অসঙ্গত প্রশ্ন।

কি ভাবিয়া পিতামাতা সন্তানের নামের আগে 'সত্য' শব্দটির সংযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা উপলব্ধি

করিবার উপায় নাই। কিন্তু নামের সহিত হুবহু ঐক্য রাখিয়া কথা কহিতে সত্যব্রতর কোন আগ্রহই দেখা যাইত না। সুতরাং ভাবত ও ভারতের বিখ্যাত লীডারটির সহিত নিজের একটা কল্পিত যোগসূত্র রচনা করিয়া কত চমকপ্রদ উপাখ্যানই সে ইংরেজ সহপাঠীদিগকে শুনাইয়া চমৎকৃত করিয়া দিত। এ সম্বন্ধে সত্যব্রত তাহার ডাইরীতে এইরূপ কৈফিয়ৎ লিখিয়া রাখিত—'বুদ্ধিমান কল্পিত বিষয়বস্তু সাজাইয়া অপরকে শুনায়, তাহাই গল্প হইয়া দশের মনের খোরাক যোগায়, রচয়িতা যশ পায়, অর্থলাভ করে। আমাব দেশ ও নেতাকে আমিও যদি এইভাবে বাড়িয়ে বিদেশীর কাছে বড় ক'রে দেখাই, সেটা কি অন্যায়, কিংবা দোষের?'

এইখানেই পিনাকীর সহিত সত্যব্রতর ঠোকাঠুকি বাধিত। সে সত্যব্রতর কথার ছিদ্র ধরিয়া তাহাকে বিব্রত ও অপ্রস্তুত করিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইত; প্রতি কথায় প্রতিবাদ তুলিয়া বলিত—প্রমাণ কোথায়? কিন্তু সত্যব্রতও সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবসিদ্ধ কল্পনাশক্তি ফেনাইয়া এমন কায়দায় গল্পের শাখা-প্রশাখা বাহির করিত যে পিনাকীর প্রতিবাদ অধিকাংশ স্থলেই চাপা পড়িয়া বাতিল হইযা যাইত।

কথা গুছাইয়া বলিবার ও বক্তব্য কথায় শ্রোতাদের আস্থা আকর্ষণ করিবার কৌশলটুকু জানিত বলিয়া, সত্যব্রতব সকল কথাই বিদেশী সহপাঠীরা স্বীকার করিয়া লইত। তাহারা বলিত—হবে না কেন, মিষ্টার এস-এন-ব্যানার্জীর নেফিউ ত!

এদিকে পিনাকী দল পাকাইয়া প্রচার করিতে চাহিত, সব বাজে

কথা। আসলে হচ্ছে এ ছোকরা মিষ্টার ব্যানার্জীর এজেণ্ট তাঁকে প্রচার কবছে। মিষ্টার ব্যানার্জী ইণ্ডিয়ার লিডার না ছাই! লীডার হচ্ছে—মিষ্টার গোখ্‌লে।

কথাটা সত্যব্রতর কানে যাইবামাত্রই সে গোখ্‌লের একটা বিখ্যাত বক্তৃতার অংশ সকলকে শুনাইয়া দিল। সবাই তখন জানিতে পারিল যে, মিঃ গোখ্‌লে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর উদ্দেশ্যে মুক্তকণ্ঠে কি প্রশস্তিই গাহিয়াছেন! প্রতিবাদটার পরিণাম যে এমন সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইবে—কেঁচো নামক কৃমি জাতীয় প্রাণীটিকে বাহির করিতে গিয়া সহসা সরীসৃপ-শ্রেণীর জন্তুটি ফণা তুলিয়া দেখা দিবে, পিনাকী তাহা কল্পনাও করে নাই। বাঙ্গলার সম্বন্ধে গোখ্‌লের কথাটা তাহার বুকে যেন বুলেটের মত বিঁধিল।

ইংরেজ সহপাঠীরা পিনাকীর নাম রাখিয়াছিল—'পিনেস্'। পিনাকী কথাটার অর্থ তাহারা বুঝিত না এবং উচ্চারণেও বাধিত কিন্তু পিনেস্ (Pinnace) শব্দটি তাহাদের সুপরিচিত; মধ্যে মধ্যে তাহারা 'পিনেস' বা 'পান্‌সী' চড়িয়া টেম্‌স্ নদীর বুকে পাড়ী দেয়। কাজেই পিনাকী-লালকে পিনেস্ বলিয়া ডাকিতে তাহাদের সুবিধাই হইয়াছে।

টম নামে ছেলেটি বিদ্রূপের সুরে কহিল—মিষ্টার ব্যানার্জীর নজিরটা নিষ্ঠুর হয়ে আমাদের প্রিয়তম পিনেস্‌কে দেখছি বানচাল ক'রে দিলে!

ল্যারেন্স নামে আর একটি ছেলে পিনাকীর পানে তাকাইয়া গোখ্‌লে মহাশয়ের বিখ্যাত উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করিল—**What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow.**

সত্যব্রত এই কথাটা যখন তাহার কথার উপসংহারে বিশেষ

জোর দিয়া সুর করিয়া বলে, মিষ্টার ল্যরেন্স সেটা তাহার খাতায় টুকিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, এখানেও বিরোধটির নিষ্পত্তি হইল না। পিনাকী যতই খর্বাকৃতি হউক এবং তাহার জন্মভূমির অন্তর্গত প্রদেশটি প্রগতি-সম্পর্কে যত তফাতেই পড়িয়া থাকুক, বাঙ্গলাকে সে ভারতের জঞ্জাল বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে এবং এই জঞ্জাল হইতে যাঁহারা জাহীর হইয়া জগতের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করিয়া বসিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করাই ছিল পিনাকীর লক্ষ্য। কিন্তু তাহার এই নিবিড় বিদ্বেষেব মূলে যে বিষয়-বস্তুটি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, তাহা যেমন সে প্রকাশ করিত না, পক্ষান্তরে সেই গূহ্য বিষয়টি আবিষ্কার করিবার জন্য সত্যব্রতর আগ্রহেরও অন্ত ছিল না।

সত্যব্রতর মনটি যে পরিমাণে খোলা ছিল, পিনাকীর মনের ভিতরটা সেই অনুপাতেই চাপা থাকিত। এ সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিতের বিখ্যাত নীতিবাক্যটি সে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিল—মনসা চিন্তিতং কর্ম, বচসা ন প্রকাশয়েৎ।

কিন্তু নানা সূত্রে সত্যব্রতর উপর পিনাকীর বিদ্বেষ ক্রমশই এরূপ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার প্রসঙ্গ উঠিলেই সে সহপাঠীদিগের প্রতি তাকাইয়া বিড় বিড় করিয়া বলিত—মনুমেণ্ট্যাল লায়ার; মিথ্যার পাহাড়!

সত্যব্রতও ইহার পাণ্টা উত্তরে পিকাকীর নামকরণ করিয়াছিল—seeker alter truth—সত্য-সন্ধানী!

হিংসা ও অহিংসা

পিনেসের সম্বন্ধে সত্যব্রতর মুখে এই কথাটিও ইংরেজনন্দনদের বেশ মনে ধরিয়াছিল। ইহার পিছনে একটা কাহিনীও পূর্ব হইতেই রসসৃষ্টি করিয়াছিল। সেটি এইরূপ :

বিলাতের এক বিখ্যাত অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে পলিটিক্স সম্বন্ধে লেকচার দিতেন। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং অকৃতদার। তাঁহার আচরণ ও চালচলনে পাদ্রীসুলভ মনোবৃত্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাইত। সর্বাপেক্ষা তাঁহার বিরাগ ও বিরক্তির বিষয় ছিল রঙ্গালয় ও অভিনেত্রী। ছেলেরা তাঁহার ক্লাসে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা তুলিলে তিনি এরূপ চটিয়া যাইতেন যে, তাঁহাব পদোচিত সংযম তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িত। অতঃপর এই বিষয়টি লইয়া ছেলেদের পরামর্শ ও পরিকল্পনা চলে এবং তাহার ফলে একদা রঙ্গমঞ্চের এক রূপসী অভিনেত্রীর বিচিত্র ভঙ্গিপূর্ণ আলেখ্যটি অধ্যাপক ক্লাসে আসিবার পূর্বেই তাঁহার টেবিলটি দখল করিয়া বসে। উদ্যোক্তারা সে সময়ে ক্লাসের সকল ছাত্রকেই সতর্ক করিয়া দিল—হুসিয়ার, পাদ্রী-সাহেব যতই তম্বী করুক, সবাই বলবে—জানি না কে রেখেছে।

পিনাকীও ক্লাসে ছিল। সত্যব্রত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—ওকে আগে সামলাও, মিষ্টার পিনেস ট্রুথের (truth) এজেণ্ট, ও সব ফাঁশ ক'রে দেবে।

তৎক্ষণাৎ ডজন খানেক লাল মুখ পিনেসের কালো মুখখানার দিকে ঝুঁকিল ; সঙ্গে সঙ্গে হুমকি উঠিল—Beware Pinnace ! সাবধান !

পিনাকী মুখটি বুজাইয়া কান দুটি খাড়া করিয়া সবই শুনিতেছিল ;

এবার মুখ খুলিল, কণ্ঠ হইতে স্বর কঠিনভাবেই বাহির হইল—স্যরী! আই কাণ্ট; ট্রথ ইজ মাই গড—ইজ টু মী দি য়ুনিভারসেল ল্য অফ লাইফ্—সত্য আমার ঈশ্বর, তারই সন্ধানে আমি এসেছি এখানে—মিথ্যা বলব আমি? নেভার!

কিন্তু ছেলেরা পিনাকীর এই সত্যনিষ্ঠার উত্তর দিবার পূর্বেই প্রফেসর ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। উদ্যোক্তারা অমনই প্রসঙ্গটি পরিত্যাগ করিয়া ভালমানুষের মত যে-যাহার স্থানে গিয়া বসিল।

এদিকে প্রফেসর তাঁহার চেয়ারে বসিয়াই তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফাইয়া উঠিলেন। কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার টেবিলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীর তসবীর! আবার যেমন তেমন ছবি নয়—বেহায়া ছুঁড়ীটা অঙ্গ দুলাইয়া লাস্যলীলা দেখাইতেছে! কি স্পর্দ্ধা!

তর্জনের সুরে প্রশ্ন করিলেন—কে করেছে এ কাজ? কে এনেছে এ ছবি? কে এখানে রেখেছে?

ছেলেরা চুপ, কাহারও মুখে কথা নাই, সমস্ত ক্লাস স্তব্ধ কেবল পিনাকী নির্দিষ্টভাবে তাহার উদ্দেশ্যে পরবর্তী প্রশ্ন ও সেই সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সুযোগটির প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহার ভাবভঙ্গিতে ইহাই ঈষৎ প্রকাশ পাইতেছিল।

কণ্ঠের স্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া অধ্যাপক কহিলেন—প্রকৃত দোষীকে আমি তোমাদের ভেতর থেকে টেনে বের করবই।

তাহার পর তিনি ছেলেদের দিকে চাহিয়া এক এক জনকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—তুমি জানো? তুমি? তুমি—

একে একে সকলেই উত্তর দিল—জানি না স্যর!

কিন্তু সত্য প্রকাশ করিবার জন্য সত্যাশ্রয়ী পিনাকী এতক্ষণ চুলবুল করিতেছিল। এবার আসিল তাহার পালা।

পিনাকী অমনই তড়াক করিয়া জবাব দিতে উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর এক অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া তাহার সত্য প্রকাশের পথে বিষম বাধার সৃষ্টি করিল।

'হ্যাঁ' কথাটি বলিবার জন্য যেমন পিনাকী হাঁ করিয়াছে এবং তাহার দুইটি কোটরগত চক্ষু অদূরবর্তী সহপাঠীদের দিকে বিস্ফারিত হইয়াছে, অমনই তাহাদের যুগপৎ শাসানি সেই মুহূর্তেই তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল। সামনের বেঞ্চখানিব লালমুখ ছেলেগুলি অধ্যাপকেব পিছন হইতে শুধুই যে তাহাকে চোখ রাঙাইয়া শাসাইতেছিল—তাহা নহে, পরন্তু সত্য প্রকাশ করিলেই যে তাহারাও সহিংস্র অভিযান করিয়া প্রতিশোধ তুলিবে—হাতে-কলমেই তাহা দেখাইতেছিল। ঘুসী বাগাইয়া, ছুরীকে ছোরার মত ভাঁজিয়া, অটোমেটিক রিভলভারের চকচকে নলিটি নিশানা করিয়া তাহারা সত্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার যে নির্দেশ দিল, তাহাতে পিনাকী মুখটি বুজাইয়া ও দুই চক্ষু মুদিত করিয়া ধুপ করিয়া নিজের সীটে বসিয়া পড়িল। হায়, সত্যসন্ধানী পিনাকীর চক্ষুর উপর সত্য এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা দিতে আসিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য পিনাকী হিংসার ভয়ে তাহাকে ধরিতে পারিল না; অবাক-বিস্ময়েই সে সত্যের এই লাঞ্ছনা দেখিল! পিনাকীব পরবর্তী জীবনে অনুরূপ ঘটনা আরও কতবারই ঘটিয়াছে! পাঠক-পাঠিকাগণ ধৈর্য-সহকারে এই আখ্যায়িকাটির অনুসরণ করিলে সে সকল চিত্র-রেখাও তাঁহাদিগের চক্ষুর উপর প্রতিফলিত হইবে।

হিংসা ও অহিংসা

সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে এই ছেলেটির উপর অধ্যাপকের বিশেষ আস্থা ছিল। অবশেষে ইহাকেও ঝাঁকে মিশিতে দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে অপরাধী আবিষ্কারের দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দুর্নীতির প্রভাব সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা খাড়া করিতে হইল। বলা বাহুল্য, ছেলেরা ইতিমধ্যেই অভাগিনী অভিনেত্রীর আলেখ্যটি টেবিল হইতে তুলিয়া অধ্যাপকের সীটের পশ্চাতে হ্যাট-র্যাকে ঝোলানো টুপীটির ভিতর অতি সন্তর্পণেই চালাইয়া দিয়াছিল।

এই অধ্যাপকের পিরিয়ড শেষ হইবার পর ছেলেরা পিনাকীকে লইয়া পড়িল। কিন্তু পিনাকী দমিল না। সে বেশ গম্ভীরভাবেই কহিল—অহিংসাও ঈশ্বরের আর একটা রূপ; পেছন থেকে হিংসা কামড়াবার জন্যে মুখ বাড়াচ্ছে দেখে মুখ আর খুললুম না, চুপ ক'রেই গেলুম।

সত্যব্রত কহিল—কথাটার মানে কিছু বুঝতে পারলুম না।

পিনকী কহিল- মানে খুবই সোজা; আমি যদি অধ্যাপকের কাছে কথাটা স্বীকার করতুম, ক্লাসশুদ্ধ তোমাদের সবারই সাজা হত; তার মানেই হিংসা প্রশ্রয় পেতো। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে জানিয়ে দিলেন, সেটা ঠিক নয়। তাই দিলুম তখনই হিংসাকে গলাধাক্কা; জয় হ'ল অহিংসার। অধ্যাপকের সামনে মুখ বুজিয়েছিলুম ঐ জন্যই; তোমাদের ঘুসী দেখে নয়, ছুরিছোরার জন্যও নয়, রিভলভারের গুলীর ভয়েও নয়।

পিনাকীর যুক্তি শুনিয়া ছেলের দল একেবারে অবাক। তাহারা স্বীকার করিল—হ্যাঁ, এ একটা লজিক বটে।

হিংসা ও অহিংসা

সত্যব্রতই কেবল অধ্যাপকের মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল—আমার মতে, কতকটা ম্যাজিক।

ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পিনাকী দুই চক্ষু পাকাইয়া সত্যব্রতর দিকে চাহিয়া কহিল--বাঙ্গালী জাতটাই ম্যাজিসিয়ান।

সত্যব্রত পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবেই জানাইল—শুধু তাই নয়, রীতিমত লজিসিয়ান ; তাই আসল-নকল চেনে, ম্যাজিক দেখে চমকায় না।

পিনাকী তখন রুদ্ধরোষে ভবিষ্যদ্বাণী করিল—একদিন চমকাবে।

এবার সত্যব্রতের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিল, মৃদুস্বরে উত্তর দিল—দেখা যাবে।

*　　*
*

ইহার পরও সত্য এবং অহিংসা সম্পর্কে কতবারই কত আলোচনা ও বিতর্ক হইয়াছে। ঈশ্বরের এই দুইটি আসল রূপের ওকালতি করিয়া পিনাকী ছেলেদিগকে কত নূতন কথাই শুনাইয়া তাক লাগাইয়া দিতে চাহিয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এইটুকু যে সত্যব্রত কোনও দিনই তাহাতে অভিভূত হয় নাই এবং পিনাকীর নূতন নূতন কথায় শুধু সে সায় না দেওয়াতেই ছেলেরা সেগুলি স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধে যে তথ্যটি পিনাকী নূতন বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াস পাইত, সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রতিবাদ তুলিয়া বলিত—বাঙ্গলার ম্যাজিসিয়ানরা পাঁচশো বছর আগেই এ সব কথা বলে গেছেন। শুধু মুখের কথা নয়, সত্যব্রত প্রমাণ পর্যন্ত দাখিল করিবার দাবী জানাইত।

কিন্তু পিনাকী উপেক্ষার ভঙ্গিতে হাসিয়া তর্কের গতি রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর দিত—সত্য ও অহিংসার রূপ মিথ্যাবাদীর যুক্তির বাতাসে আকাশে মিশে যায় না।

অন্যান্য ছেলেরা সেদিন তর্কের উপসংহারটি দেখিয়া হতাশ হইয়াই বলিল—জবাবটা কিন্তু ঠিক হ'ল না মিষ্টার পিনেস্! ব্যানার্জী বলেছেন, তোমার কথাগুলো সব চুরি করা, আর চুরি করেছ ব্যানার্জীর দেশ বেঙ্গল থেকেই।

টম নামে দুর্মুখ ছেলেটি কথাটায় সায় দিয়া খোলাখুলি ভাবেই কহিল—অর্থাৎ তুমি বাঙ্গালীর পকেট মেরে, যে বস্তুটি নিজের পকেটে পূরেছ, সেইটিই একটু বদলে-সোদলে আমাদের চোখের ওপর তুলে তাক্ লাগাতে চাইছ!

পিনাকীর দুইটি চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে তাহার মুখ দিয়া যে জ্বালাময় কথাটা সশব্দে বাহির হইয়া আসিল, তাহার তাপটা কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই, এমন কি ইংরাজ ছেলেরা পর্যন্ত। টমের কথাটার উত্তরে সে খপ করিয়া বলিয়া ফেলিল—সত্য ও অহিংসা যার অন্তরে নেই, তার কোন পকেটই থাকতে পারে না।

আরউইন নামে নিরীহ প্রকৃতির একটি ছেলে সত্যব্রতর দিকে সকৌতুকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল—শুনছ মিষ্টার ব্যানার্জী, কত বড় লজিকের কথা মিষ্টার পিনেস্ শুনিয়ে দিলে!

হেন্‌রী নামে ছেলেটি পিনাকীর উদ্দেশে প্রশ্ন করিল—তা হ'লে কথাটার মানে কি বুঝব?

পিনাকী গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—ম্যাকলে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় মানেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন ; এর ওপর আর কথা নেই।

সকলেই সত্যব্রতর দিকে চাহিল। কিন্তু এই সাংঘাতিক কথাটা যে তাহাকে কিছুমাত্র আঘাত দিয়াছে, তাহা বুঝা গেল না। অবিচলিত কণ্ঠেই সে কহিল—কথা একটু আছে। মৌমাছি ফুলের ভেতরে ঢুকে সত্যের সন্ধান করে, শকুনী পচা মড়ার ওপর পড়ে ঠোঁটের ঠোকর দিয়ে সত্য খোঁজে, কুকুর হাড় চিবিয়ে সত্য বা'র করে, মাছিগুলো শুকনো ঘায়ের ওপর মুখ ঘ'সে চাপা সত্যকে খুঁচিয়ে তোলে ' যদিও এদের রূপ আলাদা, কিন্তু মনোবৃত্তি এক ; কোন তফাত নেই ; সবাই সত্যের সন্ধানী—অর্থাৎ seeker after the truth.

টম কহিল—তা হ'লে তুমি বলতে চাইছ মিষ্টার ব্যানার্জী, ঐ কয়টি প্রাণীর সম্মিলিত সংস্করণ হচ্ছেন আমাদের পিনেস্ ?

সত্যব্রত কহিল—বড় দুঃখেই আমাকে বলতে হচ্ছে, এই মনোবৃত্তি নিয়েই মিষ্টার পিনেস যদি ভারতবর্ষে ফিরে যায়, আর সেখানে ওর এই মনগড়া সত্যটিকে প্রচার করে, তা হ'লে এমন সর্বনাশ ভারতবর্ষের হবে—মধ্য-যুগের জেঙ্গিস খাঁ, নাদীর শাহ্, কালাপাহাড় প্রভৃতির আমলেও তেমনটি হয় নি, আর এ যুগে বৃটিশ কনজারভেটিভ পার্টি তার ধারে এখনো যায় নি !

ক্লেভারিং নামে একটি ভারতবিদ্বেষী ছেলে উৎসাহের স্বরে কহিল—তা হ'লে মিষ্টার পিনেসের উচিত অতি সত্বরই সিবিলিয়ানে হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

কিন্তু যাহাকে লইয়া কথা চলিয়াছিল, সে তখন পাস কাটাইয়া

বুদ্ধিমানের মত স্থান ত্যাগ করিয়াছে। পিনাকী ভাবিয়াছিল, সত্যব্রত আজ রীতিমতই ঘায়েল হইয়াছে, সে আর মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করিবে না। কিন্তু নিদারুণ আঘাত পাইয়াও আজ যেরূপ ধীরতার সহিত সে এক সাংঘাতিক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া বসিল এবং তাহা এমনই অব্যর্থভাবে পিনাকীর মর্মস্থলে আসিয়া বিঁধিল যে, তাহার আর টুঁ শব্দটি কবিবারও উপাব ছিল না।

এদিনের দ্বন্দ্বের পরিণতি যাহাই হউক, সত্যব্রতর আবিষ্কৃত নামটি কিন্তু প্রত্যেকরই প্রীতিপদ হইয়াছিল। এমন কি, পিনাকীও তাহা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রতি সায়াহ্নে লোকচক্ষুর অন্তরালে শহরের নিভৃত অংশে সহপাঠীদের অজ্ঞাত এক কক্ষে সংগোপনে ও অতি সন্তর্পণে যখন সে রোজ-নামচা লিখিত, এদিনের ঘটনাটির বিবরণ তাহাতে এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল :—উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে যদিও সত্যব্রত আমার সাংঘাতিক অন্তরায়, তথাপি আমি তাহার দূরদৃষ্টির তারিফ করিতেছি। তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক।

যে সময়ের চিত্র আমরা আঁকিতে বসিয়াছি, তখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ অথবা প্রাদেশিকতা নামক সমস্যাটির ছায়াও বিশাল ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কোন অংশেই পড়ে নাই; অথচ ভারতের বাহিরে বারণার্ড ষ্ট্রীটের একটি মেসেব মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের অগোচরে ইহা ধোঁয়ার আকারে কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল। ভারতবর্ষে বসিয়া যে সকল মনীষী সে সময় বৃটিশ সরকারের নিকট দৃপ্তকণ্ঠে ভারতের দাবী ঘোষণা করিতেছিলেন, তাঁহারা তখন কল্পনাও করেন নাই

যে, তাঁহাদের অজ্ঞাতে বৃটিশ রাজধানীর বুকে বসিয়া ভারতের এক সুবিধাবাদী সুসন্তান অদ্ভুত পরিকল্পনায় যে ধূম্রজাল রচনা করিতেছে তাহাই একদিন নিবিড় মেঘে পরিণত হইবে এবং সেই মেঘনিঃসৃত বজ্রই তাঁহাদের কঠোর সাধনাবদ্ধ একতা ও সদ্ভাব ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে!

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে বারণার্ড ষ্ট্রীটের 'ইণ্ডিয়া কটেজ'টি তখন এমনই সুপরিচিত ও প্রশংসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভারতীয় ছাত্রদিগের অভিভাবকগণ বিলাতী মেলের টিকিট কিনিবার পূর্বেই এই কটেজের স্বত্বাধিকারিণী মিসেস ফ্লাওয়ার এলায়েব সহিত ছেলেদের অবস্থিতি সম্বন্ধে কথাবার্তা পাকা করিয়া ফেলিতেন। আহার সম্পর্কে ছেলের রুচি ও অভ্যাস, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে খুটিনাটি সব কথাই চিঠিতে অভিভাবকগণ খুলিয়া লিখিতেন। ছেলে যথাসময় লণ্ডনে পৌঁছাইয়া এবং ইণ্ডিয়া কটেজে আশ্রয় লইয়া আনন্দ সহকারেই চিঠিতে লিখিত যে, ব্যবস্থার কোন নড়-চড় হয় নাই, বাড়ীর সুখ-সুবিধাই সেখানে পাইয়াছে, সুতরাং পরিজনদের চিন্তা বা উদ্বেগের কোন কারণ নাই।

ইণ্ডিয়া কটেজের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য এবং এই জন্যই ভারতীয় ছাত্রগণ এখানে ঢুকিবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইত। ভারতীয় ছাত্র ব্যতীত কতকগুলি ইংরেজ ছাত্রও এই কটেজে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। এই সকল ছাত্রের অভিভাকগণ বিলাতের বনেদী বড়লোক ও অভিজাতবংশীয় হইলেও এই উদ্দেশ্যে ছেলেদিগকে ইণ্ডিয়া কটেজের আবেষ্টনে রাখিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ছাত্রদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা

ও সাহচর্য্যের ফলে তাহারা ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিগত ভাবধারার সহিত পারিচিত হইবার সুযোগ পাইবে;—সিবিল সার্ভিসে সাফল্যের তিলক পরিয়া ভারতবর্ষে কর্মক্ষেত্র রচনা করাই ইহাদের লক্ষ্য ছিল।

মিসেস ফ্লাণ্ডার্স এলাই নিজের নিখুঁত ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানে এই কটেজটি এমন শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতেন যে, ইংরেজ বা ভারতীয় ছেলেদের মধ্যে অভিযোগ তুলিবার কোন অজুহত কখনই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইত না। মিসেস ফ্লাণ্ডার্স ফরাসী দেশের মেয়ে, ইহার স্বামী ছিলেন ইংরেজ, খাস লণ্ডনের বাসিন্দা, কিন্তু ইঁহাদেব দাম্পত্য জীবনের অধিকাংশকাল ভারতবর্ষেই অতিবাহিত হয়। বিলাতের কোন বিখ্যাত সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট এজেণ্ট রূপে মিষ্টার ফ্লাণ্ডার্স এলাই সস্ত্রীক ভারতবর্ষে প্রবাস-জীবন যাপন করেন। ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে তাঁহাদিগকে অবস্থিতি করিতে হইত, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির সহিত বর্ম্মসূত্রে তাঁহাদের মিলিবারও প্রচুর সুযোগ-সুবিধা ছিল। ভারতবর্ষেই ফ্লাণ্ডার্স-দম্পতির একমাত্র কন্যা এলিজাবেথে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানেই মিষ্টার ফ্লাণ্ডার্স শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। কন্যা এলিজাবেথ তখন দশ বছরের বালিকা। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস ফ্লাণ্ডার্স বিলাতে ফিরিয়া আসেন এবং মাথা খেলাইয়া ভরতবর্ষের সহিত তাঁহাদিগের কর্মস্মৃতি বজায় রাখিতে ইণ্ডিয়া কটেজ খুলিয়া বসেন। ইনিই এই কটেজটির সর্বময়ী কর্ত্রী এবং সর্ব্বজনপ্রশংসিতা ল্যাণ্ড-লেডী। যে আটত্রিশটি ছেলের কথা আমরা গোড়াতেই বলিয়াছি, তাহারা সকলেই এই কটেজে মিসেস ফ্লাণ্ডাসের তত্ত্বাবধান ও

নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া সন্নিহিত বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে পড়াশুনা করিতেছিল।

ইণ্ডিয়া কটেজে থাকিয়া প্রত্যেক ছেলেই যে বাড়ীর সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মিসেস ফ্লাণ্ডার্স প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রীতিনীতির সহিত আধুনিকতার লোভনীয় পদ্ধতির সংযোগ করিয়া এমন কতকগুলি ব্যবস্থা এখানে চালু করিয়াছিলেন যে, ছেলেদের নিকট তাহা অত্যন্ত প্রীতিকর ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

একটা প্রকাণ্ড হলে পাশাপাশি টেবিলে একসঙ্গে এই ছেলেগুলির ভোজনের ব্যবস্থা, নিত্য নূতন ভোজ্যের তালিকা এবং তরুণ ভোজন-কারীদের রুচি-অনুযায়ী গান বাজনার সহিত নানারূপ আলোচনা— ছেলেদিগকে উল্লাসমুখর করিয়া তুলিত। মিসেস ফ্লাণ্ডার্স সময় সময় নিজেও আলোচনায় যোগ দিতেন এবং ভারতবর্ষ সংক্রান্ত তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ নানাবিধ চমকপ্রদ কথা ও কাহিনী ছেলেদের খুবই উপভোগ্য হইত।

ছেলেদের আর একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল—মিসেস ফ্লাণ্ডার্সের কিশোরী কন্যা মিস্ ফ্লাণ্ডার্স এলাইয়ের সাহচর্য। মেয়েটির নীল চক্ষু, একরাশি সোণার বরণ চুল ও নিখুঁত সুন্দর মুখের একটানা হাসি ছেলেদিগকে নিরতিশয় আনন্দ দিত। ভারতবর্ষের মেয়েদের বয়সের অনুপাতে অসঙ্কোচেই তাহাকে কিশোরী বা তরুণী বলা চলে, কিন্তু প্রতীচ্যের মাপকাঠিতে সে এখনও বালিকা মাত্র। চৌদ্দ-পনেরো বছরের কোন মেয়েকে এদেশে কেহ যুবতীর পর্যায়ে ফেলিলে তাহাকে জনসমাজে উপহাসের পাত্র হইতে হয়। আমাদের

পিনাকীলালও এই মেয়েটির সম্বন্ধে এইরূপ একটা ভুল করিয়া যে কাণ্ড বাধাইয়া বসে, সেটিও তাহার প্রবাস-জীবনের আখ্যায়িকাটিকে সরস ও উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে এবং এই চিত্রটির উপর মিস্ এলাইয়ের প্রভাবও বড় অল্প নহে।

এই মেয়েটি প্রজাপতিটির মত সাজিয়া গুজিয়া ছেলেদের সহিত অবাধ মেলা-মেশা করিত; ছেলেরাও তাহাব সহিত হাসি, ঠাট্টা, কথা-কাটাকাটি ও হুল্লোড় করিতে ছাড়িত না। মেয়ের মা এ সব দেখিয়া শুনিয়াও উপেক্ষা করিয়া বা এড়াইয়া যাইতেন। বিলাতের দৃষ্টিতে নিজের সুন্দরী মেয়েটিকে তিনি নাবালিকার পর্যায়ে ফেলিয়া রাখিলেও তাহাব জন্মস্থান যে ভারতবর্ষ এবং জীবনের অধিকাংশকালটুকু সেই রৌদ্রতপ্ত দেশটিতে কাটাইয়া সে যে অতিরিক্ত চতুর ও কথা-বার্তায় এঁচোড়ে পাকিয়া (Prodigy) হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না বা এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তাঁহার চিত্তপটে কোনরূপ সংশয়ের আঁচড়ও টানিত না। বরং ইহাদের ক্রীড়া-কৌতুকের উচ্ছ্বাস ও চটুল হাস্যপরিহাস তিনি সকৌতুকেই উপভোগ করিতেন।

প্রথম হইতেই মিস এলাইকে দেখিয়া পিনাকীর কি লজ্জা! এই মেয়েটিকে দেখিলেই সে কেঁচোর মত কুঁচকাইয়া পড়িত; চোখো-চোখী হইলে সে বুঝি মুখখানাকে নত করিয়া মেঝের কার্পেটটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে চাহিত। ইহাতে অবশ্য পিনাকীকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। কেন না, ভারতের যে প্রদেশটির সে অধিবাসী, সেখানে কন্যার বয়স আট পার হইলেই তাহাকে বধূর মর্য্যাদা লইয়া স্বামীগৃহে

প্রবেশ করিতে হয়। পিনাকীও এমনই এক বধূর সহিত দাম্পত্য-বন্ধন দৃঢ় করিয়া তাহাকে পিতার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিয়াছে; তাহার বয়স এখনও নয় বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এ অবস্থায় পঞ্চদশী কন্যার অবাধ সাহচর্য কেমন করিয়া সে বরদাস্ত করিবে ?

কিন্তু তাহার এই লজ্জাচ্ছন্ন অবস্থা ছেলেদের দৃষ্টি এড়াইত না, মিস্ এলাইয়েরও নয়। তাহাদের চোখে-চোখে বিদ্যুৎ খেলিত এবং কাঁচা মাথাগুলির মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি জাল পাকাইতে থাকিত।

মিস্ এলাই ভোজের টেবিলে যেই কোন কিছু খাদ্য পরিবেষন করিতে আসে, অন্যান্য ছেলেদের মুখে তখন কত কলরবই ওঠে, তাহার হাতের খাদ্য লইতে কাড়াকাড়ি কাণ্ড পড়িয়া যায়। ঘটনাচক্রে এই রকম এক কাণ্ডের মধ্যেই একদা এক অবাককাণ্ড ঘটিয়া গেল। অবশ্য তাগার সহিত একটা পূর্বরচিত চক্রান্তও ছিল।

দলের মধ্যে পিনাকীই একমাত্র নিরামিষ ভোজী এবং তাহার টেবিলটি পংক্তির শেষে একটু অলাদাভাবেই থাকিত। এই টেবিলে বসিয়া সেদিন পিনাকী মুখখানা নিচু করিয়াই অধিকাংশ সময় খাইতেছিল। হঠাৎ সে সুযোগমত অতি সন্তর্পণে একটী চক্ষু তুলিয়া ও তাহা একটু বাঁকাইয়া মিস্ এলাইয়ের ফুলের মত মুখখানি ও সোনালি রঙ্গের ছড়ানো চুলগুলির শোভাটুকু টুক্ করিয়া দেখিয়া লইল। কিন্তু এমনই পিনাকীর দুর্ভাগ্য, তাহার এই লুকোচুরি মেয়েটির চোখে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া এবং মনে মনে কি একটা মতলব ঠিক করিয়া রন্ধন-শালার দিকে ছুটিল।

হিংসা ও অহিংসা

পিনাকী এই ফুরসতে মুখখানা তুলিয়া ও অতিশয় গম্ভীর করিয়া চাপা কণ্ঠে তজন তুলিল—ভারী অন্যায়।

ছেলেদের ভিতর হইতে সত্যব্রতই প্রথমে প্রশ্ন করিল—কিসে ?

পূর্ববৎ চাপাকণ্ঠে পিনাকী নির্দেশ দিল—তুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

টম দুই চক্ষু পাকাইয়া প্রশ্ন করিল—তুর্নীতিটা কি ?

পিনাকী জানাইল—সাইত্রিশটা রোমিও একটা জুলিয়েটকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে, এটা তুর্নীতি নয় ?

উত্তেজনার দমকে পিনাকী এবার কণ্ঠে জোর দিয়াই কথাগুলি বলিল, কাজেই ভেজিটেবল চপের ডিস লইয়া মিস এলাই প্রবেশ করিতেই তাহার কানে মোটরের হর্নের মতই কথাগুলি বাজিয়াছিল। হলে ঢুকিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ বিখ্যাত অভিনেতা স্যার বীরভূম ট্রির অভিনয়-ভঙ্গি ও আবৃত্তির নকল করিয়া কহিল—এ ডেনিয়েল্ হ্যাজ ক্যাম্ টু জাজমেণ্ট !

টমও সঙ্গে সঙ্গে কহিল—জুলিয়েট টু প্রেজেণ্ট !

এলাইকে দেখিবামাত্রই পিনাকীর উত্তেজনাপূর্ণ মুখখানি একনিমেষে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল এবং সামনের ডিসখানার উপর সে এমনই ঝুঁকিয়া পড়িল যে মিস্ এলাই তাহার সামনে আসিয়া হাতের ভোজ্য-বস্তুটি পিনাকীর ডিসে চালান করিবার কোন রাস্তাই পাইল না। তখন সেও এক কাণ্ড করিয়া বসিল ; ডিসের বস্তুটি পিনাকীর ডিসে দিতে গিয়া পিনাকীর মাথার উপরেই পড়িয়া গেল। উক্ত ভোজ্যবস্তুটি

সদ্যভজিত অবস্থায় ডিসে উঠিয়াছিল; সুতরাং সহসা একটা উত্তাপ অনুভব করিয়া পিনাকী এমনভাবে লাফাইয়া উঠিল যে, এলায়ের হাতের ডিসখানা ঠিকরাইয়া টেবিলের মাঝখানে গিয়া পড়িল এবং তাহার চিংকটির সহিত পিনাকীর টিকোলো নাসিকার নিদারুণ সংঘর্ষ রীতিমত একটা রোম্যান্সের সৃষ্টি করিল।

এমন বিপদে পিনাকী বুঝি আর কখনও পড়ে নাই। আসল ব্যাপারটি ত সে জানিতে পারে নাই। যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া লইয়া সে ক্ষণকাল পুতুলের মতই খাড়া হইয়া রহিল। একে নারীর অঙ্গের সহিত তাহার নাসিকার প্রচণ্ড সংঘর্ষ, আবার সেই নারী তখনও প্রায় তাহার বক্ষলগ্ন হইয়াই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে! এখন সে কি করিবে?

টেবিল হইতে একাধিক কণ্ঠের স্বর হাসিয়া উঠিল—কলিশ্যন বিটুইন পিনেস অ্যাণ্ড এলাই!

এলাই তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কহিল—নো; কলিশ্যন বিটুইন রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট!

পিনাকী এবার মুখখানি তুলিয়া এবং মনে ও কণ্ঠে প্রচুর শক্তি সঞ্চার করিয়া কহিল—স্যরি, মিস্ ব্যাটারফ্লাই!

হো-হো করিয়া ছেলেরা এবার হাসিয়া উঠিল। সত্যব্রত কহিল—পিনাকী আমাদের জিনিয়াস, কে বলে ও পাদ্রী সাহেব, আসলে বর্ণচোরা আম, ভেতরটা রসে ভরপুর।

ভবানীশঙ্কর নামে এক মারাঠি ছেলে কহিল—তা হ'লে মিস্ এলাই আজ থেকে হলেন ব্যাটারফ্লাই?

টম এলায়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—মিস্, তুমি রাজী? নূতন নামটা স্বীকার ক'রে নিচ্ছ ত?

মিস্ এলাই কহিল—নিশ্চয়ই; আমাদের ভেতর এতদিন ছিল আড়ি, আজ থেকে ভাব হয়ে গেল। এব পর আপনারা আমাকে মিস্ এলাই-এর বদলে মিস্ ব্যাটারফ্লাই ব'লেই ডাকবেন।

সত্যব্রত কহিল—তাতে আমাদেব কোন আপত্তি নেই, যদিও এই লম্বা নামটা ডাকতে সেকেণ্ড তুই সময়ের অপব্যয় হবে, তা হোক; মিষ্টার পিনাকীর জন্য আমরা এই কষ্টটুকু স্বীকার করব।

অন্যান্য ছেলেরাও কথাটার সমর্থন করিল।

সত্যব্রত পুনরায় কহিল—কিন্তু মিস্ ব্যাটারফ্লাই, মিষ্টার পিনাকীব চপখানা যে মাঠেই মারা গেল!

মিস কহিল—যেতে দিন ওখানা। এরপরও আর ওঁকে অমন আলাদা হতে দিচ্ছি কি না! এই দেখুন না কি করি—·

কথার সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরের এক ধারে একটা মারবেল পাথরের টিপয়ের উপর ডিসেভরা যে সব ভোজ্য ছিল, মিস্ এলাই তাড়াতাড়ি সেখান হইতে খান কয়েক চপ আনিয়া পিনাকীর ডিসের উপর রাখিল ও খপ করিয়া তাহার হাতখানা টানিয়া কহিল—বসুন, খেতে হবে।

পিনাকী সেই যে উঠিয়াছিল—এ পর্যন্ত বসে নাই। পুনরায় তাহার হাতে নারীর হাতের পরশ, মধুর আহ্বান। অভিভূতের মত পিনাকী তাহার আসনে বসিল বটে, কিন্তু মৃদু স্বরে আপত্তি তুলিল—খাবার আর ইচ্ছা নেই।

হিংসা ও অহিংসা

এলাই কহিল—খেতেই হবে, নইলে মা রাগ করবে; আপনি কি শেষে আমাকে সবার সামনে বকুনি খাইয়ে কষ্ট দিতে চান?

পিনাকীর সারা অন্তরটি বুঝি অমনি টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল; আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—কারুর মনে কষ্ট দেওয়া মানে হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া! আমি অহিংসার উপাসক—তা পারি না। আচ্ছা, না হয় খাচ্ছি।

তিনখানা চপ পিনাকী কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিঃশেষ করিল।

এবার পিনাকীব ব্যাটারফ্লাই মুচকি হাসিয়া কহিল—হিংসাকে আজ থেকে আপনি ইণ্ডিয়া কটেজ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমার মা-ও বেঁচে গেলেন, তাঁর একটা ভয়ঙ্কর কষ্ট ও অসুবিধা কেটে গেল।

কথাগুলির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পিনাকী মেয়েটির হাসিভরা মুখখানির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল।

মিস্ এলাই অর্থটা পরিষ্কার করিয়া দিতে বলিল—কাল থেকে মাকে আর ভিজেটেবল ডিস্ সাজাতে হবে না।

—কেন? আমি যখন ভেজিটেরিয়্যান—

—কিন্তু ঐ ভেজিটেবল চপখানার দুর্গতি দেখে তিনখানা মাছের চপ এনে আপনার ডিসে দিয়েছিলুম, তা বুঝি টের পান নি?

—মাছের চপ? আমার ডিসে? মছ্‌লী? বাঙ্গালীরা যে চীজ তারিফ ক'রে খায়? কি সর্ব্বনাশ!

—বা-রে! আপনিও ত তারিফ করে খেলেন, আর খেয়ে যে খুশী হয়েছেন, আপনার মুখ দেখেই তা বোঝা গেছে!

—কাজটা ভারি অন্যায় হয়েছে, আমি মিসেস ফ্লাণ্ডার্সের কাছে নালিশ করব।

হিংসা ও অহিংসা

মুখখানি ম্লান করিয়া এলাই কহিল—তার মানে, মায়ের কাছে আপনি আমাকে বকুনি খাওয়াবেন, এই ত? কিন্তু এই বয়সে মেয়েরা বকুনি খেলে কি করে তা বোধ হয় আপনার জানা নেই?

পিনাকী নির্বাক দৃষ্টিতে মেয়েটির ম্লান মুখখানির দিকে চাহিল, অমনি তাহার ছলছল চোখদুটির সহিত পিনাকীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টির সংযোগ ঘটিল। এলাই তাহার কণ্ঠের স্বর গাঢ় করিয়া কহিল—মার কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবার আগে আপনি আমাকে খানিকটা পটাসিয়াম সায়োনাইড আনিয়ে দেবেন; এইটুকুই আমার রিকোয়েষ্ট।

সভয় বিস্ময়ে পিনাকী কহিল—সর্বনাশ! অন্যের ওপর রাগ ক'রে আপনি হিংসাকে প্রশ্রয় দেবেন? আপনার আত্মাকে হত্যা করবেন?

মিস্ এলাই কহিল—এ ছাড়া আর উপায় কি?

পিনাকী দৃঢ়স্বরে কহিল—উপায় আছে। হিংসাকে ঠেকাবার জন্য আমি করব আত্মত্যাগ, আপনাকে আত্মহত্যা করতে হবে না। অহিংসার খাতিরে আমার আহার সম্বন্ধে যা-কিছু বিধিনিষেধ, আজ থেকেই আমি সে সব তুলে দিলুম।

ছেলেরা উল্লাসের সুরে সমস্বরে কহিয়া উঠিল—ব্রাভো! Birds of a feather flock together.

পিনাকী ভাবিল, তাহার এই আত্মত্যাগে অহিংসার জয় হইল। ছেলেরা জানিল, তাহাদের চক্রান্তই জয়যুক্ত হইল।

*   *

*

পিনাকীলালের যে পরিচয়টুকু এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ তাহার তরুণ চিত্তটির অধিকাংশ স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সত্যব্রতর সহিত মনোমালিন্য বা প্রতিযোগিতা যে এই বিদ্বেষের মুলতত্ত্ব নয়, তাহা জোর করিয়া বলা যায় ; কেন না, এই সাংঘাতিক বিদ্বেষটিকে পাথেয় করিয়া পিনাকীলাল যেদিন ইণ্ডিয়া কটেজে পদার্পণ করে, সত্যব্রতের সহিত তখনও তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় নাই। সুতরাং এই বিদ্বেষের মূলে যে একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে এবং সেই সূত্রেই যে পিনাকীলাল তাহার সহপাঠী সত্যব্রতকে উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালী জাতির উপর তাহার অন্তর্নিহিত বিষধারা উদ্গীরণ করিয়া থাকে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইণ্ডিয়া কটেজের ছেলেগুলি এ-সম্বন্ধে কিছুমাত্র সচেতন ছিল না, এমন কি সত্যব্রতও নয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই ধারণা, বিদ্বেষটি ব্যক্তিগত, ইহার মুলে সত্যব্রতর প্রতি পিনাকীর নিদারুণ ঈর্ষা। কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যে মারাত্মক অস্ত্রের মত সাংঘাতিক হইয়া একটা জাতির বিরুদ্ধে উঠিতে পারে—স্বাধীন দেশের সাহসী ছেলেগুলির পক্ষে তাহা কল্পনাতীত। সত্যব্রতও সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিত—পিনাকীর এ দৌরাত্ম্য কেন? বাঙ্গালী সত্যব্রতের সহিত সে বাঙ্গালী জাতিকে আঘাত দিতে

এরূপ আগ্রহশীল কেন? ইহার মূলে কি কোন রহস্য আছে? সুতরাং ইহার দ্বারোদ্ঘাটনে সত্যব্রতের ঔৎসুক্য অল্প নহে।

কিন্তু পিনাকীর পশ্চাতে যে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার মাতৃভূমি রামদুর্গ নামক সামন্ত রাজ্যটির নামও সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে কিরূপ একটা প্রহেলিকার সৃষ্টি করিতেছে, ইণ্ডিয়া কটেজের ছেলেদের তাহা জানিবার সুবিধা কোথায়? এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে এই রাজ্যটির কালোপযোগী উন্নতির বিবরণগুলি সংগ্রহসম্পর্কে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এইরূপঃ—

দক্ষিণ ভারতের রামদুর্গ নামে সামন্ত রাজ্যটির অতীতের সমৃদ্ধি-সম্পর্কে যতই প্রতিষ্ঠা থাকুক না কেন, কালোপযোগী প্রগতির দিক দিয়া প্রতিবেশী রাজ্যগুলির তুলনায় যে অনেকটা পিছাইয়া আছে, এই অপ্রিয় সত্যটুকু রাজা শিবরাম সিংহবর্মা একদা সত্যসত্যই মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু রাজ্য ও রাজ্যের অসংখ্য প্রজার সৌভাগ্যের সূচনারূপে যেদিন রাজার জীবন-তন্ত্রি এই শুভ বুদ্ধিটীর সংঘাতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, রাজার তখন বানপ্রস্থাবলম্বী হইবার সময় আসিয়াছে। তথাপি তিনি বয়সের দিকে চাহিয়া নিরুৎসাহ হইলেন না। ফলে, আটষট্টি বৎসর বয়সে যুবার উদ্যমে বিশাল রাজ্য-শকটটির মরিচাপড়া চাকাগুলি ঠেলিয়া অন্যান্য প্রগতিশীল রাজ্যগুলির সমীপবর্তী করিতে রাজার বিপুল প্রয়াস সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল।

এ পর্যন্ত এই রামদুর্গ রাজ্যটির চালকরূপে যিনি প্রচুর প্রতিপত্তি এবং বিপুল সম্পত্তি অর্জন করিয়া সম্মানে ও সম্পদে রাজার পরবর্তী বলিয়া গণ্য ছিলেন, তিনি দেওয়ান বনোয়ারীলাল। বয়সের অনুপাতে

রাজার চেয়ে তিনি মাত্র বিশ বৎসর পিছাইয়া থাকিলেও সংস্কার এবং প্রগতি সম্পর্কে বর্তমানের তুলনায় ছিল একটি পূর্ণ শতাব্দীর ব্যবধান।

কাজেই ৬৮ বৎসর বয়সে সংস্কার-প্রয়াসী রাজা সঙ্কোচ এবং চক্ষুলজ্জা কাটাইয়া দেওয়ান বানোয়ারীলালকে বলিতে বাধ্য হইলেন—কি করতে চাও এখন ? এগোবার সাহস রাখ ?

রাজার এই আকস্মিক পরিবর্তন বানোয়ারীলালকে অবাক করিয়া দেয়। কারণ, ইহার মূলতত্ত্বটুকু অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, নিজের ইচ্ছাকৃত একটা অনুকম্পামূলক আচরণের পরিণতিই সেখানে সাংঘাতিক হইয়া তাঁহার ভাবি কর্মক্ষেত্রের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সপ্তম বর্ষীয় যুবরাজ মনসারামের জন্য ইংরাজীভাষায় বিশেষভাবে বুৎপন্ন এক কৃতবিদ্য শিক্ষকের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তিনি যখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় দুলাল চ্যাটার্জী নামে এম-এ উপাধীধারী এক শিক্ষাব্রতী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্মপ্রার্থী হন। যদিও রাজ-সেরেস্তার বড় বড় পদগুলি দেওয়ান বনোয়ারীলালের আত্মীয়বর্গের দ্বারা অধিকৃত হইয়া আছে, কিন্তু আত্মীয়সমাজে ইংরাজীভাষায় অভিজ্ঞ কৃতবিদ্য ব্যক্তির অভাব বশতঃ শিক্ষকনির্বাচন সম্বন্ধে তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনদ্বারা যোগ্যতম ব্যক্তির মনোনয়নকেই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় অধ্যাপক চ্যাটার্জীর উপস্থিতি তাঁহার সঙ্কল্প শিথিল করিয়া দেয়। অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত এই শিক্ষাব্রতীর সম্বন্ধে সুপারিস করিয়া তিনি তাঁহাকে রাজার সমক্ষে পাঠাইয়া দেন। রাজা সাহেব অধ্যাপক চ্যাটার্জীর সহিত

আলাপ করিয়া এরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন যে, সেইদিনই নিয়োগপত্রের সহিত তাঁহার মর্যাদার অনুরূপ অবস্থিতির ব্যবস্থাটি বিশেষ তৎপরতার সহিত পাকা করিয়া ফেলেন। একান্ত অনভিপ্রেত হইলেও দেওয়ান সাহেব তাহাতে কোনরূপ আপত্তি তুলিবার অবসর পান নাই। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টক্রমে সেই ধড়িবাজ অধ্যাপকটি যে শুধু রাজপুত্রকেই পড়ায় নাই, সেই সঙ্গে রাজাকেও পড়াইয়া তাঁর পরিপক্ক মাথাটিও যে ভীষণভাবে গুলাইয়া দিয়াছে, প্রচলিত বিধিব্যবস্থাগুলির ওলট পালট করিবার জিদেই তাহা উপলব্ধি করিলেন। সুতরাং নিজের কৃতকর্মের জন্য সমস্ত রাগ পড়িল নিজেরই উপরে। কেন তিনি এই বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালী অধ্যাপকটিকে সুপারিস করিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলেন!

রাজা সাহেবের প্রশ্নে কিন্তু দেওয়ান বনোয়ারীলাল দমিলেন না, তৎক্ষণাৎ কহিলেন—৬৮ বৎসর বয়সে রাজা সাহেব যদি ছাওয়ালের মত এগোতে পারেন, ৪৮ বছর বয়সে আমি কি পিছিয়ে থাকব বলতে চান?

রাজা সাহেব গম্ভীর মুখে কহিলেন—প্রফেসর চ্যাটার্জী সাহেব বলেন যে, বয়সের সঙ্গে মনের যোগাযোগ সকলের থাকে না। বিশ বছর বয়সে অনেকের মন বুড়ো হয়ে যায়, তারা কেবলই পিছিয়ে থাকতে চায়; আবার, আশি বছরেও অনেকের মন রীতিমত কাঁচা থাকে। তারা ছেলেদের মত হুটোপাটি করতেও ভয় পায় না, বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায়, নতুন কথা ভাবে, কত নতুন রাস্তা দেখিয়ে লোকের চোখ খুলে দেয়।

চ্যাটার্জী সাহেবের নামেই বনোয়ারীলালের মুখখানা অন্ধকার

হইয়া উঠিল, দাঁতের নিম্নের ওষ্ঠটি চাপিয়া নীরবে রাজা সাহেবের কথাগুলি শুনিলেন, তাহার পর রুক্ষস্বরে কহিলেন—হতে পারে। কিন্তু রাজা সাহেব এখনো ছয়ের কোঠা পেরোন নি, আর আমারও চলছে আটচাল্লশ। আশির খবর ত জানি না।

রাজা সাহেব কহিলেন—আশি পর্যন্ত তুমি কি পৌছবে মনে কর দেওয়ানজী ? আটচল্লিশেই ত আটানব্বইয়ের জরাজীর্ণ মন নিয়ে হিম-সিম খাচ্ছ ! ওকে চাঙ্গা করে না তুললে কোন কাজই হবে না। তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম—পারবে কি ?

দেওয়ানজী উত্তর দিলেন—কোন কাজেই এ পর্যন্ত পিছোইনি, আর, কি কাজ যে শেষ করতে পারিনি তাও জানি না। রাজা সাহেব কি অসাধ্য কিছু করাতে চান ?

রাজা সাহেব কহিলেন—অসাধ্য কিনা জানি না, তবে যেভাবে রাজ্যটা চলছে, তার মোড় ফেরাতে চাই।

—কসুর কিছু হয়েছে ?

—অনেক। বরোদা, জয়পুর, ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ, মাইষোর—এদের পানে তাকিয়ে দেখেছ ? আমার রাজ্য ত কোন দিক দিয়েই খাঁটো নয়। কিন্তু আমরা একে বাড়াতে পেরেছি ?

—বাড়াতে হলে চারপাশের জায়গাগুলো এর লাগোয়া করে নিতে হয়। তাতে দরকার সেকালের মতন লড়াই হাঙ্গামা। রাজী আছেন ?

রাজা সাহেবের মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইল ; কহিলেন—বাড়ানো বলতে তুমি কি রামদুর্গ রাজ্যের চারদিকের সীমানা বাড়াবার কথা বুঝলে ? সে কথা আমি বলিনি। সাধে কি বলি, তোমার

মতিগতি এখনো একশ বছর পেছিয়ে আছে! একশো বছর আগে হলে বাড়ানোর ঐ মানে হত। আমি বলছি—রাজ্যের বাড়বৃদ্ধি, অর্থাৎ উন্নতি। সে দিক দিয়ে কি করেছি আমরা এ রাজ্যের? প্রজাদের কাছ থেকে শুধু টাকাই আদায় করছি যত রকম উপায় আছে সবগুলো খাটিয়ে। কিন্তু তাদের দিয়েছি কি? টাকা আসে ব্যবসাবাণিজ্য থেকে, কৃষি শিল্পের ভেতর দিয়ে। কিন্তু আমার রাজ্যে বাছা বাছা এক একটি ব্যাপার এক একজন লোক একচেটে করে রেখেছে। তাদের কাছ থেকে যা উসুল হয়—কিছুই নয়। ষ্টেট নিজে থেকে কিছুই করতে পারেনি এ পর্যন্ত। মাইসোর রেশম আর চন্দন থেকে বছরে কত টাকা আয় করে জানো? বরোদার কলগুলোর আয় রাজ্যের রাজস্বের চেয়েও কম নয়। আমার ষ্টেট থেকে কোন কল বসাবার চেষ্টা করেছো? ষ্টেট-কলারসিপ দিয়ে কোন ছেলেকে এপর্যন্ত বিদেশে পাঠানো হয়েছে কল-কারখানার কাজ শিখতে? এই যে তুলো আমার রাজ্যের একটা মস্ত আওলাত, কিন্তু তা থেকে ষ্টেটের এমন কি আয় হয় যেটা বেশ বলবার মত?

বনোয়ারীলাল স্তব্ধ বিস্ময়ে রাজা সাহেবের কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আর, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে এই প্রশ্ন দোলা দিতেছিল—এ সব সন্ধান কে তাঁহাকে দিল? দেওয়ানজীর সকল প্রস্তাবে হাসিমুখে এ পর্যন্ত যিনি সায় দিয়াছেন, ষ্টেটের শ্রীবৃদ্ধির দিকে কোন দিন যাঁহাকে ঈষৎ তাকাইতেও দেখা যায় নাই, আজ সেই লোক একটি একটি করিয়া এ সব কি প্রশ্ন করিতেছেন? ভোগলিপ্সু রাজার মোহাচ্ছন্ন মনটি সোনার কাঠির পরশ দিয়া কে এভাবে সহসা জাগাইয়া দিল? অমনি

সঙ্গে সঙ্গে নবাগত অধ্যাপক তুলাল চ্যাটার্জীর দীর্ঘ উন্নত দেহটি তাঁহার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিয়া গম্ভীর মুখখানাকে বিভৎস করিয়া দিল। রাজার কথা শেষ হইলেও দেওয়ানের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

রাজা সাহেব তাঁহার দীর্ঘায়ত তুই চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়ানজীর মুখের উপর ফেলিয়া প্রশ্ন করিলেন—জবাব দাও,এগুলো কসুর নয় কি ? এ ছাড়া আরো আছে। যাদের টাকায় আমরা ইন্দ্রের ঐশ্বর্য ভোগ কর্‌ছি, তাদের জন্যে কি করেছি ? কটা কলেজ আমার রাজ্যে খোলা হয়েছে ? সে যুগে যে অবস্থায় এরা পড়েছিল, তার চেয়ে কোন ভাল অবস্থায় ত এদের আনতে পারা যায়ই নি, বরং আমরা ইচ্ছা করে তাদের অবস্থা আরো খারাপ করে দিয়েছি। সে যুগে ষ্টেট থেকে জমি মেরামত করে দেওয়া হত, সার বিলানো হত, বড় বড় ইঁদারা প্রতি বছরে তৈরী করে জল সেচের সুবিধা করে দেওয়া হত, এখন সে সব পাট কিছুই নেই। খালগুলো মজে গেছে, আর সেই মজা খাল বিলি করে ষ্টেটের সেরেস্তায় আমদানী কিছু বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু চাষাদের যে কি সর্বনাশ হচ্ছে, সেদিকে ষ্টেটের নজর নেই। এগুলো কসুর নয় বলতে চাও ?

বনোয়ারীলালের তুই চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, সম্মুখেই রাজা সাহেবের ভাস্বর মূর্তিখানাও যেন অস্পষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তিষ্কের তুর্বলতাটুকু সুস্পষ্ট করিয়া দিল। কি উত্তর তিনি দিবেন, প্রতিবাদ করিবার কি আছে ? যে বিষয়-বস্তুগুলির উল্লেখ করিয়া রাজা সাহেব কসুরের পর্যায়ে ফেলিলেন সেগুলির

সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি কিভাবে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা ত তাঁহার অজ্ঞাত নহে! কিন্তু চুপ করিয়া থাকাও ত যুক্তিযুক্ত নয়, অগত্যা তাঁহাকে কণ্ঠস্বর অতিশয় কোমল ও মৃদু করিয়া বলিতে হইল—তাহলে হুকুম করুন, রাজা সাহেবের মর্জ্জী মতই ষ্টেটের কাজ চালাতে তৈরী হই।

রাজা সাহেব কহিলেন—ষ্টেটকে ঢেলে সাজতে হবে। কাজটা খুবই কঠিন। যদিও আমি রাজা, কিন্তু সে নামেই, গড়াবার শক্তি আমারও নেই, তোমারও নেই। যোগ্য লোক চাই, সেই লোকেরই অভাব।

—কেন, মাষ্টার সাহেব ত রয়েছেন! তিনিও কি রাজা সাহেবের মতে অযোগ্য? তাঁরও গড়বার শক্তি নেই?

—প্রফেসর চ্যাটার্জীর কথা বলছ ত? হ্যাঁ, শক্তি তাঁর আছে, কিন্তু সে শক্তিও আলাদা রকমের; একটা রাজ্য গড়ে তোলবার মত নয়। তবে রাজ্যের যারা প্রাণ, তাদের জন্যে সে শক্তিরও প্রয়োজন যথেষ্ট। চ্যাটার্জী সাহেব মানুষ তৈরী করতে পারেন, কিন্তু মানুষকে বাঁচাতে আর বড় করে তুলতে যে শক্তির দরকার, তার জন্যে চাই আলাদা শক্তিধর মানুষ। সেই মানুষ আমাকে খুঁজে বার করতে হবে।

এদিনের কথা এইখানেই শেষ হইল। রাজা সাহেব বিশাল প্রাসাদের অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। দেওয়ান সাহেবের অবস্থাটা তখন উঠিবার মত নয়। রাজার সহিত দীর্ঘ আলোচনায় বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, কপাল তাঁহার ভাঙ্গিয়াছে; রাজা সাহেব অন্যান্য সমস্ত রাজ্যগুলির আদর্শে কোন নামজাদা বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বরণ করিয়া

আনিয়া তাঁহার হাতেই নির্বিচারে রাজ্যের রশ্মিটি সমর্পণ করিবেন। কিন্তু কে সে ভাগ্যবান? তাহার পর? তাঁহার কি পরিণাম হইবে?

* *

*

এই ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ পরে দেওয়ান বনোয়ারীলাল সবিস্ময়ে শুনিলেন, দক্ষিণ-ভারতের রাজধানী পুনা সহরে বিপুল সমারোহে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন চলিয়াছে এবং রাজা সাহেব প্রফেসর চ্যাটার্জীর সহিত সেই অধিবেশনে যোগদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

প্রথমে কথাটা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহার ধারণা, কংগ্রেস ব্রিটিশ-সরকারের বিদ্বেষভাজন একটা বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ-রাজ্যের মিত্রস্থানীয় রাজন্যসমাজের পক্ষে তাহার ছায়াস্পর্শও দোষের বিষয়। সুতরাং রামদুর্গের রাজা সাহেব সুস্থির মস্তিষ্কে কংগ্রেসে যোগ দিবার দুঃসাহস কখন পোষণ করিতে পারেন না।

সেইদিনই রাজা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সর্বাগ্রেই তিনি এই কথাটি তুলিলেন। সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—শুনছিলাম, রাজা সাহেব নাকি পুণায় যাচ্ছেন—কংগ্রেসে যোগ দিতে?

সহজভাবেই রাজা সাহেব উত্তর দিলেন—হ্যাঁ-হে, অনেকদিন থেকেই কংগ্রেসের কথা শুনে আসছি, উৎসবটা দেখবার সৌভাগ্য কোন দিন হয় নি। এবার যখন কাছেই হচ্ছে, সুযোগটা ছাড়ি কেন?

প্রথমেই প্রতিবন্ধকের কথাটা না তুলিয়া বনোয়ারীলাল রাজা সাহেবকে একটু খেলাইবার মতলবে কহিলেন—ওতে দেখবার কি

আছে? একটা বারোয়ারী মজলিস ছাড়া আর কিছু ত নয়! বারো জাতের কতকগুলো হুজুগে লোক মিলে তিনটে দিন হৈ-চৈ করে, চেঁচায়, আর আকাশের চাঁদ হাতে তুলে দেবার জন্যে সরকারকে শাসায়। রাজা সাহেবের মত কোন রইস ওখানে গিয়েছে কখন?

রাজা সাহেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—বেশ ত, না হয় আমিই প্রথম পথ দেখালুম। হৈ-চৈ করা আর চেঁচাবার কথা যা বলছ, সেইটে শোনবার জন্যেই ত যাওয়া। শুনিছি, কংগ্রেস-সভাপতির বক্তৃতা শোনবার জন্যে সারা হিন্দুস্থান ত কান পেতে থাকেই, তা ছাড়া বিলাতের সরকারও বাদ যান না।

বানোয়ারীলাল অপ্রসন্নমুখে কহিলেন—রাজা সাহেবের কাছে আজকাল অনেক আজগুবি খবর আসে, কংগ্রেসের নামে যারা রাজা সাহেবকে নাচাতে সাহস করে, তারা যে মিত্র নয়, শত্রু—রাজা সাহেবের এটা মনে রাখা উচিত।

একথা বলবার মানে? কি ভেবে আর কাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলছ, শুনি?

আমি নির্দ্দিষ্ট কোন লোককে লক্ষ্য করে একথা বলিনি। যারা রাজা সাহেবের সর্ব্বনাশ করতে ব্যস্ত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধেই আমার কথা।

রাজা সাহেবের সর্ব্বনাশ করবার কথা উঠছে কেন? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে আমার বিরুদ্ধে যাবে? কথাটা খুলেই বল না শুনি হে!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবং সেই সঙ্গে সতর্কদৃষ্টিতে সুসজ্জিত

হিংসা ও অহিংসা

সুবৃহৎ ঘরখানির সকলস্থান দেখিয়া লইয়া বনোয়ারীলাল কহিলেন—রেসিডেণ্ট সাহেবের হুকুম পেয়েছেন? তিনি আপনাকে কংগ্রেসে যোগ দেবার অনুমতি দেবেন?

গর্জ্জনের সুরে স্থবির সিংহের কণ্ঠস্বর নিঃসৃত হইল—দরকার? আমার রাজ্যের একজন সাধারণ প্রজার যে অধিকার আছে, তুমি কি বলতে চাও—আমি তাদের রাজা হয়েও তা থেকে বঞ্চিত? তুমি জান, আমি মনে করলে রেসিডেণ্ট সাহেবকে সঙ্গে করে কংগ্রেসের মণ্ডপে ঢুকতে পারি? তোমাদের মত কূপমণ্ডুকদের পাল্লায় পড়েই ত আমরা রাজ্যের ভেতরে চিড়িয়াখানার জীবের মত এক অদ্ভূত চীজ হয়ে আছি। দেশের খবর রাখিনা, জন-সমাজের সঙ্গে মিশি না, শুধু বুঝি নিজের সুখ সুবিধা আর আরাম। সমস্ত জীবন ভোর যে সব অপকর্ম্ম করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্য করবার দিন আজ এসেছে। কংগ্রেসে যাবার আসল অভিপ্রায়টা আমার কি শুনবে?

বনোয়ারীলাল মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গীতে শুনিবার ইচ্ছাটি প্রকাশ করিলেন, কথায় কিছু কহিলেন না। রাজা সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার মুখে নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন—বাঙ্গলা মুলুকের যে জবরদস্ত মানুষটির নাম অনেকদিন থেকেই আমরা শুনেছি, সরকার পর্য্যন্ত একদিন যাকে নিয়ে ভারী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, ছেলেরা যার নাম শুনলে মেতে ওঠে—এবার সেই জিদি লোকটিই হয়েছেন কংগ্রেসের সভাপতি। এঁর বক্তৃতা শুনলে নাকি পাথরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তাই সখ হয়েছে, লোকটিকে দেখবো, তাঁর বক্তৃতা শুনবো।

হিংসা ও অহিংসা

বানোয়ারীলাল কহিলেন—বাবু স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর কথা বলছেন ত ?

রাজা সাহেব সহর্ষে কহিলেন—হ্যাঁ, তিনিই যে এবার কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্য পুণায় আসছেন, শোননি ?

শুনিনি বললে মিছে কথা বলা হয় ! তবে রাজা সাহেবকে শুনাইনি এই জন্যে—পাছে নেচে ওঠেন, পুণায় যেতে চান। এই লোকটিকে দেখবার জন্যে এক সময় আপনি এমনি মেতে উঠেছিলেন যে, এখানকার জরুরী কাজ ফেলে কলকাতায় যাবার দিন পর্য্যন্ত পাকা হয়ে যায় !

তোমার মনে আছে দেখছি ! যেতুম আমি সে সময় কলকাতায়, কিন্তু রাণীসাহেবের শক্ত ব্যায়রাম আমার সে ইচ্ছায় বাধা দিয়েছিল, আর তুমি এমনি সয়তান—সেই লোক পুণায় আসছে জেনেও আমাকে জানাওনি ! কিন্তু তুমি ভুলে গেছ, আমি এখন সর্ব্বক্ষণ চোখ বুজিয়ে থাকি না।

কথার আঘাতটুকু অম্লানবদনে সহ্য করিয়া বনোয়ারীলাল কহিলেন—তা জানি। প্রফেসর চাটার্জ্জী এখন রাজা সাহেবের চোখের চশমা হয়েছেন ; কাজেই দুনিয়ার সবই দেখতে পান। কিন্তু একটা কথা আমি শুধু জিজ্ঞাসা করব রাজা সাহেবকে—বাঙ্গালা মুলুকের ঐ বিপ্লবী মানুষটিকে দেখে, তার বক্তৃতা শুনে আপনার কি এমন চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হবে ?

রাজা সাহেব সোজা হইয়া বসিয়া কথাটার উত্তর দিলেন—লাভের আশা না থাকলে কি মিছি মিছি লোভ করছি ভেবেছ ? প্রফেসর

চাটার্জ্জীর কাছে বাঙ্গালা দেশের ঐ সেরা মানুষটির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনছি যে! শুনেই না মনে লোভ জন্মেছে।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া এবং তারা দুটি কপালের দিকে তুলিয়া বনোয়ারীলাল কহিলেন—বুঝেছি। রাজা সাহেব রামদুর্গ রাজ্যটিকে নতুন করে গড়বার জন্যে যে লোক খুঁজছিলেন, প্রফেসর চ্যাটার্জ্জীর কাছে শুনে তার হদিস পেয়েছেন। মিষ্টার ব্যানার্জ্জীকে দেখে আর তাঁর বক্তৃতা শুনে যদি খুসী হন, তা হলে তাঁকেই কংগ্রেসের সভাপতির আসন থেকে তুলে এনে রামদুর্গরাজ্যের গদীর পাশেই বসিয়ে দেবেন।

রাজসাহেবের মুখ দিয়া উল্লাসমিশ্রিত স্বর সশব্দে বাহির হইল—ইয়া! ঠিক ধরেছ ত তুমি। তাহলে তোমাকে যতটা বোকা মনে করতুম তা নও দেখছি!

বনোয়ারীলাল কহিলেন—কিন্তু প্রফেসর চাটার্জ্জী যদি আপনাকে এই পরামর্শ দিয়ে থাকেন—

মুখে একটা তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া রাজাসাহেব কহিলেন—রাধামাধব! প্রফেসর চ্যাটার্জ্জী এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। আমি তাঁর কাছ থেকে কেবল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ব্যানার্জ্জীর কথা জেনেছি। তাতেই এই লোকটির ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। আমার মনে এমন সঙ্কল্পও জেগেছে—যদি এই রকম একজন মানুষের মতন মানুষকে এনে আমাদের রাজ্যটিকে ভেঙ্গেচুরে গড়বার ভার-টুকু দিই, তাহলে আফশোষের কিছু থাকবে না, সব দিক দিয়েই এর উন্নতি হবে। কিন্তু আমার এই সঙ্কল্প প্রফেসর চ্যাটার্জ্জীকে

এখনো জানাইনি। তবে, তুমি যখন জেনেছ, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, তুমিই বল—এর ফল কি সত্য সত্যই ভাল হবে না?

মুখখানা ভার করিয়া বনোয়ারীলাল উত্তর দিলেন—কিছুতেই না। আমড়া গাছে কখনো আমরুত ফলে না। বাঙ্গালী শুধু চেঁচাতে জানে, রাজ্য চালাবার হিম্মত ওদের থাকবে কি করে?

রাজা সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন—নিজের খেয়ালে তুমি এই কথাটা বললে, এর মানে নেই, দামও নেই। এ অঞ্চলের যতগুলো ষ্টেট আজ মাথা উঁচু করে উঠেছে, ইংরেজ সরকারের কাছে দুশো খাতির পাচ্ছে, ভাল করে সন্ধান নিলেই জানতে পারবে, গদীর পিছনে আছে এক একটা ন্যাঙ্গা শির—আর সেগুলো সব বাঙ্গালীর। জয়পুর ত ডুবতে বসেছিল, মুখুয্যে আর সেন যদি মন্ত্রী হয়ে মাথা না চালাতো—আজ ও রাজ্যের এত বাড় বৃদ্ধি হত? মিষ্টার মুখার্জ্জীর সঙ্গে কাশ্মীরের নাম জড়িয়ে নেই তুমি বলতে চাও? বরোদা বড় হচ্ছে মিঃ দত্তকে পেয়ে। নেপালকে ঢেলে সেজেছে কে? বাঙ্গালী নয়? বাড়তির দিকে যে রাজ্যটি এগুচ্ছে তার দিকে চাইলেই দেখতে পাই—এক একটা বাঙ্গালী সেখানকার গদীর পাশে চাঁই হয়ে বসে আছে। আর তুমি বলছ—ওরা শুধু চেঁচায়, রাজ্য চালাবার হিম্মত ওদের নেই!

বনোয়ারীলাল এবার কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন—বেশ ত, আপনিও ঐ রকম একটা চাঁইকে এনে আপনার গদীর পিছনে বসিয়ে দিন না, আপনার রাজ্যও বাড়তির পথে এগিয়ে চলুক।

কণ্ঠে জোর দিয়া রাজা সাহেব কহিলেন—সেই জন্যইত কংগ্রেসে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এর মূলে রয়েছে মস্ত স্বার্থ; আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে উপযুক্ত লোক একজন খুঁজে বার করা—যে লোক সব দিক দিয়েই অসাধারণ।

বনোয়ারীলাল যদিও মুখের ভঙ্গীতে জানাইতে চাহিলেন যে, ইহাতে তাঁহার মনে কোনরূপ ক্ষোভের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ভিতরের অবস্থাটি তখন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি যথার্থই এরূপ অঘটন ঘটে, অর্থাৎ কোন অসাধারণ মানুষ এই অর্দ্ধসভ্য রাজ্যটির ব্যবস্থাপক হইয়া আসে, তাহাতে বনোয়ারীলালের দীর্ঘকালব্যাপী সঞ্চয় এবং প্রতিষ্ঠার সহিত তাহার অদৃষ্টের উপর কোন কুপিত মারক গ্রহের দৃষ্টি পড়িবে না কি? সুতরাং এ অবস্থায় বিরুদ্ধ কথার আঘাতে স্থবির সিংহের জিদ আরও উগ্র না করিয়া অতি সন্তর্পণে তিনি প্রতিকারের অন্য রাস্তা ধরিলেন।

বনোয়ারীলাল ভাবিয়াছিলেন রেসিডেণ্ট সাহেবকে বৃদ্ধ রাজার বর্ত্তমান দুর্ম্মতির কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া অবস্থার গতিটা একেবারে ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু ভাঙ্গা অশুদ্ধ ইংরাজীর সহিত মাতৃভাষার খিচুড়ি পাকাইয়া বিচক্ষণ সিবিলিয়ান কেনেডী সাহেবকে তাতাইয়া তুলিবার সযত্ন প্রচেষ্টাটি তাঁহার অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল। বনোয়ারীলাল নিজের জাতিগত সঙ্কীর্ণ প্রকৃতির সহিত স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির এই বিচক্ষণ মানুষটির প্রকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া বিষম ভুল করিয়া বসিলেন। প্রভুর বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীকে এভাবে 'চুকলী' করিতে দেখিয়া

সাহেব তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—হোয়াট? তুমি তোমার রাজার বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করতে চাও?

বনোয়ারীলাল তৎক্ষণাৎ কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া কহিলেন—না, না, ঠিক রাজার বিরুদ্ধে নয়, আপনি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি; আমি আমার রাজাকে রক্ষা করবার জন্যে—যে ভুল রাস্তাটা তিনি ধরেছেন, সেটা শুধরে দেবার জন্যই—আপনাকে ধরেছি। নইলে আমার রাজার মত ভাল রাজা হিন্দুস্থানে কটা আছে? কিন্তু এক সয়তানের পাল্লায় পড়েই তিনি জাহান্নামে যেতে বসেছেন! এখন আপনার কি উচিত নয় সাহেব, তাঁকে রক্ষা করা?

সাহেব বুঝিলেন, বনোয়ারীলালের লক্ষ্য শুধু রাজা নয়, তাঁহার পশ্চাতে আরও কোন ব্যক্তি আছে। পরবর্ত্তী সংলাপে সেই প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিটিও সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িলেন। বনোয়ারীলালের দুর্ভাগ্য, কেনেডী সাহেবের পক্ষে অতঃপর ধৈর্য্য রক্ষা সম্ভবপর হইল না। তিনি সক্রোধে তিরস্কারের স্বরে কহিলেন—ননসেন্স! তুমি প্রফেসর চ্যাটার্জ্জীর মত একজন উচ্চশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি ভদ্রলোককে সয়তানের পর্য্যায়ে ফেলতে সাহস কর? এতক্ষণে আসল ব্যাপারটি আমার বোধগম্য হয়েছে। প্রফেসর চ্যাটার্জ্জীর সংস্পর্শেই সম্ভবতঃ বৃদ্ধ রাজার মান্ধাতার আমলের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তিনি তাঁর রাজ্যটিকে সংস্কার করতে উদ্যত হয়েছেন, আর স্বার্থহানির ভয়ে তুমি অস্থির হয়ে আমাকে তাতাতে এসেছ! কিন্তু ইংরেজ জাতটা যে চুকলীখোর নয়—এ ধারণা তোমার ছিল না! সাবধান, এমন দুষ্কর্ম্ম আর কখন ক'র না। ভয় নেই, তোমার কথা আমি রাজাকে জানাবো না।

হিংসা ও অহিংসা

ইহার আগে আর কোন দিন বনোয়ারীলালের হিসাবে এমন ভুল হয় নাই। বুঝিলেন, তাঁহার অদৃষ্টের চাকা এখন বিগড়াইয়া গিয়াছে; এ অবস্থায় নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ, যেহেতু বোবার শত্রু কেহ নাই।

যেদিন বনোয়ারীলাল কেনেডী সাহেবের কাছে ধমক খাইয়া ফিরিলেন, সেইদিনই রাজা সাহেব তাঁহাকে ডাকাইয়া কহিলেন—ওহে—বনোয়ারীলাল, হিসেবে তুমি মস্ত একটা ভুল করেছিলে; প্রফেসর চ্যাটার্জ্জী ভুলটি তোমার ধরে দিয়েছেন।

বনোয়ারীলালের বুকের ভিতর সমুদ্রের তরঙ্গ বহিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ,—হিসেবের ভুল! প্রফেসর চ্যাটার্জ্জী ধরেছে? তাঁহার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না।

পরক্ষণে রাজা সাহেব ব্যাপারটি পরিষ্কার করিয়া দিলেন। কহিলেন—তুমি সেদিন বলছিলে না, কংগ্রেসের মণ্ডপে এ পর্য্যন্ত কোন রুলিংচীফ্ সেঁধোয় নি, কোন সম্পর্ক রাখে নি—তোমার মনে আছে কথাটা?

বনোয়ারীলালের মাথার উপর হইতে গুরুভার পাষাণের বোঝাটি কে যেন পলকে সরাইয়া দিল, বুকের ভিতর সমুদ্রের যে উত্তপ্ত তরঙ্গ বহিতেছিল, তাহাও মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আ! বাঁচিলেন তিনি—ভুল তাহলে কথার, কাজের নয়! মুখখানি প্রসন্ন করিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, মনে আছে। আমি যা জানতুম, তাই বলেছি।

রাজা সাহেব কহিলেন—তুমি জানতে ছাই! প্রফেসর চ্যাটার্জ্জী খবরের কাগজের কাটিংস আমাকে দেখিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট লেখা আছে—১৮৮৭ অব্দে মাদ্রাজে যখন কংগ্রেস বসে, ভিজিয়ানাগ্রামের

মহারাজা তাতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি কংগ্রেসের একজন মুরুব্বী হয়ে ওঠেন। এমন কি, ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসনের ইমারত তৈরী করবার জন্যে তিনিই সবচেয়ে বেশী টাকা চাঁদা দেন, আর এটা সম্ভব হয়—বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর জন্যেই। মহারাজ নাকি তাঁর ভারি ভক্ত ছিলেন।

বনোয়ারীলাল কহিলেন– তা হবে। কংগ্রেসের খবর আমি কোন দিন রাখি নি ভাল করে, ভুল-চুক হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তা, বেশ ত, রাজা সাহেবও এখন থেকে ভিজিয়ানাগ্রামের অনুসরণ করে বাঙ্গলার ঐ ব্যানার্জ্জী সাহেবটির ভক্ত হয়ে পড়ুন!

রাজা সাহেব মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—পরের অনুসরণ করবার বয়স আমি অনেকদিন কাটিয়ে এসেছি। এ বয়সে নতুন রকম কিছু করবার ফিকিরই খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি হয় ত মনে ঠিক দিয়ে রেখেছ, এটা সম্ভব নয়, হবে না। আমি কিন্তু চোখের উপর স্পষ্ট দেখছি— যা ভেবে রেখেছি, তাই হবে।

মহাসমারোহে পুণা সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল এবং সুরেন্দ্রনাথ এই প্রথম সভাপতিরূপে কংগ্রেসের আসন অলঙ্কৃত করিলেন। ১৮৯৫ অব্দের এই অধিবেশনটি সুরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মীর জয়মাল্যে ভূষিত করে এবং কংগ্রেসের ইতিহাসে সভাপতি সুরেন্দ্রনাথের এই অভিভাষণের কাহিনীটিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। তাঁহার সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিতে চারিঘণ্টা সময়

অতিবাহিত হয় এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাণ্ডুলিপি না দেখিয়াই সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণ অনর্গল আবৃত্তি দ্বারা মণ্ডপে সমবেত পাঁচ সহস্র শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ করিয়া রাখেন।

অভিভাষণের পর সুরেন্দ্রনাথ সভাপতির বেদীতে উপবেশন করিতেই স্থির জনসমুদ্র যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, সুরেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি তুলিয়া ভক্তবৃন্দ ছুটিলেন বেদীর দিকে—এই অসাধারণ বাগ্মীর পদধূলি লইয়া ধন্য হইতে। সেদিনের সেই স্মৃতি সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-জীবনের একটি গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী।

রাজা শিবরামের স্বপ্ন সার্থক হইল। প্রফেসর চ্যাটার্জ্জীর সহিত তিনি কংগ্রেস-মণ্ডপের পুরোভাগেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণের কথাগুলি প্রফেসর চ্যাটার্জ্জী রাজা সাহেবকে তাঁহার মাতৃভাষায় সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন। সভাভঙ্গের পর তিনি সভাপতির সহিত আলাপ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন। ফলে তত্ত্বাবধায়কগণের ব্যবস্থায় তাঁহাদের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর রাজা সাহেব একেবারে সুরেন্দ্রনাথকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া বসিলেন—আপনি আমার রাজ্যটির ভার নিন। ছোট একটি রাজ্যকে নিজের মনের মত করে গড়ে সারা হিন্দুস্থানকে অবাক করে দিন। আমার স্বপ্ন সত্য হোক।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন—কলকাতায় একটা বড় কলেজের সংস্রবে আমি আছি। অনেকগুলো ছেলেকে তৈরী করবার ভার রয়েছে আমার হাতে। তা ছাড়া আমার খবরের কাগজ বেঙ্গলী আছে। এ সব ছেড়ে আপনার রাজ্যের ভার নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

হিংসা ও অহিংসা

রাজা সাহেব পুনরায় অনুরোধ করিলেন—আপনার কাগজ আমার রাজ্য থেকে চালান, আমি এর সব ভার নেব। কলকাতার কলেজে আপনার জায়গায় আর কাউকে বসান; এরজন্য মোটা রকমের টাকা আমি বরং ঐ কলেজকে দেব। আমি চাই আপনাকে। আমার এই রাজ্যটির সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে আপনি নিজের হাতে গড়ে তুলুন। একে সব দিক দিয়ে আদর্শ করে তামাম রাজ্যের সরকারদের চোখগুলো খুলে দিন।

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন—রাজ্য চালানো ব্যাপারে আমার মতন একজন আনাড়ীর ওপর আপনার এত বিশ্বাস ? ভারি আশ্চর্য্য ত ?

রাজা শিবরাম কহিলেন—বক্তৃতায় আপনি যে সব কথা বলেছেন, প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি আমাকে তর্জ্জমা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যাঁর মাথা থেকে এই ধরণের কথা বেরুতে পারে তিনি আনাড়ী হতে পারেন না—সত্যিকারের জহুরী। আমার মনে হয়, রাজ্যটাও জহরের সামীল, চিনতে পারলে, একে চালাতে কষ্ট হয় না। কাজেই এ ব্যাপারে আপনি যে পাকা জহুরী—আমি তার ভালরকম প্রমাণ পেয়েছি। আমার এ আর্জ্জী আপনাকে রাখতেই হবে।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন—দেখুন রাজাসাহেব, আপনার রাজ্যের সংস্কার করবার জন্য যখন আপনি ঝুঁকেছেন, আর আপনার এই ঝোঁকটি যখন আন্তরিক, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। আমি এ ব্যাপারে আমার চেয়েও একজন যোগ্য লোক আপনাকে দিতে পারি। তিনি আমার সঙ্গেই পুণায় এসেছেন। ইনিও একজন আই-সি-এস, খুব সুখ্যাতি আর তেজের সঙ্গে কিছুকাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজও করেছিলেন। ষ্টেটের ব্যাপারে এঁর অভিজ্ঞতা খুব বেশী। সরকারের সঙ্গে একটা

ব্যাপারে মনোমালিন্য হওয়ায় সম্প্রতি কাজে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেসে ভিড়েছেন। লোকটি অসাধারণ পণ্ডিত, তা ছাড়া দশ পনেরোটি ভাষা ভাল রকম জানেন। আপনার মাতৃভাষায় তিনি আপনার সঙ্গে এমন সুন্দর আলাপ করবেন যে আপনার মনে হবে তিনি এই প্রদেশেরই বাসিন্দা। আমার মনে হয়, এইরকম লোক পেলে আপনার উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ ভাবেই সিদ্ধ হবে।

এমন সমীচীন প্রস্তাবের উপর রাজাসাহেব আর কি কথা কহিবেন? প্রফেসর চ্যাটার্জ্জীর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি তাহাতে সানন্দে সম্মতি দিলেন। অবিলম্বে সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মানুষটিকে রাজাসাহেবের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। আকৃতির দিক দিয়া লোকটি সুরেন্দ্রনাথেরই যেন একটি নিখুঁত সংস্করণ। তেমনই দীর্ঘায়ত দেহ, প্রতিভাদৃপ্ত মুখশ্রী, ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুর প্রাচুর্য্যে মুখখানির গাম্ভীর্য্য আরও পরিস্ফুট, দুই চক্ষুর গভীর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাও মর্ম্মভেদী, ওষ্ঠে পরিহাস-চটুল হাসির রেখা আলাপের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝিকমিক করিয়া উঠে। বয়স আটত্রিশ বৎসর, নাম আনন্দময় রাজপণ্ডিত।

মানুষটির অসাধারণ আকৃতি প্রথম দর্শনেই রাজাসাহেবের অন্তরকে তাঁহার দিকে চুম্বক-শক্তির মত আকৃষ্ট করিল। আলাপ-পরিচয়ে তাহা আরও নিবিড়তর হইয়া উঠিল। প্রকাশ পাইল যে, পুরুষানুক্রমেই ইঁহারা সামন্ত রাজ্যের ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ইঁহার প্রপিতামহ নেপাল-সরকারের ব্যবস্থাপক ও সভাপণ্ডিত ছিলেন, তদবধি ইঁহাদের কৌলিক উপাধি ভট্টাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাজদত্ত রাজপণ্ডিত উপাধি চালু হইয়া আসিতেছে। ইঁহার পিতামহ এবং পিতৃদেবও রাজ-

সরকারে উচ্চপদে অভিষিক্ত ছিলেন। কেবল ইঁনিই বিলাত হইতে আই, সি, এস পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতবিদ্য ভারতীয় সিবিলিয়ানরূপে ব্রিটিশ সরকারের চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা যে স্থায়ী হইবার সুযোগ পায় নাই, একথা আগেই বলা হইয়াছে।

রাজাসাহেব ইঁহাদের বংশপরিচয় পাইয়া সহর্ষে কহিলেন—আমার প্রয়োজন বুঝেই ঈশ্বর আপনাকে বর্ত্তমান অবস্থায় ফেলেছেন। আপনি আমার রাজ্যটির ভার নিন।

আনন্দময় কহিলেন—এক সর্ত্তে আমি এ ভার নিতে পারি রাজাসাহেব, কিন্তু সর্ত্তটি ভারি শক্ত।

রাজা সাহেব কহিলেন—বলুন ত!

আনন্দময় কহিলেন—দেখুন, ভারতবর্ষে যতগুলি বড় বড় সামন্ত রাজ্য আছে, আমি তাদের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছি। এর জন্য সব রাজ্যগুলিই আমাকে পরিদর্শন করতে হয়েছে। কোন্ রাজ্যের কি কি ত্রুটি, সেগুলোও আমাকে জানতে হয়েছে। কাজেই আপনার রাজ্যের যে মারাত্মক ত্রুটিগুলো উন্নতির অন্তরায় হয়ে আছে—আমার অজানা নেই।

রাজাসাহেবের মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন—বলেন কি? তাহলে ত আমি ঠিকমত বৈদ্যের সন্ধানই পেয়েছি—আমার রাজ্যের রোগগুলো যাঁর জানা আছে। বেশ, এখন আপনার সর্ত্তটি বলুন, আপনি কি চান—সেই সর্ত্ত।

আনন্দময় কহিলেন—আপনার রাজ্যের ভার নিতে হলে সেই ত্রুটিগুলি আমাকে সরিয়ে দিতে হবে। তাতে আপনার সরকারের

বড় বড় থামগুলো পড়-পড় হবার জো হবে। কিন্তু আপনি যদি ঠিক থাকেন আর বিশ্বাস করে আমার ওপর নির্ভর করেন, চাপা কিছুতেই পড়বেন না, একথা আপনাকে জোর করে বলতে পারি। এখন আমার সর্ত্ত এই—চোখ বুজিয়ে আপনাকে আমার হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। তেমনি আমিও প্রতিশ্রুতি দেব, সম্বৎসরের ভেতরেই আপনি সব দিক দিয়েই আপনার রাজ্যের উন্নতি দেখতে পাবেন।

রাজাসাহেব হাসিমুখে কহিলেন—আমি মিষ্টার ব্যানার্জ্জীকে এই সর্ত্তেই নিতে চেয়েছিলাম। আপনার সর্ত্তে আমার পূর্ণ সম্মতিই আছে। মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর সমক্ষেই আমাদের কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে যাক্।

দুই সপ্তাহ পরে একদিন প্রত্যূষে আনন্দময় রাজপণ্ডিত রাজোচিত মর্য্যাদায় সপরিবার রামদুর্গ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। দূরবর্ত্তী ষ্টেসনে নির্দ্দিষ্ট সময়েই রাজকীয় সুসজ্জিত হাতী এবং একদল রক্ষী-সৈন্যসহ প্রফেসর চ্যাটার্জ্জী রাজাদেশে মোতায়েন ছিলেন। রাজা শিবরাম বালক যুবরাজ এবং বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের সহিত সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজধানীর মধ্যবর্ত্তী প্রাসাদোপম অট্টালিকায় লইয়া গেলেন। রাজাসাহেব দেখিলেন, যিনি এই রাজ্যের কর্ণধারের দায়িত্ব ও মর্য্যাদা লইয়া সুরম্য উদ্যান পরিবেষ্টিত সুসজ্জিত বিশাল প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহার পরিবার সংখ্যা একটি অঙ্গুলীর কয়টি পর্ব্বেই সীমাবদ্ধ। সহধর্ম্মিণী সীতাদেবী এবং পাঁচ বৎসর বয়স্কা শিশুকন্যা মীরা দেবীকে লইয়াই মহামান্য রাজপণ্ডিত

মহাশয়ের সংসার। পরিচর্য্যার জন্য আসিয়াছে একজন সাধারণ ভৃত্য এবং এক বিধবা পরিচারিকা। রাজাসাহেবের ব্যবস্থায় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের মর্য্যাদা রক্ষার উপযোগী বিভিন্ন পর্য্যায়ের বহু লোক বাহাল হইয়া গেল। বাড়ীর সিংহদ্বারে সশস্ত্র রক্ষী বসিল; হাতী, মাহুত, রৌপ্যখচিত ঝালরদার পাল্কী, বাহক, কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র আয়া, মন্ত্রীসাহেবের দেহরক্ষী এবং খিতমতগারের জন্য চাপরাসী পরিচারক—কিছুরই অপ্রতুল রহিল না।

বিচক্ষণ আনন্দময় এইরূপ বিরাট ব্যয় বাহুল্য তাঁহাদের কয়টি প্রাণীর পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত জানিয়াও আপত্তি করিলেন না। দেশীয় সামন্ত রাজ্যগুলির আদব-কায়দা সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর প্রভাব স্থাপনের পক্ষে এইরূপ আড়ম্বরের যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

রামদুর্গ রাজ্যে এইভাবে আনন্দময়ের অভ্যুদয় বিশাল রাজ্যাঙ্গে যেমন সম্ভ্রম বিস্ময়ের শিহরণ তুলিল, সেই সঙ্গে বনোয়ারীলালের মনোরাজ্যে একটা নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি করিল। তাঁহার সৌভাগ্য-চক্রে অধুনা যে রাহুর দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং সে-দৃষ্টির সংঘাতে সর্ব্বস্ব হারাইয়া তাঁহাকে রাস্তায় দাঁড়াইতে হইবে এমন আশঙ্কাও মনে মনে তিনি অনুভব করিলেন। বনোয়ারীলাল বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও নানা কারণে বাহ্যিক আড়ম্বর প্রকাশ করিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলেন না। আর্থিক ব্যাপারে অসঙ্কোচেই তিনি যে কোন ব্যক্তির সহিত মিশিয়া স্বার্থোদ্ধারে দ্বিধা করিতেন না। এই বংশের রাজারা জ্যোতিষের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই বংশেরই কোন নৃপতি রাজধানীর

একাংশে জ্যোতিষালোচনার জন্য সুবৃহৎ প্রস্তরময় গৃহ ও তাহার সংলগ্ন এক মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া জ্যোতিষ-চর্চ্চার যে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বহুকাল পরে বর্ত্তমান রাজার আমলে বনোয়ারী-লালের ব্যবস্থায় তাহা অনাবশ্যক বলিয়া নাব্যস্ত হয়। এই মান-মন্দির-সংলগ্ন আবাস-ভবনে থাকিয়া যে সকল ছাত্র জ্যোতিষালোচনা করিতেন এবং রাজ-সরকার হইতে তাহাদের ব্যয় বহন করা হইত, তাহা রহিত হইয়া যায়। পরিত্যক্ত মানমন্দিরটিকে মানব-ব্যবহারে উপযুক্ত করিবার জন্য রাজার সম্মতি অনুসারে তাহা দেওয়ান বনোয়ারী-লালের আবাসভবন-রূপে বিখ্যাত হইয়া উঠে। কিন্তু দীর্ঘকাল এখানে বসবাস করিলেও ইহার মান-মন্দির নামটি আজও অক্ষুণ্ণ আছে, দেওয়ানজীর দপ্‌দপায় বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। দেওয়ান বনোয়ারীলাল শুধু যে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি পরিজনগণের সহিত মান-মন্দিরে বসবাস করিতেছেন, ইহা বলা চলে না; নিকট ও দূর সম্পর্কের বহু আত্মীয় এবং তাঁহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত অনাত্মীয় অনেকেই শুভাগমন পূর্ব্বক এই অচলায়তনটির অসংখ্য কক্ষগুলি স্থায়ীভাবেই পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। নিন্দুকদের মুখে এ সম্বন্ধে এরূপ অপবাদও রটিয়া থাকে যে, ইহারা বনোয়ারীলালের পরিজনবর্গের সামীল হইয়া মান-মন্দির পরিপূর্ণ করিলেও ইহাদের তরফ হইতে মাসান্তে নিয়মিতভাবে নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের একটা টাকা বনোয়ারীলালের হাতে আসিয়া থাকে। কথাটা কানে বাজিলেও তাহা গ্রাহ্য করিয়া সোরগোল তুলিবার দুর্ব্বুদ্ধি কোন দিনই বনোয়ারীলালের অন্তরকে বিক্ষুব্ধ করে নাই। গভীর জলের মাছের মতই তিনি থাকিতেন এ সম্বন্ধে অচঞ্চল ও নির্ব্বিকার।

বরং অন্তরঙ্গদের সহিত আলাপসূত্রে এবং রাজা সাহেবের মজলিসে কথা প্রসঙ্গে জাঁক করিয়া তিনি বহু পোষ্য প্রতিপালনের কথাটা শুনাইয়া দিয়া বাহোবা লইতেই চাহিতেন।

কিন্তু নবাগত বাঙ্গালী বাবুটির আবির্ভাব এবং রাজা সাহেবের অনুরূপ আড়ম্বরে সহরের সেরা বাড়ীতে অবস্থিতি রাজধানীর অধিবাসীদিগকে চমৎকৃত করিয়া তুলিল। তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই রইস লোকটি দেওয়ান সাহেবের উপরওয়ালা হইয়াই এ রাজ্যে আসিয়াছেন, নতুবা তাঁহার আদব-কায়দা এত ভারি হইবে কেন ?

বনোয়ারীলাল সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তিনি রাজা সাহেব ব্যতীত অপর কাহারও নিকট নত হইবেন না, নিজের মর্য্যাদাকে কিছুতেই খর্ব্ব হইতে দিবেন ন। এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়া অন্যান্য পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের মত তিনি নূতন মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণের সময় তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিতে ও আনুগত্য স্বীকার করিতে বিরত রহিলেন।

ওদিকে সম্মানব্যঞ্জক তোপ-ধ্বনির সহিত আনন্দময় রাজপণ্ডিত প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিবামাত্রই সমবেত পদস্থ কর্ম্মচারীবর্গ একে একে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া পরিচিত হইলেন। অল্প কথায় আনন্দময় প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—দেওয়ান বনোয়ারীলালকে ত দেখছি না। তিনি কোথায় ?

জনৈক কর্ম্মচারী জানাইলেন—তাঁহার তবিয়ৎ ভাল নেই।

হিংসা ও অহিংসা

আনন্দময় বলিলেন—আজকের দিনে তাঁর তবিয়তকে ভাল রাখা উচিত। আমার কাজ তাঁর সঙ্গেই। তাঁকে আমি চাই।

পার্শ্বেই আশাশোঁটাধারী চোপদার দণ্ডায়মান ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া হুকুম দিলেন—দেওয়ান সাহেবকে সেলাম দাও।

বনোয়ারীলালের সঙ্কল্পের উপর এই প্রথম আঘাত পড়িল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, আঘাত রোধ করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত। বাধ্য হইয়াই মন্ত্রীর সেরেস্তায় প্রবেশ করিতে হইল তাঁহাকে নিজের আদব-কায়দা বজায় রাখিয়া।

আনন্দময় সে সময় পার্শ্বোপবিষ্ট প্রফেসর চ্যাটার্জ্জীর সহিত একটা তালিকা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। রাজ-সরকারের বিভিন্ন সেরেস্তার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা তাহাদের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট। দেওয়ানজীকে দেখিবামাত্রই ইহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন জানাইলেন। দেওয়ানজীর অন্তর বিদ্রোহন্মুখ হইলেও তাঁহার মাথাটি যেন সম্মুখে উপবিষ্ট এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটির নিকট আপনিই নত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ হইতে ধ্বনি বাহির হইল—বন্দেগী পণ্ডিতজী!

আনন্দময় বাম হাতখানি ঈষৎ হেলাইয়া দণ্ডায়মান কর্ম্মচারীদিগকে আসন গ্রহণের নির্দ্দেশ দিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি ললাটের দিকে তুলিলেন দেওয়ানজীর অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন—তবিয়ৎ আপনার ভালই ত দেখছি, তবে ঠিক সময়ে আসেন নি কেন?

প্রশ্নটি যেন তড়িৎপৃষ্টের ন্যায় দেওয়ান বনোয়ারীলালের সর্ব্বাঙ্গ

আড়ষ্ট করিয়া দিল। রামদুর্গ ষ্টেটের সংস্রবে আসিয়া অবধি এপর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে এভাবে প্রশ্ন করিতে সাহস পান নাই। তাঁহার মনে হইল, অধীনস্থ পদস্থ কর্ম্মচারীদের সমক্ষে তিনি ভূগর্ভে নামিয়া যাইতেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই পূর্ব্ব প্রতিপত্তির স্মৃতি তাঁহাকে 'যেন প্রকৃতিস্থ করিয়া দিল। বুদ্ধিমানের মত এ অবস্থায় স্থান ত্যাগই তিনি সমীচীন মনে করিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে নিরুত্তরে দ্বারের দিকে ফিরিতে দেখিয়াই আনন্দময়ের কণ্ঠনিঃসৃত সুগম্ভীর স্বর যেন কাঁসরের মত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—শুনুন, কথা আছে।

মুখখানা শক্ত ও আরক্ত করিয়া বনোয়ারীলাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, পরক্ষণে কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—আপনি কি আমাকে সরকারের সেরেস্তার কোন মুহুরী ভেবে নিয়ে এভাবে অপমান করছেন?

আনন্দময়ের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে সরস স্বর বাহির হইল—একথা বলবার মানে? মুহুরীই যদি আপনি হতেন, অপমান আমি করব কেন?

বনোয়ারীলাল কহিলেন—আসবামাত্র আমাকে এভাবে প্রশ্ন করার মানেই আমাকে অপমান করা।

আনন্দময় দৃঢ়স্বরে কহিলেন—যদি তাই আপনি মনে করেন, আমাকে এ প্রশ্ন করবার সুযোগ দিলেন কেন? সরকারের সমস্ত সেরেস্তার একটা পরিবর্ত্তন আজ হচ্ছে, রাজা সাহেব তাঁর সরকারকে নতুন করে গড়বার জন্য আমাকে এখানে আনিয়েছেন, আর আজই আমাকে সে ভার নিতে হবে—এ সব জেনেও আপনি তফাতে

রইলেন কেন? অথচ, আপনি ভালভাবে জানেন—আপনার সঙ্গেই আমার কাজের সম্বন্ধ বেশী, আগাগোড়া সমস্তই আমাকে বুঝে নিতে হবে আপনার কাছে। কাজেই আপনাকে সেলাম দিয়ে আনিয়ে প্রশ্নটা করা কি অন্যায় হয়েছে?

কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময়ের উভয় চক্ষুর ভিতরে কালো কালো দুইটি সুবৃহৎ তারা বর্ত্তুলাকারে ঘুরিয়া কপালের দিকে ঠেলিয়া উঠিল। বনোয়ারীলালের মনে হইল—সেই দুইটি তারার ভিতর হইতে একটা অদ্ভুত রকমের দীপ্তি সূর্য্যরশ্মির মত বাহির হইয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া দিতেছে। এই অসামান্য দৃষ্টির সংঘাতে তাঁহার প্রতিবাদের স্পৃহা এবং বিতর্কের ক্ষমতা সমস্তই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তিনি এতক্ষণে উপলব্ধি করিলেন, রাজা সাহেব সত্যই এক বিরাট পুরুষকে বরণ করিয়া আনিয়া রামদুর্গ রাজ্যের চূড়ার উপর বসাইয়া দিয়াছেন। মুখখানি নত করিয়া তিনি অতঃপর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মানুষ চিনিতে এবং তাহাকে বশীভূত করিতে কিভাবে মানসিক প্রভাব প্রয়োগ করিতে হয়, আনন্দময়ের তাহাতে অসামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। প্রকাশ্যভাবে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অপ্রকাশ্যে তিনি দেওয়ান বনোয়ারীলাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু তথ্যই সংগ্রহ করিয়া কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রথমেই যে দেওয়ান বনোয়ারীলালের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিবে, এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একেবারে নিঃসন্দেহ। ঘটনাচক্রে দেওয়ান নিজেই

একটা অপ্রীতিকর অবস্থার প্রকাশকে সহজ করিয়া দিলেন, আনন্দময়ও তৎপরতার সহিত এই সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে মাত করিয়া ফেলিলেন।

নিরুত্তর ও চিন্তাবিহ্বল বনোয়ারীলালের দিকে এবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া এবং নিকটের আসনখানি দেখাইয়া আনন্দময় কহিলেন—বসুন আপনি, কাজের কথা হোক।

নীরবেই বনোয়ারীলাল নির্দ্দিষ্ট আসনখানিতে বসিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আনন্দময়ের মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র।

আনন্দময় কহিলেন—দেখুন, এঁদের সকলকেই আমি বলেছি, এখন আপনাকেও বলছি—এই রাজ্যটিকে প্রথম শ্রেণীর উন্নত রাজ্যের পর্য্যায়ে তুলতে হলে প্রত্যেক পদস্থ কর্ম্মচারীকেই প্রাণপণ শক্তিতে পরিশ্রম করতে হবে। যিনি যে বিভাগের ভার নিয়ে আছেন, আমি তাঁর কাছ থেকে সেই বিভাগের আগাগোড়া একটা নিখুঁত হিসাব চেয়েছি। এক পক্ষের মধ্যে এ হিসাব আমার কাছে দাখিল করতে হবে। এ রাজ্যের আয়বৃদ্ধি সম্পর্কে ছোট বড় সব বন্দোবস্তই আপনার হাত দিয়ে হয়েছে। আমদানী রপ্তানী ব্যাপারেও এপর্য্যন্ত আপনিই একা কর্ত্তৃত্ব করে এসেছেন। এ রাজ্যের তিনটি বিখ্যাত পণ্য তুলা, কাঠ আর তিসির ভাগ্যবিধাতা হয়ে আছেন আপনি। এগুলোর আগাগোড়া হিসাবও আপনাকে তৈরী করে এক পক্ষের মধ্যে দাখিল করতে হবে। এই হিসেব নিকেশের ওপরই এরাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এটা মনে রেখে কাজ করবেন, আমার এইটুকুই অনুরোধ। উপস্থিত এর বেশী কিছু বলবার নেই।

হিংসা ও অহিংসা

এদিনের আলোচনা এখানেই শেষ হইল। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর এই নির্দ্দেশ কোনরূপ বিপত্তির কারণ হইয়া উঠে নাই। কারণ, সালতামামীর সময় তাঁহারা প্রত্যেকেই সেরেস্তার হিসাব-নিকাশ নির্দ্দিষ্ট নজরাণার সহিত দেওয়ান-জীর বরাবর দাখিল করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দেওয়ানজীকে এপর্য্যন্ত কাহারও নিকট তাঁহার কাজের হিসাব বুঝাইয়া দিতে হয় নাই। এখন প্রধান মন্ত্রীর এই তাগিদ তাঁহার কর্ণে বজ্রনির্ঘোষের মত বাজিল।

দুশ্চিন্তার দুর্ব্বিষহ বোঝা মাথায় করিয়া বনোয়ারীলাল মান-মন্দিরে ফিরিতেই পত্নী সীপ্রা বুঝিলেন, একটা কিছু বিপত্তি ঘটিয়াছে। বিপুল দেহের তুলনায় এই মহিলাটির চক্ষু দুটি অতিশয় ক্ষুদ্র, কোটরগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যতদূর সম্ভব জোরে চোখের তারাদুটি কপালের দিকে তুলিয়া তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে বলত? কদিন ধরেই দেখছি কেমন যেন থম থমে ভাব, রাতে ঘুমোও না, ভাল করে খাও না; রাজবাড়ীতে গেলে মুখখানা ভার ক'রে, ফিরে এলে শুকনো মুখ নিয়ে। গোলমাল কিছু হয়েছে নাকি?

বনোয়ারীলাল জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে কিনারায় এসে জাহাজ বুঝি বানচাল হয়।

—বল কি?

—ভাবতুম বুদ্ধির জাহাজ আমি, রাজার কাছে কোনদিন কাজের

কৈফিয়ৎ দিতে হয় নি, যা বলেছি তাই বরাবর মেনে নিয়েছে। কিন্তু বুড়ো বয়সে যে তাঁর মতিগতি বদলে যাবে—সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি।

—মতিগতি বদলালো কি করে! সেই বাঙ্গালী ম্যাষ্টরটাই কি তাহলে—

—হ্যাঁ। নিজের পাযে আমি নিজের হাতেই কুড়ুল চালিয়েছিলুম। রাজার কাছে যাবার পথটি আমিই খুলে দিয়েছিলুম তার। সেই বদমাসটাই রাজার চোখ খুলে দিয়েছে।

—নতুন যে লোকটা উজীব হয়ে এসেছে, তাহলে সেই বাঙ্গালী ম্যাষ্টরটার সলাতেই বল?

—ঠিক! এটা আমার মাথায় আসেনি। এখন মনে হচ্ছে—রীতিমত একটা সলা-পরামর্শ করেই এরা—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বনোয়ারীলাল মুখখানি বিকৃত কবিয়া মাথার টুপীটা খুলিয়া চারপাইয়ের উপর লোষ্ট্রের মত নিক্ষেপ করিলেন।

সীপ্রা কহিলেন—টুপিটা কি দোষ করলে?

বনোয়ারীলাল উত্তর দিলেন—মাথায় টুপী প'রে আমরা বুদ্ধির দেমাক করি, বাঙ্গালীবা ন্যাঙ্গা মাথায় থাকে ব'লে খোঁটা দিই; এখন দেখছি—মাথা খালি রাখে বলেই ওদের মাথায় অত বুদ্ধি। আজই আমি পিনাকীকে লিখবো—সে যেন টুপী ত্যাগ করে, মাথা খালি রাখে। নইলে সে বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর সঙ্গে পেরে উঠবে না।

সীপ্রা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন—বুঝতে পেরেছি, নয়া বাঙ্গালী উজিরী নিয়েই খুসী নয়, আমাদের ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ী মারতে হাত তুলেছে।

—গোড়া থেকে সব ব্যাপারের হিসাব চেয়েছে আমার কাছে।

হিসেব দেওয়া মানে জানিয়ে দেওয়া—পুকুরটাই চুরি হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে লোভটাকে একটু সামলানই ভাল ছিল।

মুখখানি মচকাইয়া সীপ্রা কহিলেন—যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই। এখন ঐ লোকটার সঙ্গে একটা রফা করে ফেল। পয়সার জন্যে বিদেশে যখন চাকরী করতে এসেছে, মোটা রকমের ছাঁদা একটা পেলে বর্তে যাবে তখন, দেখবে তোমার গোলাম ব'নে যাবে। টাকার মার সেরা মার।

বনোয়ারী লালের চক্ষুর তারা দুটি সহসা চকচক করিয়া উঠিল। ম্লান মুখে হাসির ঈষৎ আভা ফুটাইয়া কহিল—এ বুদ্ধিটা কিন্তু আমার মাথায় আসেনি। সাধে কি টুপীর ওপর রাগ হয়! এই দেখ না—তোমরা টুপী মাথায় দাও না বলে, মাথা কত সাফ, খপ্ করে একটা ফন্দী মাথায় এসে গেল!

অতঃপর কি ভাবে নয়া উজীরের মুখখানা টাকা দিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে, স্বামি-স্ত্রী তাহার পরামর্শ আঁটিতে বসিলেন।

নূতন মন্ত্রীর নিরপেক্ষ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাজ্যাঙ্গে নিবদ্ধ হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্যবাসীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিল। ফলে রামদুর্গ রাজ্যমধ্যে এই প্রথম একটা আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিল। রাজ্যের অভিজাত সমাজ ইহাতে ক্ষুন্ন এবং সাধারণ জনসমাজ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আনন্দময় এ রাজ্যে আসিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন—অভিজাত শ্রেণীর 'রইস'রাই বৈধ ও অবৈধ দ্বিবিধ উপায়ে যাবতীয় সুখ ও

সুবিধাগুলি উপভোগ করিয়া থাকেন। শিক্ষা-দীক্ষার আলোক-রশ্মি তাঁহাদের অন্তরগুলির উপর বিক্ষিপ্ত না হইলেও আভিজাত্যের পরোয়ানার প্রভাবে তাঁহারাই রাজ্যের শ্রেষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। রাজ সরকারের সকল স্তরেই ইঁহাদের দ্বার অবারিত। অন্যদিকে আভিজাত্যের বাহিরে যাহারা পড়িয়া আছে—জনসাধারণ বলিয়া যাহারা পরিগণিত, তাহারা যতই শ্রমশীল এবং জীবিকানির্ব্বাহে অভ্যস্ত হোক না কেন, মাথা তুলিয়া মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার মত কোন প্রচেষ্টাই তাহাদের নাই। শিক্ষা-দীক্ষার দুর্গম দুর্গের অলি-গলির ভিতরে জন্মান্তরের সুকৃতি বলে যাহারা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আলোর সামান্য সন্ধান পাইয়াছে—সেই আলোকে রাজ-সরকারে রাজস্ব প্রদানের দাখিলাগুলি পড়িয়া বুঝিবার এবং দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা তুলসীদাসের লেখা রামজীর লীলা মাহাত্ম্য সুর করিয়া প্রতিবাসী-দিগকে শুনাইবার যোগ্যতাটুকু লাভ করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট। রইস-দিগকে ইহারা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া ধন্য হয়, কদাচিৎ সান্নিধ্যে যাইবার সৌভাগ্য পাইলে আভূমি নত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে—এই পর্য্যন্ত। এই সব অভিজাত-শ্রেণীর জীবনের সহিত ইহাদের জীবনের কোন সংযোগ নাই, সংশ্রব নাই, সামঞ্জস্য নাই, কোথায়ও কোন সত্যিকারের মিল নাই। একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও ইহারা নিজেরাই যেন গণ্ডী রচনা করিয়া আপনাদিগকে তফাতে রাখিয়াছে চিরবিচ্ছিন্নের মত। ইহার ফলে এই সব জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্যে বিপদে অভিজাতশ্রেণী নির্ব্বিকার এবং ইহারাও সেই পরিমাণে নির্লিপ্ত ও উদাসীন।

হিংসা ও অহিংসা

এই দুইটি শ্রেণী ছাড়াও আর একটি শ্রেণীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এবং অভিজাত এবং সাধারণ উভয় শ্রেণীই এই শেষোক্ত শ্রেণীটির নামেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। ইহারা অন্ত্যজ নামে অভিহিত। প্রথম দুইটি শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান অর্থ এবং প্রতিষ্ঠাগত। আর, তৃতীয় এই শ্রেণীটির সহিত প্রথম দুইটি শ্রেণীর ব্যবধান বর্ণগত। প্রথম শ্রেণীর ধারণা, তাহারা নরদেবতা, পৃথিবীতে আসিয়াছে ভোগ করিতে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস, তাহারা সাধারণ মানুষ, খাটিয়া খুটিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই তাহাদের কাম্য। আর, শেষোক্ত শ্রেণী জানে, ভগবান জানোয়ার গড়িতে গড়িতে তাহাদিগকে ভুল করিয়া মানুষের মতন করিয়া গড়িয়া ফেলিয়াছেন। তাই সত্যিকার মানুষদের ত্রিসীমানায় যইবার জন্য এত বিধিনিষেধ তাহাদের সম্বন্ধে।

কথাটা সত্য। সহরের প্রকাশ্য ও শ্রেষ্ঠ স্থানগুলিতে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কোন স্থান নাই। নগরের প্রান্তদেশে নদীর অপর পারে অথবা নদীহীন নগরে নগরপতিদের প্রচেষ্টায় খনিত কোন কৃত্রিম নদী, বিল বা খালকে ব্যবধানরূপে রাখিয়া তাহাব অপরাংশে অতি সন্তর্পনে ইহারা বসবাস করে। অবশ্য, নাগরিক জীবনযাত্রায় প্রয়োজন-গুলির অনুরোধে নগর পরিত্যক্ত এই অন্ত্যজগুলির সহায়তাও অপরিহার্য্য। পায়খানার পরিচর্য্যা, রাস্তাঘাটগুলির পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার, শ্মশানের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় সহায়তা—ইহারা ভিন্ন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু নগরবাসীদের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে কিম্বা তাহাদের অগোচরে অতি সন্তর্পণেই ইহাদিগকে কাজগুলি সমাধা করিয়া চোরের মত সরিয়া পড়িতে হয়। ইহাদের চলাচলের

পথও স্বতন্ত্র, চলার পথে ঘটনাচক্রে কোন নগরবাসীর সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা ঘটিলে ইহারা তজ্জন্য আপনাদিগকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া নিশাচর শ্বাপদদের মতই সভয়ে আত্মগোপন করিতে লালায়িত হইয়া উঠে। অথচ পুরুষানুক্রমেই ইহারা নির্ব্বিচারে এইভাবে বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে। ইহাদের বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ কেহ কোনদিন তুলে নাই, কোন নালিশ উঠে নাই, বিধাতার নির্দ্দেশ ভাবিয়াই ইহারা এইরূপ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আনন্দময় সর্ব্বপ্রথম এই দুর্গত জাতিকে জানোয়ারদের অবস্থা হইতে মানুষের পর্য্যায়ে তুলিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে ইস্তাহার দিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন—আবহমান কাল হইতে এই রাজ্যে অস্পৃশ্য জাতিকে যে ভাবে জানোয়ারদের সামীল করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কালোপযোগী নহে। ইহাদের সম্বন্ধে সরকার উদার মনোবৃত্তির সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

কিন্তু এই সুযোগ-সুবিধাগুলির ফিরিস্তি বাহির হইলে নগরবাসীদের নিদ্রার উপর নিষ্ঠুর আঘাত পড়িল। কি সর্ব্বনাশ! নগরের প্রশস্ত রাজপথ বাহিয়া সকল সময় প্রত্যন্তবাসী অস্পৃশ্যদের অবাধ যাতায়াত চলিবে? নাগরিকদের সকল সুযোগ সুবিধা ইহারাও উপভোগ করিবে! পথিমধ্যে কোন নগরবাসীকে দেখিয়া ইহাদিগের আত্ম-গোপন করিবার অতঃপর আর প্রয়োজন হইবে না! নদী বা ইন্দারার বারি, পার্ক বা উদ্যান, আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিবার স্থান, যাবতীয় বিপণী, ধর্ম্মাধিকরণ, সাধারণ দেবায়তন প্রভৃতির সহিত ইহারাও

সংস্রব রাখিতে পারিবে ! চারিদিকে তুমুল কলরব উঠিল, রক্ষণশীল নাগরিকগণ রাজা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই অভিনব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমল প্রতিবাদ তুলিলেন। স্মরণাতীত কাল ধরিয়া যাহা চালু আছে—তাহার পরিবর্ত্তন যে ঘোরতর অন্যায় নানা যুক্তিসহ তাহা প্রকাশ করিলেন।

রাজা সাহেব হাসিয়া বলিলেন—সময়োচিত ব্যবস্থাই হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের সরকার অনেক আগেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেছেন। তার ফলে সেই সব রাজ্যের আজ উন্নতির সীমা নেই। কুসংস্কার নিষ্ঠুরতার সহায়তায় মানবতাকে দাবিয়ে রেখেছিল এতকাল, এবার তার উত্থানের দিন এসেছে। তর্ক করতে চাও ত পণ্ডিতজীর কাছে যাও, তর্কে তাঁকে হারিয়ে হুকুম যদি পাল্টাতে পার আমার আপত্তি নেই।

যাঁহারা জ্ঞান ও বিদ্যার স্পর্দ্ধা করিতেন, আনন্দময়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিতর্ক উপস্থিত করিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল যুক্তি দেখাইলেন, পণ্ডিতদের নিকট তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহারা খেই হারাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আনন্দময় তাঁহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন—আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে, মানুষের জন্যই মানুষ। ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার-পদ্ধতি সবই মানুষের জন্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার-পদ্ধতির জন্য ত আর মানুষ নয় ! তাই এগুলোকে খাড়া করে মানুষের মধ্যে ব্যবধান আনা ঠিক নয়। আচারের নামে আপনারা মানুষের মাঝে ব্যবধানের যে প্রাচীর তুলে রেখেছেন, সে প্রাচীর ভেঙ্গে মানুষে মানুষে মহামিলনের ক্ষেত্র রচনার দিন আজ এসেছে। পাঁচশো

বছর আগে বাঙ্গলায় এক মহাসাধক সর্ব্বপ্রথম সেখান থেকে ভেদের এই প্রাচীর ভেঙ্গে দেন। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। তার অনেক পরে এ যুগে বীর সাধক বিবেকানন্দ আবার নতুন করে মিলনের ক্ষেত্র রচনা করেন। তাঁর বাণীর গোটা কতক কথা বলছি শুনুন। তিনি সমস্ত ভারতবাসীকে ডেকে বলেছিলেন—হে ভারত, তুমি ভুলনা তোমার সমাজ বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র। ভুলনা—নীচ জাতি মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ—সবাই তোমার রক্ত, তোমার ভাই। বল—মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী—আমার ভাই! ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী। বল দিনরাত, মা, আমাদের মনুষ্যত্ব দাও, মানুষ কর।

ইহার পর বাস্তবতার দিক দিয়া আনন্দময় যুক্তি দেখাইলেন—যাদের সাহায্য আপনদের না নিয়ে চলবার উপায় নেই, একদিনের অভাবে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে, তাদের এভাবে তফাত করে রাখা—জন্তু-জানোয়ারদেরও নীচে নামিয়ে দেওয়া, রীতিমত একটা ভণ্ডামী নয় কি?

প্রতিবাদকারীদেব আপত্তি ও বিরক্তি অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই স্তব্ধ হইয়া যায়। এত বড় এক কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলচ্ছেদ করিয়া এবং রাজ্যমধ্যে কোনরূপ অসন্তোষ বিক্ষুব্ধ হইবার সুযোগ না দিয়া আনন্দময় রাজা সাহেবের সহিত রেসিডেণ্ট সাহেবকে পর্য্যন্ত অবাক করিয়া দিলেন! পক্ষান্তরে, অন্ত্যজ-জাতির সঙ্কোচের অবগুণ্ঠণ তিনি

মোচন করিয়া দিলেন বটে, তাই বলিয়া অপ্রত্যাশিত ক্ষমতালাভের সুযোগ লইয়া শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারে যোগ্যতা পাইবার পূর্ব্বেই তাহারা যে উচ্চবর্ণের নাগরিকদের সহিত পাল্লা দিয়া সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবে, এরূপ স্পর্দ্ধা প্রকাশের অবকাশও রাখেন নাই। যে কারণেই হোক, হাজার বৎসর ধরিয়া যাহারা অন্ধকারের গহ্বরে পড়িয়া আছে, আলোর সংস্পর্শে আসিয়াই তাহারা যদি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা ঠিক বাদল-বর্ষার পোকামাকড়ের মতই মর্ম্মন্তুদ হইবে—আলোর বুকে নির্ব্বিচারে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া উদ্দামতার প্রায়শ্চিত্য করিবে।

দেওয়ান বনোয়ারীলাল এই সময় নিজেই বিব্রত, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সুযোগ সুবিধাগুলি যে যে পথে যে ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর, তিনি সে সম্বন্ধে কোনরূপ অবহেলা তাঁহার দীর্ঘ আধিপত্যকালের মধ্যে কোন দিনই করেন নাই। মন্ত্রী তাঁহাকে যাবতীয় হিসাবপত্র বুঝাইয়া দিবার যে সময় দিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল, কিন্তু বনোয়ারীলালের এ বিষয়ে তৎপরতার কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না। এই সঙ্গীন বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে অস্ত্রটি তিনি বাছিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক এই সময় অকস্মাৎ প্রয়োগ করিয়া বসিলেন। অর্থলালশায় যে লোক হাজার মাইল দূরবর্ত্তী দেশে রুটির দায়ে চাকরী করিতে আসিয়াছে, এই নির্ঘাত অস্ত্রের অপূর্ব্ব আঘাত সহ্য করা তাহার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

কিন্তু আশ্চর্য্য ঘটনা,—মন্ত্রী আনন্দময় দেওয়ান বনোয়ারীলালের এহেন সাংঘাতিক অস্ত্রের আঘাতটিকে শুধু ধারণ করিয়া অক্ষত রহিলেন

তাহা নহে, নিক্ষিপ্ত অস্ত্রটি পর্য্যন্ত জব্দ করিয়া লইলেন। লক্ষমুদ্রার আঘাতটি কি সত্যই উপেক্ষা করিবার মত? কিন্তু আনন্দময় যখন দেওয়ানজীর নিজস্ব ভাণ্ডার হইতে নিক্ষিপ্ত এই লক্ষমুদ্রার প্রহরণটি সহাস্তে গ্রহণ করিয়া অস্ত্রবাহী বিশ্বস্ত দূতকে বলিয়া দিলেন—আপনার প্রভুকে ব'লবেন, আমি তার কাছ থেকে এই ধরণের একটা সওগাদের প্রত্যাশা করছিলুম। কিন্তু এতে ত আমার পেট ভরবে না। তিনি হিসেবের পাট এড়িয়ে চললেও, আমি হিসেব করে দেখেছি—বাদ সাদ দিয়ে ধরলেও প্রায় তেইশ লাখ টাকা তিনি ঘরে তুলেছেন। বেশ, আপাততঃ এই টাকাটাই সরকারী তোষাখানায় পাঠিয়ে ওঁর নামে জমা করবার হুকুম দিচ্ছি, আপনি রসিদটা নিয়ে যাবেন, আর দেওয়ান সাহেবকে জানাবেন—বাকি টাকাটাও যেন এই ভাবে জমা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেন।

আনন্দময়ের মুখের কথা যে অন্যথা হইবার জো নাই, অল্পদিনেই তাহা সর্ব্বত্র রাষ্ট হইয়া গিয়াছে। এদিনও যে-কথাগুলি বলিলেন তাহার নড়চড় হইল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বনোয়ারীলালের অর্থবাহককে সরকারী তোষাখানার মোহরযুক্ত রসিদ লইয়া ম্লানমুখে প্রভুর আস্তানায় ফিরিতে হইল।

খবরটা শুনিয়া এবং স্বচক্ষে সরকারী মোহরযুক্ত রসিদখানি দেখিয়া বনোয়ারীলাল পাথরের পুতুলের মত কিছুক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন। এ ঘটনা যে একেবারে অভিনব এবং অপ্রত্যাশিত, কোন রাজসরকারে এই ধরণের নজীর যে ইহার আগে আর কেহ কোনদিন দেখাইতে পারে নাই, একই সরকারে কর্ম্মচারীরূপে সহকর্ম্মীর প্রতি

এরূপ অভদ্রতা যে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর—নিজের শয়নকক্ষের ভিতর অপরিসর একখানি খাটিয়ার উপর বসিয়া ঝিমাইবার ভঙ্গীতে তিনি এগুলি বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ধড়িবাজ বাহাদুর মানুষটির চরিত্র বা আচরণ এভাবে পর্য্যালোচনা করিতেও তিনি যেন কুণ্ঠিত! তাঁহার হিসাব যে এমন মারাত্মক হইবে এবং হাতের জাল জলে না পড়িয়া তাঁহাকেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ফেলিবে, তাহা যে কল্পনারও অতীত! রাগটা এখন নিজের দেহটাকে আবৃত করিয়া আর একটি আধার খুঁজিতে লাগিল। মনে পড়িয়া গেল, ফন্দীটি প্রথম তাঁহার মাথাতেই জাল রচনা করে নাই, জালের সুতাগুলি স্বহস্তে পাকাইয়া দিয়াছিলেন যে সহধর্ম্মিণী সীপ্রা।

বিশ্বস্ত বাহকের মুখে খবরটা পাইয়া সীপ্রাও ঠিক এই সময় আস্তে আস্তে স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুখখানি বিষণ্ণ, চোখদুটি নিষ্প্রভ, কোলে কালিমা পড়িয়াছে।

বনোয়ারীলাল তাঁহাকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—তোমার বুদ্ধির ব'ড়েও মাত হয়ে গেল। এমন বেকুব আর কখন বনি নি।

সীপ্রা তাঁহার বিষণ্ণ মসিবর্ণ মুখখানি ঘুরাইয়া প্রতিবাদের ভঙ্গীতে চড়া স্বরে বলিলেন—বেকুবি ত আগেই করেছ, বুদ্ধির ব'ড়ে মাত হবে তাতে আর কথা কি? এ-সব কাজ কি বকলমে চলে? কোন্ হিসেবে অতগুলো টাকার নোট তুমি লোক দিয়ে ঐ জাঁহাবাজ লোকটার কাছে পাঠালে? নিজে গিয়ে কথা পেড়ে গতিক বুঝে কাজ যদি করতে, পেঁয়াজ-পয়জার এভাবে হ'তনা। সোলে না হয় নাই হ'ত,

কিন্তু অতগুলো টাকা ত বেরিয়ে যেত না! একেই বলে—শিঙ্গে হারিয়ে হাতে ফুঁ!

বনোয়ারীলাল স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিলেন—দেখছি, এখন আমাব হারের পালাই পড়েছে। সুদিনের যে বুদ্ধির জোরে ধুলোমুঠি ধরে সোনা মুঠি করেছি, আজ সেই বুদ্ধির ফেরে ঘরের সোনা পরের ঘরে চালিয়ে দিচ্ছি! নাঃ, আমাকে এবার কাজে ইস্তফা দিয়ে ছেলেটাকেই তৈরী করতে হবে।

সিপ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন—তার মানে? পড়াশুনা ছাড়িয়ে পিনাকীকে চাকরীতে ঢুকিয়ে দিতে চাও নাকি?

বনোয়ারীলাল কহিলেন—পাগল! পড়াশুনা ছাড়াব আমি তাকে? জ্যোতিষীরা পিনাকীর জন্মকোষ্ঠী দেখে বলেছে, এ ছেলে একদিন দেশের মাথা হবে, ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র, সাধু-অসাধু, রাজা-প্রজা—সবার মাথায় পা দিয়ে চলবে। এ ছেলেকে আমি লেখাপড়া ছাড়িয়ে চাকরীর ঘানিতে জুড়ে দেব,—আরে ছোঃ!

ঔৎসুক্যের সুরে সিপ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে হঠাৎ তার কথা তোলবার মনে? সঙ্কল্পটা খুলেই বল না শুনি!

মুখমণ্ডলটির এক বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া বনোয়ারীলাল কহিলেন—তবে শোন বলি—ঐ প্রফেসর চ্যাটার্জ্জী থেকে সুরু করে ধড়িবাজ ব্যানার্জ্জী পর্য্যন্ত আমাকে যে কত নাকাল করেছে, দিনে দিনে আমার দেহের রক্ত কিভাবে জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বুকের ভিতরটা ওরা কেমন করে ফাঁফরা করে দিয়েছে—দিনের পর দিনের ঘটনা ধরে ওকে লিখেছি আর জানিয়েছি—'যদি আমার ছেলে হও সত্যি, এর শোধ

তোমাকে তুলতেই হবে ; তার জন্যে তৈরী হও।' তুমি ত জানো, ছেলে আমার কি রকম জেদি। আমি জানি, সে তার গায়ের চামড়ার উপরে আমার কথাগুলো এমন কালিতে লিখে নেবে—কস্মিনকালেও মুছবে না। আমি জেনেছি, আমার দ্বারায় এদের জব্দ করা হবে না, জব্দ করবে আমার ছেলে—কল্কীর মতন সংহার-মূর্ত্তি ধরে ধেয়ে এসে এর শোধ তুলবে সে।

বনোয়ারীলালের মুখখানি তখন ভীমরুলের চাকের মত ভীষণ ও ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। সিপ্রা অবাক-বিস্ময়ে স্বামীর বীভৎস মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ছয় মাস পরের কথা। রামদুর্গ রাজ্যের সকলেই সবিস্ময়ে শুনিলেন, রাজ্যের মহামান্য দেওয়ান বনোয়ারীলাল বারোয়া দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তীর্থযাত্রা করিতেছেন। সরকার তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, দেওয়ান সাহেবের পুত্র পিনাকীলাল কৃতবিদ্য হইলে রাজ্যের কোন বিশিষ্ট পদে তাঁহাকে গ্রহণ করা হইবে।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সংবাদটির অন্তরালে যে কৌতূহলোদ্দীপক আখ্যায়িকাটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা পিনাকীলালের উদ্দেশে লিখিত বনোয়ারীলালের সুদীর্ঘ পত্রেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইবে। এই ঐতিহাসিক পত্রখানির সহিত রামদুর্গ-রাজ্য-সংক্রান্ত বহু তথ্য এবং পিনাকীলালের পরবর্ত্তী কার্য্যপদ্ধতির রহস্য নিবিড় হইয়া রহিয়াছে।

পিনাকী তখন বোম্বাই সহরে ইউনিভারসিটি হোষ্টেলে থাকে এবং উৎসাহের সহিত কলেজে অধ্যয়ন করে। এফ, এ, পরীক্ষার

জন্য যখন সে প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় সর্ব্বপ্রথম স্নেহময় পিতার পত্র তাহাকে বিচলিত বিক্ষুব্ধ ও বিজিগীষু করিয়া তোলে। শৈশবাবধি পিনাকী অন্ধভাবে পিতার আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। পিতাই তাহার দৃষ্টিতে প্রকৃত দেবতা, জীবনে কোনদিন কদাচ সে পিতার কথার অন্যথা করে নাই। পিতাকে পরিতুষ্ট করিতে, পিতৃ-আদেশ অনুসরণ করিয়া যে-কোন দুঃসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হইতে পিনাকী সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এ-হেন পূজাপাদ পিতৃদেবের পত্রে সে জ্ঞাত হইল যে, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ও বিপুল শ্রমে যে রাজ্যটি সুগঠিত হইয়াছে, এতদিন যে-রাজ্যে তিনিই ছিলেন কর্ণধার, এখন সেখানে দূরদৃষ্টক্রমে তাঁহার অপমান আরম্ভ হইয়াছে। মছলী-ভোজী এক-অনাচারী বাঙ্গালী—কৃপাপরবশ হইয়া যাহার চাকুরী তিনি মঞ্জুর করিয়াছিলেন,—এখন সে তাঁহার ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং রাজাকে কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহাব বিরুদ্ধাচারী করিয়া তুলিয়াছে।

পিতার এই প্রথম পত্রখানি পিনাকীর অন্তর-মধ্যে এরূপ দাহ উপস্থিত করে যে, সমস্ত দিনটা তাহার দারুণ বিতৃষ্ণায় অনশনে কাটিয়া যায়। সে-সময় কলিকাতাবাসী এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী মেসার্স জন ডিকিনসন কোম্পানীর আফিসের মুৎসুদ্দী ছিলেন এবং সপরিবার সাড়ম্বরে বোম্বাই শহরে বাস করিতেন; পিনাকীর পিতা এক সামন্ত রাজ্যের দেওয়ান এবং বিপুল ধনসম্পত্তিশালী হইলেও, পিনাকী ছিল অতিশয় মিতব্যয়ী। পিতার প্রেরিত অর্থের অধিকাংশ সঞ্চয় করিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে সে পড়াশুনার খরচ চালাইত। বাঙ্গালী মুৎসুদ্দীবাবু পিনাকীকে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন দেখিয়া তাহাব

শিশুপুত্রদের ইংরাজী শিক্ষার ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু পিতার ঐ পত্রখানা পাইয়াই পিনাকীর উত্তেজনা এরূপ উদ্ধত হইয়া উঠে যে, তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখিয়া সে-কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়া তবে স্বস্তি লাভ করে। মুৎসুদ্দীবাবু কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে পিনাকী উদ্ধতভাবে উত্তর দেয়—বাঙ্গালীর কাছে চাকরী করতে আমার বিবেক বাধা দিচ্ছে।

পিতার লিখিত প্রথম সংক্ষিপ্ত পত্রের ফল যেথানে এরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠে, পরবর্ত্তী পত্রগুলি এই পিতৃভক্ত তরুণ পুত্রের মনোবৃত্তি বাঙ্গালী-বিদ্বেষে কিরূপ বিকৃত করিয়া তোলে—ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পিনাকী যখন এফ-এ পরীক্ষা দেয়, বনোয়ারীলালের অবস্থা তখন সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রী আনন্দময় তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি প্রায় তেইশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। যে-একলক্ষ টাকা তিনি উস্থল দিয়াছেন, তাহা উক্ত বিপুল অর্থের অংশ মাত্র। সমগ্র অর্থই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

পুত্র পিনাকীলাল এ অবস্থায় রাজধানীতে আসিয়া পাছে পিতার দুর্দ্দশায় মর্ম্মাহত হয়, এই আশঙ্কায় বনোয়ারীলাল তাহাকে পরীক্ষার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত বোম্বাই শহরেই থাকিবার নির্দ্দেশ দেন। পিনাকী ক্ষুব্ধ চিত্তে পরীক্ষার ফল প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

আনন্দময় দৃঢ়চেতা পুরুষ হইলেও মানীর সম্মানে সহসা আঘাত করিতেন না। যে-ব্যক্তি একদা এই রাজ্যে রাজার মত সম্মান ভোগ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার সমূহ অবকাশ সত্ত্বেও

লোকচক্ষুর অন্তরালে অপ্রকাশ্যে দণ্ডিত এবং প্রকাশ্যে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে অবসরপ্রাপ্ত-রূপে অভিহিত করিলেন। রামদুর্গ রাজ্যের মধ্যে বনোয়ারীলালের যাবতীয় সম্পত্তি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত অর্থরাজি সরকারে জব্দ করিয়াও প্রায় দশলক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িল। স্থির হইল, এই টাকা বনোয়ারীলালের পেনসন হইতে অর্দ্ধাংশ উসুল করা হইবে এবং তাঁহার পুত্র পিনাকীলাল কৃতবিদ্য হইলে তাহাকে তাহার যোগ্যতার অনুরূপ কার্য্যে বাহাল করা যাইবে। পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য সরকার তাহাকে সুযোগ প্রদানে ত্রুটি করিবেন না।—এই-যে সর্ত্ত তাহা বিশেষ গোপনীয় রূপে মন্ত্রীর সেরেস্তায় সুরক্ষিত রহিল। সাধারণের গোচরার্থ ঘোষণা করা হইল যে, ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বনোয়ারী-লাল বারোয়া সরকারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সরকার তাঁহাকে মাসিক পাঁচশত টাকা হিসাবে পেনসন দিবেন।

এইভাবে অর্থগত অপ্রীতিকর অবস্থাটির মীমাংসা হইবার কয়েক দিন পরেই এফ-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। পিনাকীলাল তার-যোগে পিতাকে জানাইল, সে প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং বাড়ী যাইবার জন্য আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে।

তিন দিন পরে পিতার স্বহস্তে লিখিত এক দীর্ঘ পত্র পিনাকীর হস্তগত হইল। পত্রের প্রথমেই লোহিতাক্ষরে লিখিত পিতার নির্দ্দেশটি তাহাকে চমকিত করিয়া দিল। পুত্রকে শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনের পূর্ব্বেই গোটা গোটা অক্ষরে পিতা লিখিয়াছেন—

'সাঁঝে সকালে দুইবেলা সকল কাজের আগে ইহা প্রত্যহ পড়িবে।'

অতঃপর পিনাকী পড়িতে আরম্ভ করিল :

হিংসা ও অহিংসা

প্রাণাধিক পিনাকী,

শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এই যে, পিতার ঋণ পুত্র পরিশোধ করিবে ; পিতার অদম্য শত্রুকে দমন করিবে, যে বা যাহারা পিতার অপমান করে, পুত্র তাহার প্রতিশোধ লইবে। ভাগ্য-দেবতার পরিহাসে তোমার পিতা আজ ঋণী, শত্রু কর্ত্তৃক দলিত, অপমানিত, গৃহচ্যুত, সর্ব্বহারা। তুমি পুত্র, একমাত্র পুত্র, উপযুক্ত পুত্র আমার, প্রতিকার করিবে তুমি।

সারা যৌবনের শক্তি সম্বিত উৎসাহ বুদ্ধি জলের মত ঢালিয়া দিয়া রামদুর্গ রাজ্যকে চাঙ্গা করিয়াছিলাম ; কত বিচিত্র কৌশলে বহু দুর্ব্বার বিপদের মুখ হইতে এই রাজ্যটিকে বাঁচাইয়া রাজাসাহেবের সুখ্যাতি পাইয়াছিলাম তাহা কে না জানে ! তখন রামদুর্গ রাজ্যের সঙ্গে দেওয়ান বনোয়ারীলালের নাম জড়াইয়া থাকিত, দেওয়ান সাহেবের ইচ্ছাতেই রাজা সাহেবের ইচ্ছা চলিত।

আজ আর সেদিন নাই। হাজার মাইল তফাতে যে জঙ্গলীদেশ, দেমাক আর দগাদারী যেখানে পয়দা হয়—সেই দেশের দুটি লোক এই রাজ্যে আসিয়া রাজাকে বানাইয়াছে গোলাম আর রাজ্যের মানুষগুলাকে করিয়াছে যাদু। তাহারা যাহা বলিতেছে ও করিতেছে রাজা হইতে রাজ্যের নীচ অন্ত্যজরা পর্য্যন্ত তাহাই সাধু সাধু বলিয়া মানিয়া লইতেছে। শুধু দেওয়ান বনোয়ারীলাল তাহাতে সায় দিতে পারে নাই বলিয়া এই দুই যাদুকর বাঙ্গালীর চক্ষুশূল হইয়াছে। তাহার ফল কি সাংঘাতিক হইয়াছে শুনিলে তোমার দেহের রক্ত হিম হইয়া যাইবে।

রাজার অংশ রাজাকে অর্পণ করিয়া নিজের বুদ্ধি-কৌশলে আমি

যদি অতিরিক্ত কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকি তাহা কি অন্যায়? তুলা, তিসি, কাঠ রাজ্য হইতে বাহিরে কোনদিন চালান যাইত না, আমি যদি অন্যের নামে তাহা চালাইবার ব্যবস্থা করি, রাজার প্রাপ্যগুলো রাজাকে দিয়া লভ্যাংশ নিজে লই, তাহা অবৈধ বলিয়া কেন গণ্য হইবে? কিন্তু বৎস, তাহা হইয়াছে। বাঙ্গালী মন্ত্রী আনন্দময় রাজ-পণ্ডিতের বিচারে এবং হিসাবে আমি তেইশ লক্ষ টাকা অবৈধ উপায়ে আত্মসাৎ করিয়াছি! পাছে, অভিযোগটি প্রকাশ্যভাবে তুলিলে এই রাজ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ে, তাই গোপনে আমার স্বোপার্জ্জিত তেরো লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত এবং আরও দশ লক্ষ টাকার জন্য দায়বদ্ধ করিয়া আমাকে কার্য্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য করিয়াছে। সর্ত্ত হইয়াছে—পেনসনের দরুণ ধার্য্য মাসিক পাঁচ শত টাকার অর্দ্ধাংশ উক্ত দেনায় যাইবে এবং তুমি কৃতবিদ্য হইলে তোমার যোগ্যতানুযায়ী সরকারী চাকরি দিয়া তাহা হইতে ঐ টাকা উসুল করা হইবে। এরূপ অবস্থায় আমার প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। যেখানে দীর্ঘকাল বিপুল গৌরবে জনবৃন্দের উপর প্রভুত্ব করিয়াছি, এরূপ হীন অবস্থায় কিরূপে সেখানে বসবাস করিব? বিশেষতঃ যাবতীয় ভূসম্পত্তিই যখন সরকারে জব্দ হইয়াছে। তাই স্থির করিয়াছি, রাজ্যের প্রান্তভাগে তাপ্তি নদীর তীরে তোমার মাতৃদেবীর নামে যে মৌজাখানি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছি, সেইখানেই গিয়া নূতন করিয়া নীড় বাঁধিব এবং সেই অনাড়ম্বর পল্লী-ভবনে বসিয়া তোমার সাফল্যের প্রতীক্ষা করিব। এক্ষেত্রে কোন্ মুখে তোমাকে রামদুর্গ রাজ্যের রাজধানীতে আসিবার জন্য অনুরোধ করি

এখন আমার ইচ্ছা এই যে, অবিলম্বে তুমি বিলাত রওনা হইয়া যাও এবং সেখানে থাকিয়া কৃতবিদ্য হও। মনে রাখিও—পিতৃঋণ তোমাকে পরিশোধ করিতে হইবে, পিতৃ-শত্রুদিগকে তুমি দমন করিয়া, পিতার প্রতি যে লাঞ্ছনা ও অপমান হইয়াছে, তাহার প্রতিকার তুমি করিবে—প্রতিশোধ তুমি লইবে।

বিলাতে গিয়া এজন্য তোমার কঠোর সাধনা প্রয়োজন। ইহার জন্য অর্থের চিন্তা করিও না। আমি যদিও জীবন-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছি, কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হই নাই। বিলাতের ব্যাঙ্কে তোমার নামে যে সাত লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছি, কৃতবিদ্য হইবার জন্য তুমি তাহা সমস্তই অকাতরে ব্যয় করিলেও নিস্ব হইবে না। উপযুক্ত সময়ে সমস্ত হিসাব পাইবে। মন্ত্রী আনন্দময় রাজাসাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ত্ত দিয়াছে যে,—কৃতবিদ্য হইয়া যোগ্যতানুযায়ী সরকারী চাকরী লইয়া আমার ঋণ তুমি উসুল করিবে। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি—কৃতবিদ্য হইয়া এই রাজ্যের সরকারের সহিত—তোমার পিতার অপমানকারী শত্রুদের উৎখাত করিয়া তুমি পিতৃঋণ পরিশোধ কর। এ কার্য্যে ঈশ্বরের সাহায্য যদি না পাও, নির্ব্বিচারে তুমি সয়তানের সাহায্য লইও—এই তোমার পিতার আদেশ !

উক্ত আদেশ পিনাকীলাল যে সসম্মানে শিরোধার্য্য করিয়াছে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস আপনারা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন এবং ইহার পরেও পাইবেন।

* *
*

হিংসা ও অহিংসা

মিস এলাই যে 'ব্যটারফ্লাই' হইয়াছে, মিসেস ফ্লাওয়ার্স তাহা জানিতেন না। তাঁহার কারবারটির বার্ষিক হিসাব-পত্রাদি সম্পর্কে ব্যস্ত থাকায় এই সময়টা ছেলেদের খানাপিনার ভারটুকু কন্যার উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মেয়ে বড় হইতেছে, একদিন তাহাকেই এই 'কটেজ' চালাইতে হইবে, হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা ত চাই, বিশেষতঃ খানার সময় এলাই উপস্থিত থাকিলে ছেলেদিগকে যখন উৎফুল্লই দেখা যায়। এই সব ভাবিয়াই তিনি কয়টি দিন অবসর লইয়াছিলেন এবং সেই সময়েই ঐ কাণ্ডটি ঘটিয়া যায়। সে দিনের ব্যাপারটির কয়েক দিন পরে ডিনারের সময় হলের ধার দিয়া যাইবার সময় কন্যার উদ্দেশে এই নূতন সম্ভাষণ সহসা তাঁহার কানে বাজিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পরদার অন্তরালে নীরবে দাঁড়াইয়া ভিতরের সংলাপ সংগ্রহ করিতে উৎকর্ণ হইলেন।

টম নামে ছেলেটি তখন জোর গলায় বলিতেছিল—দেখছ কি মিস্ ব্যটারফ্লাই, পিনেস্ ডবল ডিমের আমলেট এক কামড়ে নিঃশেষ করে ফেললে—আর রক্ষে নেই!

মারাঠী ছেলে ভবানীশঙ্কর কহিল—ভাল করলে না মিস্ ব্যটারফ্লাই, পোষা নেকড়েকে রক্তের স্বাদ দেখালে সে সুযোগ বুঝে মালিকের ঘাড় মটকে রক্ত খায়।

আইরিস-ছেলে আরউইন কহিল—মিষ্টার পিনেস এর পর তোমা-দের কটেজকে ফেল করে ছাড়বে মিস্ ব্যটারফ্লাই!

সত্যব্রত পিনাকীর পাশেই বসিয়াছিল, সে ছেলেদের কথার পীঠে

কোন কথা না বলিয়া পিনাকীর পানে চাহিয়া সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—পিনাকীর আর কি চাই ?

যদিও সেদিন পাকে-চক্রে পড়িয়া পিনাকী মাছের চপ পরম পরিতৃপ্তির সহিত চর্ব্বণ করিয়াছিল এবং তাহার পরে চপ নামক আমীষ-জাতীয় বস্তুটির আস্বাদ লইতে আর আপত্তি তুলে নাই, কিন্তু এদিনের ভোজের টেবিলে ডিমের ব্যাপারে সে একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মাছ না হয় সে খাইয়াছে, মাংসও সে মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু ডিমকে কিছুতেই সে স্বীকার করিতে পারে না। তাহার দেশভূমিতে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতির মধ্যেই ডিমের প্রচলন সীমাবদ্ধ। বাঙ্গালীরা ডিমের ভারি ভক্ত, একথা সে শুনিয়াছে। কিন্তু তাহার ডিসে কিছুতেই সে এই অস্পৃশ্য বস্তুটিকে ঘেঁসিতে দিবে না, অনশন করিবে তাহাও ভালো।

মিস্ এলাই প্রথমটা ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। বেচারা পিনাকীর জন্য সে ডবল-ডিমের একখানা বড় মামলেট সদ্য ভর্জ্জিত অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মেজাজ আজ ভয়ঙ্কর রুক্ষ দেখিয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। পরক্ষণেই চক্রান্তকারী-দের চোখের ইঙ্গিত এই প্রগলভা মেয়েটিকে এক নিমেষে সপ্রতিভ করিয়া দেয়। সে যুক্তি দেখায়—এ যে তোমার গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা হচ্ছে পিনেস মশাই! বিনা ডিমে বুঝি চপ কখনো তৈরী হয়? পলিটিক্স প'ড়ে প'ড়ে তোমার মাথা দেখছি ভোঁতা হয়ে গেছে। ডিমের শক্তি কত জানো? মস্তিষ্কের প্রাণ-শক্তি বাড়ায়, এ, বি, সি, ডি, ই থেকে জেড্ পর্য্যন্ত সমস্ত

শ্রেণীর ভিটামিন গিস্‌গিস্‌ করছে এর মধ্যে ; তাছাড়া এদেশে ডিম ত ভেজিটেবলের সামীল। তোমাকে না খাইয়ে আমি ছাড়বো না।

পিনাকী তথাপি আপত্তি জানায় দৃঢ়তার সঙ্গে। মুখখানা শক্ত করিয়া বলে—এমন করে জবরদস্তি যদি করা হয় খাওয়ার ব্যাপারে, তাহলে আমাকে টেবিল ছেড়ে উঠতে হবে।

পুনরায় চারিদিক হইতে ইঙ্গিত চলিতে থাকে। মিস্‌ এলাইকেও এবার অন্তের ইঙ্গিত মত শেষ চাল চলিতে হয়। ডিসশুদ্ধ আমলেট-খানি সবার সামনে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া সে আদ্রকণ্ঠে বলিতে থাকে—তাহলে আমিও আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে 'প্রমিস্‌' করছি শুনুন—পিনেসমশাই আমার কথা যদি না রাখেন, তাহলে আজ থেকে আমিও ডিম খাবো না, শুধু তাই নয়—ডিমের সম্পর্ক যেখানে থাকবে, তার ত্রিসীমায়ও থাকবো না। কাজেই—এর পর আপনাদের খানার টেবিলে খাবার যোগান দেওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব হবেনা, আর কোন দিন আমাকে দেখতেও পাবেন না, বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়।

অভিনেত্রীর মত ভঙ্গিতে ও স্বরে কথাগুলি বলিয়াই মিস্‌ এলাই যেমন রন্ধনশালার দিকে যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায়, অমনি পিনাকী উঠিয়া গাঢ়স্বরে বলে—বেগ ইয়োর পার্ডন মিস্‌ ব্যাটারফ্লাই, আপনি ত জানেন—আমি কারুর অন্তরে আঘাত দিতে অতিশয় কষ্ট বোধ করি। আমার জন্যে আপনি এতটা ত্যাগ স্বীকার করবেন, ব্যথা পাবেন, আপনার মধুর সঙ্গ থেকে এই ভোজের ঘরখানাকে বঞ্চিত করবেন, এ হ'তেই পারে না। তার চেয়ে আমিই নিজের দুর্জ্জয় জিদকে সরিয়ে দিচ্ছি আমার অন্তর থেকে। দিন আপনি ওটা আমার ডিসে।

মিস্ এলাইয়ের মুখখানা অমনি চাপা হাসিতে ভরিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের ডিসের আমলেটখানি পিনাকীর ডিসে আসিয়া পড়ে। বোয়াল জাতীয় রাক্ষুসে মাছ যেভাবে আহার্য্য দেখিবামাত্র গ্রাস করিয়া ফেলে, পিনাকীও ঠিক সেইভাবে ডিসে পতিত সুকোমল সুশ্রী ও সুস্বাদু পদার্থটি তাহার বদন-বিবরে পূর্ণোদ্যমে ঠাসিতে থাকে। এদিনের ব্যাপারটিও ছেলেদের কৌতুক উদ্রিক্ত করে এবং পিনাকীর ডিম্বাসক্তি সম্বন্ধে তরুণ কণ্ঠগুলি উছলিয়া উঠে।

সত্যব্রত এদিন কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে কোন কথা বলে নাই, তবে অপ্রকাশ্যে মিস্ এলাইয়ের মুখের বাণীতে সে যে সুকৌশলে প্রেরণা যোগাইয়াছিল—ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এসব বিষয়ে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'-নীতিতে অন্যের অগোচরে মাথা খেলাইতে এ ছেলেটি মহা ওস্তাদ। চোখের ইঙ্গিতে এলাইকে মতলব দিয়াই সে একেবারে মুখের ভঙ্গিটা ভাল মানুষের মত করিয়া আহারের দিকেই অখণ্ড মনোযোগ দেয় এবং সময় বুঝিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করে—পিনাকীর আর কি চাই?

অন্যান্য ছেলেদের বিদ্রূপোক্তির উত্তরে পিনাকী নীরব ছিল, কিন্তু সত্যব্রতর সহজ প্রশ্নটা তাহার ধৈর্য্যের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া দিল, দুই চক্ষু পাকাইয়া সত্যর দিকে তাকাইয়া সে তীক্ষ্নকণ্ঠে উত্তর দিল—তোমার ঐ মাথাটা!

ছেলেরা হাসিয়া উঠিল।

ভবানীশঙ্কর কহিল—আমার কথাটা মিলিয়ে নাও মিস্ ব্যাটারফ্লাই, রক্তের স্বাদ সত্যি ভারি সাংঘাতিক। তোমার পিনেস মশাই ব্যানার্জ্জীর

মাথাটা চাইছেন খেতে, ভয় হয়—এর পর তোমার হৃদ্‌পিণ্ডটার ওপর ওঁর লোভ না পড়ে !

হেনরী কহিল—ব্যানার্জ্জী, মাথাটা সামলাও—

সত্যব্রত হাসিয়া কহিল—সামান্য একটা মাথা ওঁর লক্ষ্য নয়, আট-কোটি লোকের মাথা খাবার জন্যই উনি তোমাদের দেশে এসেছেন, তারই কসরৎ করছেন।

অগ্নিবর্ষীদৃষ্টিতে পিনাকী ব্যানার্জ্জীর বিহসিত মুখখানার দিকে চাহিল, অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইলেও কথার অর্থটা তাহার নিকট ত অস্পষ্ট নহে ! এই অশিষ্ট ও দুর্ম্মুখ লোকটাও তাহারই মত সত্য-সন্ধানী নাকি ?

ক্লেভারিং এই সময় প্রশ্ন করিল—মিঃ ব্যানার্জ্জী, যে-দেশ তোমার জন্মভূমি, তার পপুলেসন (জনসংখ্যা) আট কোটি নয় কি ?

টম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—এতক্ষণে পথ পাওয়া গেল ! মিঃ ব্যানার্জ্জীর মনে তাহলে রীতিমত ভয় হয়েছে যে, মিষ্টার পিনেস ইণ্ডিয়ায় ফিরে গিয়ে আট কোটি বাঙ্গালীর মাথা চিবিয়ে খাবে।

সত্যব্রত সহসা মুখখানা শক্ত করিয়া কহিল—ভয় হয়েছে মানে ? মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর জাত ভয়ের তোয়াক্কা রাখে না। তা ছাড়া, বাঙ্গালীর মাথা ডিমের কুসুম কিম্বা ছাতুর মত নরম নয়, ভয়ঙ্কর শক্ত, খেতে গেলেই দাঁত ভেঙ্গে যাবে।

হীরাভাই নামে বোম্বাইবাসী একটি পারসী ছেলে কহিল—কথাটা খাটি, খালি মাথাতেই বাঙ্গালী ভেল্কি দেখায়, মিঃ ব্যানার্জ্জীর মাথাটাই দেখ না।

ভবানীশঙ্কর কহিল—আমাদের মনে হয়, মিষ্টার পিনেসও মাথার ব্যায়াম আরম্ভ করেছেন, তাই টুপী পরেন না।

মিস্ এলাই মৃদু হাসিয়া কহিল—মাথা নিয়ে কি আপনারা শেষে মারামারি বাধাবেন? পিনেস মশাই না হয় বলেছেন—মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর মাথাটা খাবেন? উনি ত ওটি ওঁর মুখের কাছে নীচু করলেই পারতেন।

হেনরী কহিল—আর, তোমার পিনেস মশাই সত্যিই যদি কামড় বসাতেন?

সত্যব্রত সোজা হইয়া বসিয়া কহিল—আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু মিষ্টার পিনেস রাজী হবেন না। মাথার ছালটা ওঁর লক্ষ্য ত নয়, যত লোভ শাঁসটুকুর উপর। কিন্তু দাঁতের পক্ষে সেটা দুঃসাধ্য, তার অস্ত্র আছে আলাদা।

পিনাকী এবার নিজেকে নিতান্ত বিপন্ন মনে করিয়া এলাইয়ের দিকে চাহিয়া আবদারের স্বরে কহিল—মিস্ ব্যাটারফ্লাই, আমার একান্ত মিনতি, এই দুর্ম্মুখ লোকটার পাশে এর পর আর কোন দিন আমাকে বসাবেন না। আমার আলাদা জায়গাটাই ভালো ছিল। কটেজের কোন নিরবিলি ঘরে আমার খাবার জায়গাটা করে দিতে পারেন না?

ছেলেগুলির মুখে মুখে চাপা হাসির আভা ফুটিল। এলাই তাহার মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া উত্তর দিল—সেই কথাই ভালো, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো পিনেস মশাই, তোমাকে খুসী করতে।

সত্যব্রত গম্ভীর মুখে কহিল—তার চেয়ে এক কাজ করলেই হয়, পিনেস মশাই এই টেবিলেই খাবেন, আমাদের ব্যবস্থা হ'বে আলাদা ঘরে। বাঙ্গলা ভাষায় এ সম্বন্ধে একটা ছড়া আছে—কানা গোরু এক গোয়ালে থাকে না।

পিনাকী ছাড়া আর সবাই হাসিয়া উঠিল। পিনাকীর ভারাক্রান্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে এলাই কহিল—পিনেস মশাই, মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর বজ্জাতি দেখেছো ত? তোমাকে বলে কিনা কানা গোরু।

পিনাকী মোটা গলায় কহিল—গোরুর খবর কারা বেশী রাখে জানেন মিস্ ব্যাটারফ্লাই?

এলাই কহিল—কি করে জানবো বলুন, আপনাদের খবরদারীর ভার নিয়েই যে মশ্‌গুল—

পিনাকী কহিল—তবে বলছি শুনুন—

অতঃপর একটা ঢোক গিলিয়া এবং ব্যানার্জ্জীর দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা কহিয়া উঠিল—শকুন। ভাগাড়ে গরু পড়লেই সবার আগেই টের পায় এরা।

টম বলিল—ও তো হ'ল মরা গোরুর কথা,—কাণা গোরুর সন্ধান কারা রাখে সেটা ত বললে না?

কথাটার কোন যোগ্য উত্তর না পাইয়া পিনাকী জোর করিয়াই বলিয়া উঠিল—গোরুকে যারা কানা করে, তারাই ভাগাড়ে পাঠায়—কি বলেন মিস্ ব্যাটারফ্লাই?

হিংসা ও অহিংসা

পরদা ঠেলিয়া এই সময় খানার ঘরে ঢুকিলেন মিসেস ফ্লাওয়ার্স। সঙ্গে সঙ্গে পিনাকীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—কে ব্যটারফ্লাই ?

ছেলেরা সকলেই থতমত হইয়া পড়িল, পিনাকীর মুখে কথা নাই ; এলাই আড়ষ্ট।

মিসেস ফ্লাওয়ার্স গলায় জোর দিয়া কহিলেন—কারুর মুখে কথা নেই যে! একটু আগে ঘরখানা ত মাথায় করে তুলেছিলে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে। খাবার সময় এত ঝগড়াই বা কি নিয়ে, আর এলাই ব্যটার-ফ্লাই হ'ল কিসে ?

সত্যব্রত সঙ্কোচ কাটাইয়া উত্তর দিল—আমাদের বয়সে চুপচাপ বসে ডিনার শেষ করা কি সম্ভব মাননীয়া ল্যাণ্ডলেডী ? আপনিই বলুন! আর ব্যটারফ্লাইএর কথা যা জানতে চাইছেন, তার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের ভগিনী-স্থানীয়া মিস্ এলাই আপনার কটেজের একটা খরচা আর অসুবিধা তুলে দিয়েছেন আমাদের ঐ পিনেস ভায়াটির খাবারের ডিসে মাছের চপ আর ডিমের মামলেট চালিয়ে দিয়ে। উনিই রসনায় নতুন রসের আস্বাদ পেয়ে মিস্ এলাইকে ব্যটারফ্লাই বলে অভিনন্দিত করেছেন।

মিসেস ফ্লাওয়ার্স কহিলেন—এই কথা! এই নিয়ে তোমরা বাছারা তিলকে তাল করে তুলেছ ? যাক্, পিনাইয়ের জন্যে যে আর আলাদা ডিসের ব্যবস্থা করতে হবে না এটা খুব সুখের কথা। সত্যিই, বেচারীকে সামান্য ভেজিটেবল স্যুপ দেবার সময় আমার ভারি মন কেমন করত। হ্যাঁ,—এলাই, পিনাইয়ের খাওয়ার উপর তুমি বিশেষ নজর রাখবে, যেন কোন বিষয়ে বাছার অসুবিধা না হয়।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই যেমন তিনি দ্রুত আসিয়াছিলেন, তেমনই দ্রুতপদেই পরদার পাশ দিয়া অদৃশ্য হইলেন। ছেলেরা পিনাকীর নাম 'পিনেস' রাখিলেও মিসেস ফ্লাণ্ডার্স তাহা সমর্থন করেন নাই। তিনি নামটার শেষের অক্ষরটি বদলাইয়া 'পিনাই' করিয়াছিলেন।

টম এলাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিল—ফাঁড়া তোমার কেটে গেল, এখন যা খুসী করতে পারো।

হেনরী কহিল—শুনলে ত মায়ের উপদেশ! পিনাইয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই।

সত্যব্রত কহিল—পিনাই প্লাস্‌ এলাই, দুয়ে মিলে—

মিলিতকণ্ঠে স্বর উঠিল—ব্যাটারফ্লাই।

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902
MAJU. HOWRAH.

পিনাকী তাহার মাতৃভূমি বা পিতামাতার সম্বন্ধে কোন পরিচয় কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। সকলেই জানে, নিজেই সে নিজের অভিভাবক। টাকার জন্য তাহাকে দেশে তাগিদ দিতে হয় না, দেশ হইতেও তাহার টাকা আসে না। লণ্ডনের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে পিনাকীর নামেই প্রচুর টাকা সঞ্চিত আছে, অতি সন্তর্পণেই সে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিত এবং প্রত্যেক পেনিটি তার হিসাব করিয়া খরচ করিত। দেশের ঠিকানার স্থানে সে বোম্বাই শহরের

উল্লেখ করিয়াছিল, পিতার পরিচয় সম্পর্কে এইটুকুই সকলে পিনাকীর নিকট জানিয়াছে যে, তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, রত্নগিরির গুহায় বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, পিনাকী তাহার ভাগ্য বিপর্য্যস্ত পিতার প্রকৃত পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিতেই বিশেষ সচেতন ছিল, সম্ভবতঃ তাহার পিতাও এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। সাধারণতঃ পিনাকী ব্যাকুণ্ঠ ছিল, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারে তাহাকে বিশেষ ভাবে মুক্তহস্ত হইতেও দেখা যাইত। তবে সকল ব্যাপারেই তাহার অতিমাত্রায় সতর্কতা সত্যই বিস্ময়াবহ। লণ্ডন শহরের অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে গাওয়ার ষ্ট্রীটের একটি বিশাল বারোয়ারি বাড়ীর দোতালায় ছোট একখানি কামরা গোপনে ভাড়া করিয়া সে-যে তাহার প্রাইভেট দপ্তরখানা পাতিয়াছিল এবং প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা এই ঘরটির ভিতর বসিয়া বিবিধ বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিত, এ খবর ইণ্ডিয়া কটেজের কেহই জানিত না। স্থানীয় পোষ্ট-আফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া পিনাকী তাহার চিঠিপত্র এইখানে ডেলি-ভারী লইত এবং লেখাপড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সে এই নির্জ্জন ঘরখানির ভিতর বসিয়া সমাধা করিত। ইণ্ডিয়া কটেজের ছেলেরা কোন দিন পিনাকীর নামে কদাচ কোন চিঠিপত্র আসিতে না দেখিয়া ভাবিত যে, এই প্রবাসী ছেলেটির তত্ত্ব লইবার মত ইণ্ডিয়ায় তাহার কোন পরিজন নাই। পিনাকীও কিছু বলিত না, এ সম্পর্কে কোন আলোচনা উঠিলেও সে তাহা এড়াইতে চাহিত। কটেজে প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টার অনুপস্থিতির প্রসঙ্গে সে এই বলিয়া সকলের কৌতূহল দমন করিয়া রাখিত যে, তাহার দেশের এক বিলাত-প্রবাসী

আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়া সে শাস্ত্রালোচনা করে। সত্যকে চাপা দিবার জন্য মিথ্যার আবরণ প্রস্তুত করিতে এই ছেলেটির সংস্কারে কিছু বাধিত না, এই কঠিন কাজটিতে তাহার নৈপুণ্যও ছিল অসামান্য। লোকের কাছে সে মিথ্যার নামে শিহরিয়া উঠিত, সহপাঠীদের মধ্যে মিথ্যা কেহ বলিলে মুখখানা অমনি অন্ধকার করিয়া সে ফিরিয়া বসিত এবং এই সব কারণে ইণ্ডিয়া কটেজের প্রায় সকলে ইহাকে সত্য-সন্ধানী জানিয়া মনে মনে প্রশংসা করিত বটে, কিন্তু গাওয়ার ষ্ট্রীটের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া এই সত্য-সন্ধানী ছেলেটি তাহাদের অগোচরে মিথ্যাকে সত্যের আবরণে সাজাইবার যে সাধনা করিত, তাহার সন্ধান কেহই রাখিত না।

গাওয়ার ষ্ট্রীটের নির্জ্জন কক্ষে পিনাকীর যে-সব সাধনা চলিত, তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—অভিনিবেশের সহিত পিতার দীর্ঘ পত্রখানি পাঠ করা। এই পত্রের প্রতি ছত্রটি তাহার বহু পূর্ব্বেই কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে তথাপি সে পত্রখানি সম্মুখে মেলিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ পাঠ করে। তাহার পর পত্রের বয়ানের সহিত যোগসূত্র রাখিয়া নিজের মনেই বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতে থাকে—'পথ দেখাও, আমাকে পথ দেখাও, নতুন আলো নতুন রূপে—ফুটে উঠুক মনের ভিতর থেকে সয়তানের ইচ্ছায়। তোমাকেই চাই সয়তান—তোমাকেই; ঈশ্বরকে নয়—ঈশ্বর নেই। মিথ্যার ভিতর দিয়ে তুমি এসে উদয় হও—আমাকে চালাও, তুমিই চালাও!'

পিতার পত্রখানি পড়িয়াই খ্রীষ্টান ছেলেরা গীর্জ্জায় গিয়া যে-ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে বাইবেলের সূত্র পড়িয়া প্রার্থনা জানায়, ঠিক সেই

রূপ ভঙ্গিতে ভাবাড়ম্বরে পিনাকী সয়তানকে আবাহন করে। তাহার পর বহুক্ষণ সে নির্জ্জন কক্ষে মৌনভাবে বসিয়া থাকিয়া নানারূপ সঙ্কল্প ভাঁজিতে থাকে।

এই অবস্থায় পিতার নিকট হইতে পিনাকী আর একখানি নির্দ্দেশ-মূলক পত্র পাইল। তাহার বয়ান এইরূপ :

প্রিয় পিনাকী, বহু বিবেচনা ও দেখাশুনার পর হাতে-কলমে যে অভিজ্ঞতাটুকু পাইয়াছি, তোমাকে তাহা জানানো বিশেষভাবে প্রয়োজন মনে করিতেছি। রাজা শিবরাম ও তাহার সরকারের সংস্রব কাটাইয়া অনেক তফাতে আসিলেও তোমার জন্য যে সকল সংবাদ আমাকে সংগ্রহ করিতে হয়। তাহার ফিরিস্তি তোমাকে আমি আলাদা পাঠাইব, তুমি তাহা হইতে এখানকার অবস্থা এবং বাঙ্গালী মন্ত্রী আনন্দময়ের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইবে। এই মানুষটির প্রকৃতি হইতেই ইহার জাতিকে তুমি চিনিতে পারিবে—একদিন তোমাকে যাহার সহিত বুঝাপড়া করিতে হইবে। রামদুর্গ রাজ্যে ইহার পূর্ব্বে যে ইংরেজ রেসিডেণ্ট ছিলেন, তিনি এই জাতটার সম্বন্ধে কি বলিতেন জান? তিনি বলিতেন—'বাঙ্গালীর দোষই বল আর গুণই বল, এরা ছুঁচ হয়ে ঢোকে আর ফাল হয়ে বেরোয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুঁড়িটা এরাই সবার আগে ছুঁয়েছে। পথের সুড়ুক সন্ধানে এ-জাত আর সব-জাতের উপরে যায়। চড়াই ভেঙ্গে উঁচু পাহাড়ে উঠতে অন্য জাত যখন হিমসিম খায়, বাঙ্গালী সে-সময় পাকদাণ্ডি বেয়ে তার চুড়োয় উঠে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।' রেসিডেণ্ট সাহেবের কথাটি শুনিয়া আমরা তখন হাসিয়া-

ছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি সাহেব যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, এক বর্ণও মিথ্যা নয়। আমাদের দেশের মেথর চামার ঢেড় প্রভৃতি যে-সব জাতিকে আমরা জানোয়ারের সামিল করিয়া রাখিয়াছিলাম, রাজ্যের ভার হাতে লইয়াই এই লোকটি তাহাদিগকে মানুষের পর্য্যায়ে তুলিয়া দিয়াছে। এখন তাহারা স্বচ্ছন্দে শহরের সকল সড়ক দিয়া যাতায়াত করে। তাহাদের পড়শুনার জন্য আলাদা পাঠশালার ব্যবস্থা হইয়াছে, সরকারের খরচে তাহারা পড়াশুনা করিবে। এই ব্যাপার লইয়া গোড়ায় একটু গোল বাধিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন উল্টা হাওয়া বহিতেছে। লোকের মুখে উজীর সাহেবের সুখ্যাতি আর ধরে না। আর এই সুখ্যাতি শুধু একটা মানুষকে ঘিরিয়া নয়, বাঙ্গালী জাতিকে এজন্য প্রদেশবাসীরা বাহোবা দিতেছে। তোমাকে এ ব্যাপারটি ভালো করিয়া মনে রাখিতে হইবে। এখন যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে যে লোক মাথা খেলাইয়া নূতন কিছু করিতে পারিবে, সংস্কারের মশাল জ্বালিয়া যে যত বেশী উজ্জ্বল আলো দেখাইবে,—তাহারই জয়-জয়কার, দেশ তার খ্যাতিতে ভরিয়া যাইবে। কিন্তু আমি বহু চেষ্টা ও বিবিধ চক্রান্ত করিয়াও এই জবরদস্ত মানুষটিকে খাটো করিবার কোন রাস্তাই বাহির করিতে পরি নাই,—সে রাস্তা তৈয়ারী করিবে তুমি। হ্যাঁ, এবার এই পত্রের মূল কথাটাই তোমাকে জানাইতেছি। এখন তোমার শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় এই যে, সিবিল সার্ব্বিসের উমেদারী না করিয়া গোটা ভারতবর্ষের উপর আজ বাদশাহী যাহারা করিতেছে, এই চালাক ও হুঁসিয়ার বাঙ্গালীরা যাদের কাছে মানুষ-তৈরী-করা

বিদ্যাটা শিখিয়াছে—তুমি তাদের উমেদারী কর। চাকরীর দিকে নজর থাকিলে বড় হইতে পারিবে না। স্থরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, আনন্দময় রাজপণ্ডিত, সিবিলিয়ান হইয়াও ইহারা কেহই চাকরী করিতে পারে নাই। আনন্দময় রাজপণ্ডিতের কাজকে চাকরী বলা যায় না, আসলে সে এখানে রাজত্বই করিতেছে। তবে আইন কাম্নুন জানা দরকার বলিয়া, তুমি আইন পড়া শুরু করিয়া দাও; সবাই জানুক, ব্যারিষ্টার হওয়াই তোমার লক্ষ্য। ইহার ভিতরে তুমি কোন পাকা ঝুনো রাজনীতিকের কাছে ভালো করিয়া 'পলিটিক্স' পড়িবার ব্যবস্থা কর। খরচ পত্রের জন্য ভাবিও না; দক্ষিণা দিতে কিছুমাত্র কৃপণতা করিও না। শুনিয়াছি, বিলাতে এমন সব মাথাওয়ালা মানুষ আছেন, যাঁহারা শুধু মাথা খেলাইয়া কূটবুদ্ধির চর্চ্চা করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গুরুতর সঙ্কট কিছু উপস্থিত হইলে ইঁহাদের বুদ্ধির প্যাঁচেই অবস্থার চাকা ঘুরিয়া যায়। ইঁহাদের মাথার জোরেই ব্রিটিশ জাতির 'প্রেষ্টিজ' আজও বজায় রহিয়াছে একই ভাবে। বিলাতের এই সব চাণক্য পণ্ডিতগুলির সন্ধান কর। কোন প্রকারে যদি ইহাদের চেলা হইতে পার, অন্তত পাঁচটি বৎসর চক্ষু কর্ণ বুজাইয়া সাকরেদী করিবে। তখন তোমার অসাধ্য কিছু থাকিবে না। রামদুর্গ রাজ্যের রাজমুকুট একদিন তোমার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। তখন তোমার পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিবে, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্ব্বাধিক বুদ্ধিমান জাতির সহজাত বুদ্ধিও তোমার শিক্ষালব্ধ কূটবুদ্ধির আঘাতে ভোঁতা হইয়া যাইবে।

চিঠিখানি উপর্য্যুপরি তিনবার পাঠ করিয়া এবং দেবতার নির্ম্মাল্যের

মত ভক্তির সহিত মাথায় ঠেকাইয়া পিনাকী অতি সন্তর্পণে তাহার হাতবাক্সটির ভিতর রাখিয়া দিল।

পিতৃবাক্য পিনাকীর নিকট দেববাক্য। বিশেষতঃ সিভিল-সার্ব্বিসের তরিখানিতে চড়িয়া একদিন নিরাপদে কূলে উঠা সম্ভব হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটা সন্দেহ ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইতেছিল। পিতার পত্রে ব্যারিষ্টারীর সহিত পলিটিক্স পড়িবার নির্দ্দেশ পাইয়া অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে পিতার নির্দ্দেশ মত শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

সিবিলসার্ব্বিস হইতে নাম কাটাইয়া ব্যারিষ্টারীতে নাম লিখাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু ঝুনো পলিটিসিয়ানের পাত্তা লইয়া পাঠ শুরু করিতে বহু কাঠখড় পোড়াইতে হইল।

দু-নৌকায় পা দিয়া দু-কুল রাখিতে অভ্যস্ত, কূটবুদ্ধির মানোয়ারী জাহাজ বিশেষ—এমন এক বিচক্ষণ রাজনীতিবেত্তার সহিত অবশেষে পিনাকীর সংযোগ ঘটিল। আইন-কলেজের জনৈক ব্যারিষ্টার-অধ্যাপক পিনাকীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া উক্ত বিখ্যাত পলিটিসিয়ানের নামে এক সুপারিস-পত্র লিখিয়া দেন। সেই পত্র লইয়া পিনাকী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে পলিটিক্সে তুমি উতরে যাবে। এরকম চেহারার লোক ভারি চালিয়াৎ হয়, চালাকিতে তারা সবাইকে হারায়।

পিনাকী কুণ্ঠিতভাবে বলিল—কিন্তু আমার চেহারার প্রশংসা কারুর মুখে ত শুনি নি স্যর!

পলিটিসিয়ান কহিলেন—প্রশংসা আমিও করি নি। প্রশংসা পাবার

মত চেহারা ত ভগবান তোমাকে দেন নি বাপু! পলিটিক্সে ঢুকলে এ চেহারা আরও বিশ্রী হয়ে যাবে। তবে সেই বিশ্রীর ভিতর দিয়েই পলিটিক্সের আলো এমন জোরে বেরুবে যে লোকের তাক লেগে যাবে। বিশ্রীটাই তাদের চোখে ভীষণ রকমের সুশ্রী ঠেকবে।

পিনাকী ঠিক করিতে পারিল না, ইহা তাঁহার প্রশংসা, অথবা নিন্দা। সে খুসী হইবে, না দুঃখানুভব করিবে? আমতা-আমতা করিয়া সে কহিল—স্যরের কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

স্যর বলিলেন—দৃষ্টান্ত দিয়েই বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। মানুষের কথা ছেড়ে দাও, জানোয়ারের কথাই ধরো। সব চেয়ে বিশ্রী দেখতে শিয়াল আর মর্কট; কিন্তু এরাই সব চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। পাখী জাতটার ভিতরে কাকের মত কুশ্রী আর কেউ নেই, কিন্তু এদের বুদ্ধির কাছে কোন পাখী দাঁড়াতে পারে? আমি জোর করে বলতে পারি যে তোমার মতন কুশ্রী চেহারার ছেলে ইংলণ্ডের কোন কলেজে বর্ত্তমানে নেই। কিন্তু তুমি যদি পলিটিক্সে ঢোক, বুদ্ধিবাজীতে কোন সুশ্রী সুদর্শন ছেলে তোমাকে হারাতে পারবে না। তা বেশ, আমি তোমাকে পলিটিক্স শেখাবো। তোমার দেশ কোথায়?

পিনাকী উত্তর করিল—ভারতবর্ষ, স্যর?

পলিটিক্সের প্রফেসর উত্তর শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন! কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে পিনাকীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন—তোমার চেহারা ত আমার চোখে ভারি ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছ হে ছোকরা! আমি ভেবেছিলাম দেশ তোমার সাউথ আফ্রিকায়। কিন্তু এখন

কথা হচ্ছে, তুমি যখন ভারতবাসী, পলিটিক্স পড়ে কি করবে? তোমাদের দেশে ত পার্লামেণ্ট নেই। তা ছাড়া আমার মনে হয়, যে জাতি পরাধীন, তাদের পলিটিক্সও নেই।

পিনাকীর কালো মুখখানা এক নিমিষে আরো কদর্য ও বিকৃত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবং মনে মনে জবাবটি স্থির করিয়া সে সবিনয়ে কহিল—পরাধীন দেশের জাতির মধ্যে জীবনের যুদ্ধ চালাতেও পলিটিক্সের দরকার হয়। অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার চেয়ে অধিকারের এলাকা নিয়ে বুদ্ধির বড়াই পরাধীন দেশেই বেশী চলে। সেই জন্যেই আমি পলিটিক্সে ঢুকতে চাই। পলিটিক্সে আমি এমন ভাবে পাকা পোক্ত হয়ে আমার দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা করি, দেশের লোক জানবে তাদের গলার শিকল খুলে দেবার কৌশলটি শুধু আমিই শিখেছি। অমনি তারা আমাকে তাদের মুক্তিদাতা ভেবে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে—শিকলটা যাতে খুলে দিই আমি নিজের হাতে, কিন্তু আসলে শিকলটা উল্টো পাক দিয়ে তাদের গলায় আরো শক্ত করে এঁটে বসবে আমার হাতে। তারা তখন কিছু বুঝতেই পারবে না। বরং শিকলটি শক্ত করে এঁটে দেবার আনন্দেই লাফালাফি করতে থাকবে। অর্থাৎ দেশের লোক ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করে আমার হাতে দেবে, আমি তাতে নিজের ইচ্ছামত অঙ্ক বসিয়ে তাদের মাথায় পা দিয়ে চলবো, কেউ আপত্তি তোলবার সাহস পর্য্যন্ত পাবে না। অবশ্য এটা ঠিক ম্যাজিকের মতই হবে। কিন্তু স্যর, ম্যাজিসিয়ান আর পলিটিসিয়ানে তফাত ত বেশী কিছু নেই। ম্যাজিকে খেল দেখিয়ে মানুষকে যাদু করে, পলিটিক্সে বোল

শুনিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়া :যায়। আমি আপনার কাছে সেই পলিটিক্স শিখতে চাই, যাতে ম্যাজিক দেখিয়ে দেশের লোককে বেকুব করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করতে পারি।

পলিটিক্সের প্রফেসর আড়ষ্টভাবে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত বাকপটু ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অনাগত দুরাকাঙ্ক্ষার কাহিনী শুনিতেছিলেন। পিনাকীর কথা শেষ হইলেও কিছুক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা নির্গত হইল না, নিবদ্ধ দৃষ্টি একই ভাবে অব্যাহত রহিল।

নিজেই অপ্রস্তুতের মত হইয়া মৃদুস্বরে পিনাকী কহিল—আমি বোধ হয় অনেক বেশী কথা বলেছি স্যর, আপনি হয়ত আমাকে অতিরিক্ত বাচাল কিম্বা পাগল মনে করেছেন।

পলিটিক্সের প্রফেসর এতক্ষণ সামুদ্রিকের মত তন্ময় দৃষ্টিতে পিনাকীর মুখ ও চক্ষুর রেখাগুলি বুঝি পাঠ করিতেছিলেন। পিনাকীর প্রশ্ন তাঁহাকে যেন প্রবুদ্ধ করিয়া দিল। চোখের দৃষ্টি ছোট এবং মুখখানি প্রশান্ত করিয়া তিনি কহিলেন—তোমরা যেমন করে কলেজের কেতাব পড়ো, ঠিক তেমনি করেই আমি তোমাকে পড়ে নিয়েছি। তুমি পারবে। পলিটিক্সের ম্যাজিক শিখে ভারতবর্ষে একদিন তুমি অদ্ভুত খেল্ দেখাবে, সারা দুনিয়ায় তার সাড়া পড়ে যাবে। অবিশ্যি, ইংলণ্ডে বসে আমরা কিন্তু হাসবো। তবে একটা কথা, ম্যাজিকটা শিখতে সময় লাগবে, তার ওপর ফী আছে রীতিমত। পারবে?

পিনাকী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—ফীয়ের যোগাড় করেই তবে সিবিল সার্ব্বিসের উমেদারী শুরু করেছিলাম।

সবিস্ময়ে পলিটিসিয়ান প্রফেসর কহিলেন—বল কি? এই চেহারায় আই-সি-এস হবার আশা করেছিলে?

পিনাকী বিনীত ভাবে কহিল—চেহারায় খাপ খাবে না বলেই ত ও'র আশা ছেড়ে দিয়েছি স্যর! তবে আর পলিটিক্সে ঢোকবার কথা বলছি কেন?

প্রফেসর কহিলেন—কিন্তু সিবিল সার্ব্বিসে ঢোকবার আর পলিটিক্সের ম্যাজিক শেখবার ফী সমান ত নয়ই বরং আকাশ পাতাল তফাত। তোমাদের পেশাটা কি শুনি? বাপ আছেন? করেন কি? অবস্থাটা?

এক সঙ্গে দুই যোড়া প্রশ্নের জবাব এক কথায় পিনাকী সারিয়া দিল, কহিল—আমরা স্যর দোকানদারী করি, চাকরী বাকরীর ধার ধারি না। কাজেই বুঝতে পারছেন, হিসেবের ভিতর দিয়েই আমাদের জীবন যাত্রা। এর বেশী আমাদের সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই।

পিনাকীর কথায় প্রফেসরের ক্ষৌরিত সুমসৃণ মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন—তোমরাও তাহলে দোকানদারের জাত? A Nation of shopkeeper?

পিনাকী উত্তর দিল—সে হিসেবে আমরা আপনাদের স্বজাতি স্যর! তবে আমাদের দোকানদারীটা ঠিক তিসি, তুলো, পাট, গালা এসব মরা জিনিস নিয়ে নয় স্যর, জ্যান্ত জিনিস নিয়েই আমাদের দোকানদারী। নইলে পলিটিক্সের ব্যাপারে নেমেছি!

প্রফেসর কহিলেন—তাহলে তুমি পারবে। দোকানদারের জাতকে যারা ঠাট্টা করছে, তারাই মরেছে। ইতিহাস পড়েছ ত,—ব্রিটিশ

জাতটার উপরে নেপোলিয়নের কি অবজ্ঞাই ছিল, কথায় কথায় দোকানদারের জাত বলে ঠাট্টা করত। কিন্তু নেপোলিয়ানের হঠাৎ বাদশাহী তাসের বাড়ীর মত ভেঙ্গে গেছে, আর দোকানদারের জাতটা আজও সমান দাপে টিকে আছে। হ্যাঁ, এখন আমার কথা শোনো, পলিটিক্সের ম্যাজিকটা পুরোপুরি শিখতে যদি চাও আমার কাছে, মোটামুটি ফী দিতে হবে দশটি হাজার পাউণ্ড, আর সেটা আগাম।

পেটের ভিতর হঠাৎ মোচড় দিয়া উঠিলে বেদনায় মানুষের মুখ যেরূপ বিবর্ণ হইয়া উঠে, টাকার অঙ্কটা শুনিবামাত্র পিনাকীর মুখখানির অবস্থাও সেইরূপ হইল। বিপন্নের মত দৃষ্টিতে প্রফেসরের মুখের পানে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল—দশ হাজার পাউণ্ড! সে যে প্রায় লাকটাকার কাছাকাছি স্যর!

গম্ভীর মুখে প্রফেসর কহিলেন—তা হবে! কিন্তু এই টাকাটা যে-ব্যাপারে খরচ করবে, ভবিষ্যতে তারই দৌলতে অমন দশ হাজার পাউণ্ডের কত তোড়া তোমাকেই খুঁজে বেড়াবে। আমার ফী-টা ঘাবড়ার মত নয়।

পিনাকী হাত দুটি যোড় করিয়া ভারতীয় প্রথায় অনুরোধের ভঙ্গিতে কহিল—এক কাজ করুন স্যর, ওটার সিকি করে নিন। আড়াই হাজার পাউণ্ড দাখিল করে কাল থেকেই আমি ভর্ত্তি হই।

উপেক্ষার সুরে প্রফেসর কহিলেন—এঃ! তুমি দেখছি নেহাৎ মুদিখানার দোকানদার! তাহলে তুমি পারবে না, ঐ ব্যারিষ্টারীই পড়ো। দুনিয়ার বাজারে যারা দোকানদারী করে—সত্যিই যারা

হিংসা ও অহিংসা

A Nation of a shopkeeper—তাদের এক কথা, দাম কশা-কশি করে না। আমারও ঐ এক কথা—ক্ষমতা আর ইচ্ছা থাকে, দশ হাজার পাউণ্ড যোগাড় করে এসো।

কথা শেষ করিয়াই প্রফেসর ঘণ্টা টিপিলেন। ঘরের পরদা ঠেলিয়া আরদালী প্রবেশ করিতেই পিনাকীকে দেখাইয়া কহিলেন—একে ফটকের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসো।

পিনাকী দ্বিতীয় অনুরোধের অবসর পাইল না। প্রফেসরকে অভিবাদন জানাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আরদালীর অনুসরণ করিতে হইল।

প্রফেসরের কলিংবেল পুনরায় ক্রীং ক্রীং শব্দে বাজিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে পাশের কামরা হইতে খর্ব্বাকৃতি এক যুবা বাহির হইয়া আসিল। প্রফেসর তাহাকে ডাকিয়া চাপা গলায় কহিলেন—ছোকরার পিছু নাও, ওর হাড়-হদ্দ সব জানা চাই।

কলের পুতুলটির মত লোকটি তখনই বাহির হইয়া গেল।

দুইদিন পরে পিনাকী পুনরায় প্রফেসরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। তিনি তখন পাঠাগারে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। বেয়ারা তাঁহাকে পিনাকীর কার্ড দিল। কক্ষে সে সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকায় পিনাকী পাঠাগারে আসিবার অনুমতি পাইল।

পিনাকী কক্ষে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে সসম্ভ্রমে প্রফেসরকে অভিবাদন করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া টেবিলের উপর একখানি চেক খোলা অবস্থায় প্রসারিত

করিয়া দিল। প্রফেসর নীরবে চেকখানি তুলিয়া লইলেন। পড়িয়া দেখিলেন—টমাস কুক কোম্পানীর ব্যাঙ্কের নামে দশ হাজার পাউণ্ডের এক কেতা চেক। প্রফেসরের মুখে হাসিও ফুটিল না, গাম্ভীর্য্যও কাটিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিনাকীর পানে চাহিয়া কহিলেন—অল রাইট! তুমি তাহলে পাররে। এখন যে-পলিটিক্স তোমাকে শিখতে হবে, তার প্রথম ধারাটা তোমার-আমার কথাবার্ত্তা আর লেন-দেনের ব্যাপার থেকে বেশ করে মাথার মগাজে ঢুকিয়ে ফেল। যা চাইবে পুরোপুরি সবটুকুই আদায় করে নেবে। পাওনার অংশ একটু ছেড়ে কখ্‌খনো রফা করবে না। আর, চাইবার আগেই ভালো করে জেনে নেবে, যেটা চাইছ, হেসে খেলে দেবার মত তার অবস্থা কি না। কেটলিতে জল নেই, তার নলের কাছে পিয়ালা পেতে লাভ কিছু আছে?

পিনাকী সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে স্যর, নিজের কেটলির খবরটুকু জানতে ভারি কৌতূহল হচ্ছে! যখন আপনার কাছে এসে শিক্ষার জন্যে ধর্ণা দিই, তখন কি জানতে পেরেছিলেন কেটলির ভিতরটি খালি নয়—পূর্ণ?

দিব্য সহজ কণ্ঠে প্রফেসর উত্তর দিলেন—পাকা দোকানদারের দৃষ্টিতে খরিদ্দারের ভেতরটা পর্য্যন্ত ধরা পড়ে। তোমাকে বলতে বাধা নেই এখন, শুধু কেটলির ভিতরটি কেন, তার আগাগোড়া সমস্তই জেনেছি। এই জানাটাই হচ্ছে পলিটিক্সের বর্ণ-পরিচয়। শিক্ষা সুরু হলেই এর রহস্যের সন্ধান পাবে। তবে একটা কথা বলে রাখি, কথাটা চেপে রাখবে, আমার কাছে-যে পলিটিক্স শিখছো—খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও জানাবে

না। কলেজের পড়াও ছাড়বে না, তাকে উপলক্ষ করে এই শিক্ষা চালাতে হবে। তা ছাড়া পলিটিক্সে পাকা হতে হলে আইন পড়াটাও কাজে লাগবে। রুটিন তোমাকে বিশেষ বদলাতে হবে না, সন্ধ্যের পর দুটো ঘণ্টা আমার ক্লাসে হাজির থাকলেই যথেষ্ট। কাল থেকেই তোমার পড়া আরম্ভ হবে। আজ তুমি যেতে পারো।

প্রফেসরের প্রত্যেক কথাটি কণ্ঠস্থ করিয়া পিনাকী তাহার পলিটিক্সের পড়া আরম্ভ করিয়াছে। পড়ার এমন সময়টি সে নির্ব্বাচিত করিয়াছে যাহাতে কোন পক্ষেরই অসুবিধার কোন সম্ভাবনা নাই। সন্ধ্যার দিকে যে সময়টুকু ছেলেরা সাধারণতঃ পার্কে বেড়াইয়া, সিনেমা হাউসে বা মিউজিক হলে কাটাইয়া থাকে, পিনাকীর তখন সংগোপনে পলিটিক্সের পাঠাভ্যাস চলে; রাত্রির ডিনারের পূর্ব্বেই সে বাসায় ফিরিয়া নৈশ ভোজে যোগদান করে।

পলিটিক্সের বিচক্ষণ অধ্যাপক মহাশয় যেমন বিরাট দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া এই ভারতীয় ছাত্রটির অধ্যাপনায় ব্রতী হন, তাঁহার শিক্ষাদানের বৈচিত্র এবং অভিনবত্ব তেমনই শিক্ষাধীন সুচতুর ছাত্রের অন্তরে উৎসাহের শিহরণ তুলিতে থাকে। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিয়াছেন যে, পরাধীন দেশের পক্ষে যে-কূট পলিটিক্স বিশেষভাবে উপযোগী, পিনাকীকে তিনি সযত্নে তাহাতেই কৃতবিদ্য করিয়া তুলিবেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই পিনাকী বুঝিতে পারে যে ছাত্রাবাসে ভুলের যে পিচ্ছিল পথটি সে তাহার দৈনন্দিন জীবন-

যাত্রায় বাছিয়া লইয়াছিল, তাহা পলিটিক্সের বিষম পরিপন্থী। পলিটিক্সের প্রথম ভাগেই যে-পাঠ সে পড়িয়াছে তাহা কি বিস্ময়াবহ!—পিনাকী জানিত, যাহার অনিষ্ট তাহার একান্ত বাঞ্ছিত, সর্ব্বসমক্ষে তাহার লাঞ্ছনাই বৈরনির্য্যাতনের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এখন বুঝিয়াছে, ইহা মস্ত ভুল; বিশেষতঃ পরাধীন জাতির পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। তাহাকে একেবারে ভোল বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। অতি তিক্ত কুইনাইনের বটিকার উপরটা যে-ভাবে চিনির পরদা দিয়া ঢাকিয়া সুমিষ্ট করা হয়—তিক্ত স্বাদটুকু রসনার সংস্পর্শে ধরা পড়ে না, ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষের উপরেও ঠিক ঐ ভাবে মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া প্রতিপক্ষকে অভিভূত করা চাই। যাহাকে বধ্য সাব্যস্ত করিয়াছ—সবার অলক্ষ্যে বধ করিতে বাসনা, কুকুরের মত তার বাধ্য হওয়া চাই। শত্রুর পানীয়ে যখন বিষ মিশাইতে বাসনা, হাসি মুখে তখন সদালাপের উৎস বহিবে। শত্রুকে জানাইবে—তুমি তার বন্ধু, সে প্রবল তুমি দুর্ব্বল, সে বড় তুমি ছোট। নিজে কখন শত্রুর বিরুদ্ধে হাত তুলিবে না, ভাবিবে তুমি পঙ্গু। এখানেও মনের হিংসার উপরে অহিংসার সুগার-কোটিং দিবে। তখন আর কেহই তোমাকে কাপুরুষ বলিবে না, ভাবিবে—তুমি যিশুখৃষ্টের কিম্বা বুদ্ধদেবের নূতন সংস্করণ।

পলিটিক্সের প্রথম পাঠের এই উপদেশগুলি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিলেও এগুলির প্রয়োগ-সম্বন্ধে পিনাকীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। পেটের ভিতরে সয়তানী মতলবটি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মুখের আলাপে উপরে-ভাসা মধুটুকু মিশাইয়া দেওয়া ত সহজ

ব্যাপার নয়। চিরদিনই যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের উদ্দেশে বিষবর্ষণে অভ্যস্ত; সহসা সে যদি মধুবর্ষী হইয়া উঠে, তাহা কি বিস্ময় ও সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে না? কাজেই, সতর্ক ভাবে হিসাব করিয়া পিনাকী তাহার অন্তর-গ্রন্থের বাহিরের পাতাগুলি ধীরে ধীরে খুলিতে লাগিল, প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই পিনাকী-চরিত্রে নূতন আলেখ্য সুস্পষ্ট হইয়া ইণ্ডিয়া-কটেজের তরুণ চিত্তগুলি বিস্ময়বিহ্বল করিয়া তুলিল।

সিভিল-সার্ব্বিসের শিক্ষা ছাড়িবার পর সহসা পিনাকী পড়াশুনায় এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, ছেলেদের দলে ভিড়িয়া খেলাধূলা বা আলাপ আলোচনায় যোগ দিবার অবসরই তাহার ঘটিয়া উঠিত না। পাঠানুরাগে পিনাকীর এরূপ বাড়াবাড়ি দেখিয়া ছেলেরা তাহাকে Smugs-এর দলে ফেলিয়া দেয়। সাধারণত বিলাতে খেলা-ধূলা বা শরীর-চর্চ্চা, মিলা-মিশা বা সামাজিকতা এবং নিবিষ্ট-চিত্তে বিদ্যানুশীলন বা গবেষণা—এই তিনটিই ছাত্রজীবনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিচিত। প্রায় পৌনে ষোল আনা ছেলেই ছাত্রজীবনের এই তিনটি অঙ্গই অল্পবিস্তর চালনা করিয়া থাকে। অতি অল্প ছেলেকেই পুস্তকের কীটরূপে শেষের অঙ্গটিই শুধু চালনা করিতে দেখা যায়। কিন্তু পিনাকী যখন খেলা ধূলা এবং সামাজিকতার সংস্রব ছিন্ন করিয়া একাগ্রচিত্তে শুধু বিদ্যার সাধনাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন সহপাঠিরা ঘোষণা করিয়া দিল—মিষ্টার পিনেস Smug হলেন। দশ হাজার নাগরিকের মধ্যে এক জন Monk হন, বিশ হাজার ছাত্রদের ভিতর একটি ছেলে Smug হয়। সুতরাং মিষ্টার পিনেস নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাবিশারদ হবেন!

কিন্তু মাস কয়েক পরে একদা পিনাকী কলেজের ছেলেদের অনুষ্ঠিত প্রীতি-ভোজের নিমন্ত্রণটি গ্রহণ করিয়া এবং ভোজের টেবিলে কাব্যালোচনায় যোগ দিবার সম্মতি জানাইয়া সহপাঠীদিগকে অবাক করিয়া দিল!

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সহিত সামাজিকতা সম্বন্ধেও ছেলেরা যাহাতে শিক্ষার সুযোগ পায়, সে বিষয়ে অভিভাবকগণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবেই নিবদ্ধ থাকে। নির্ভরযোগ্য এক বাড়ীতে বিভিন্ন স্থানের ছেলেদের একত্র বসবাস জাতীয়-জীবন-গঠনে বিশেষ আনুকূল্য করিবে বলিয়াই তাঁহারা ধারণা পোষণ করেন। কলেজের তত্ত্বাবধানে যে সকল ছাত্র একত্র বসবাস করে, তাহারাও যাহাতে কলেজের বাহিরের বিভিন্ন আবাস-ভবনের ছাত্রদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার সুযোগ পায়, সে বিষয়েও ছাত্রদের অভিভাবক এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্যম ও উৎসাহ প্রচুর। বিলাতের কলেজগুলি এদেশের কলেজের মত শুধু পড়াশুনা বা প্রফেসরদের লেকচার শুনিবার আস্তানা নয়, ওদেশের কলেজগুলিতে ছেলেরা অধ্যাপকদের সহিত একত্র বসবাস করিতে অভ্যস্ত। সকল ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান কলেজগুলিতে সম্ভবপর নয় বলিয়াই বাহিরের ছাত্রাবাসে বা বাসায় অনেককে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণের সুব্যবস্থায় মধ্যে মধ্যে ইহাদের মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা এবং পান-ভোজনের সুযোগ থাকায় স্থানগত পার্থক্য বিশেষ ব্যবধান উপস্থিত করিতে পারে না। পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয়ের বিধি-ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে পালন করিতে সকলেই আগ্রহশীল। প্রত্যেক কলেজের ছেলেরা

বৎসরে দুই দিন বিশেষ ভোজের আয়োজন করে। অন্য কলেজের ছাত্রদল এবং বাহিরের যে সব ছাত্র বাসা করিয়া থাকে তাহাদিগকে পালা করিয়া নিমন্ত্রণ করা হয়। কলেজের পাকশালা এই প্রীতিভোজের খাদ্য সরবরাহ করে। যে বিশিষ্ট কলেজের ছাত্রগণ এই ভোজের আয়োজন করে, ব্যয়ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হয়। অন্য কলেজ এবং বাহিরের ছাত্রগণও ইহার পাল্টা জবাব দিয়া থাকে। এই ভাবে প্রীতিভোজ উপলক্ষ করিয়া ছাত্রদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ নিবিড় হইয়া উঠে, ভোজের সভায় নানারূপ আলাপ-আলোচনা, সঙ্গীত এবং সাহিত্য চর্চ্চাও চলে। প্রত্যেক কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণই হইতেছেন কলেজের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ। ইহারাও প্রধান অতিথিরূপে ভোজ-সভায় আমন্ত্রিত হন। ফলে এই প্রীতিভোজ উপলক্ষে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পিনাকী সাধারণত এরূপ সম্মিলিতভোজ বরাবর এড়াইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এবার কলেজে খুব ঘটা করিয়া যে বিরাট ‘গেষ্ট হল’ (Guest Hall) অনুষ্ঠিত হয়, বিলাত-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণকে সেই প্রীতি-ভোজে যোগ দিবার জন্য উদ্যোক্তারা বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেন। এই ভোজ-সম্পর্কে কাব্যালোচনারও নির্ঘণ্ট থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পলিটিক্সের পাঠ সম্পর্কে নবলব্ধ জ্ঞানালোক পিনাকীর চক্ষুর উপরে ইদানীং অনেকগুলি নূতন দৃশ্য-বস্তু উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহার মনের গতিকে আকর্ষণ করিতে ছিল, সুতরাং ছাত্রদের ‘গেষ্ট হলে’র ভোজে যোগদান করা এবং আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু বলিয়া

তাহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের ধারণাটা ঘুরাইয়া দেওয়া সে কর্ত্তব্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে।

এই প্রীতি-ভোজে বিলাত-প্রবাসী প্রায় সকল ভারতীয় ছাত্রই সানন্দে যোগ দিলেও সংখ্যায় তাহারা মুষ্টিমেয়ে। বিশাল হলের অধিকাংশ স্থানই ইউরোপীয় ছাদ্রবৃন্দে পূর্ণ। উদ্যোক্তারা ভারতীয় ছাত্রদের সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত—যেহেতু ভারতীয় ছাত্রগণকে উপলক্ষ করিয়াই এই অনুষ্ঠান। কর্ত্তৃপক্ষগণও ভোজসভা অলঙ্কত করিয়া কাব্যালোচনায় যোগ দিয়াছেন। আলোচনার বিষয়-বস্তু হইতেছে—বর্ত্তমানে কোন্ কবির প্রতিষ্ঠা বেশী, কোন্ কোন্ কবিতা বিশেষভাবে সমাদৃত এবং প্রশংসিত। সভায় খোলাখুলিভাবে সকলেই আলোচনা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণের কার্ডেই অনুরোধ করা হইয়াছে—তাঁহাদের দেশের বর্ত্তমানের যে কবি ও কবিতা তাঁহারা ভাল করিয়া জানেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া আসেন।

ভোজসভায় ইউরোপীয় কবিদের কবিতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় ছেলেরা নানারূপ আলোচনা করিল। ড্যালামার, ইয়েটস্, লরেন্স, পাউণ্ড, এলিয়ট, মেসফিল্ড, গিবসন, কামিংস প্রভৃতি কবিদের কবিতা পঠিত হইল। কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধেও অনেকে অনেক কথাই বলিল। মিষ্টার বর্ট নামে জনৈক অধ্যাপক কবিতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন: কবিতা ভাল কি মন্দ পরীক্ষা করবার একটা উপায় আছে। সে উপায়টি হচ্ছে—যে কবিতা পড়লে গা সিউরে উঠে, সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দেয়, তাকেই ভাল কবিতা বলে মেনে নেওয়া উচিত।

অধ্যাপক মিষ্টার ফ্রেডারিক মায়ার্স কথাটার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন ঃ এ ভাবে কবিতা পরীক্ষা করা যায় না। পাগলের মুখ দিয়ে এমন ছড়াও বা'র হয়, শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। কিন্তু সেই ছড়াকেও কি কবিতা বলতে হবে? আসলে কবিতা হচ্ছে মানুষেব মনের ক্রিয়া, কবিও মানুষ; সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর ক্ষমতা বেশী হতে পারে, কিন্তু তিনি মানুষ ছাড়া আর কিছু নন। মানুষের মন আর জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে যিনি কবিতা লিখবেন, তাঁব কবিতাই ভালো, সেই কবিই বড়।

শেষে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক মিষ্টার জেরল্ড ব্যানফোর্ড দুঃখের সহিত ব্যক্ত করিলেন ঃ ইংরাজী সাহিত্যে রাশি রাশি কবিতার সৃষ্ট হচ্ছে সত্য, কিন্তু বেশীর ভাগই নিরস। নূতন সৃষ্টি নেই বললেই চলে। কবিতার ব্যাপারে আমরা ক্রমশঃ দেউলে হয়ে পড়ছি।

এবার ভারতীয় ছাত্রদের আলোচনার পালা আসিল। পিনাকীর বিদ্যানুশীলনের কথাটা কাহারও অবিদিত থাকিবার কথা নয়; ইতিমধ্যেই সে একনিষ্ঠভাবে বিদ্যচর্চ্চার জন্য Smug আখ্যা পাইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের কবি ও কবিতা সম্বন্ধে এই ছেলেটির অভিজ্ঞতাই যে অধিক তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কাজেই আলোচনার জন্য পিনাকীই সর্ব্বপ্রথম আহূত হইল।

পিনাকী উঠিয়াই যে কবির প্রশস্তি গাহিল, তাহা আলোচনাকারী অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর অন্তরে কিঞ্চিৎ দোলা দিল, কিন্তু ইণ্ডিয়া-কটেজের ছেলেগুলির সহিত পিনাকীর পরম প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যপ্রিয়কে পর্য্যন্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ করিয়া দিল। সত্যব্রতের মনে প্রশ্ন জাগিল—ভূতের

মুখেও তাহা হইলে রাম নাম উচ্চারিত হয়! কিন্তু ভূতের প্রকৃত অভিপ্রায়টা কি?

আসল কথা এই যে, পিনাকী তাহার আলোচনার সূচনাতেই বলিল: ভারতবর্ষের এমন একজন কবির নাম আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘোষণা করছি, বর্ত্তমানে যিনি শুধু ভারতের নন—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর নাম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা নগরী তাঁর জন্মস্থান।

অধ্যাপক ব্যালফোর্ড উল্লাসের সুরে পিনাকীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন: এ-যুগের একজন সত্যকার কবির নাম তুমি করেছ। ঠাকুর কবির কবিতার অনুবাদ আমি পড়েছি।

ছাত্রদের ভিতর হইতে কয়েকজন কহিল: কিন্তু আমরা ত পড়িনি স্যর! তবে নাম তাঁর শুনেছি। কবিতাও শুনতে আগ্রহ হচ্ছে।

পিনাকী কহিল: "উইণ্ডসর" ম্যাগাজিনে এই কবির একটি নূতন কবিতার সমালোচনা ছাপা হয়েছে। কবিতাটির নাম 'উর্ব্বশী'। বিখ্যাত সমালোচক মিষ্টার টমসন এই কবিতাটির কিছু কিছু অংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করে বলেছেন—Urbasi is perhaps the greatest lyric in all Bengali literature and probably the most unalloyed and perfect worship of Beauty which the world's literature contains—যদি বলেন ত মিষ্টার টমসনের অনুবাদ করা অংশ ক'টি আমি পড়ে শোনাতে পারি।

শত শত কণ্ঠের স্বর একসঙ্গে বাহির হইয়া কথাটার সমর্থন করিল। ভোজসভায় সেই মুহূর্ত্তে যেন উৎসাহের একটা উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল।

"উইণ্ডসর ম্যাগাজিন" নামে যে বিখ্যাত বিলাতী মাসিক পত্রিকায় বাঙ্গালী কবির এই প্রশস্তি ছাপা হইয়াছিল, পিনাকী তাহা হইতে সমগ্র আলোচনাটি পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়া দিল। সমালোচনায় উক্ত কবিতার কতিপয় ছত্রের ইংরাজী অনুবাদও ছিল। পিনাকীর পাঠ শেষ হইলে প্রশংসাধ্বনিতে ভোজসভা মুখরিত হইয়া উঠিল।

অধ্যাপক মিষ্টার বর্ট বলিলেন: যে কবিতার আংশিক অনুবাদ এমন মর্ম্মস্পর্শী, তার মূল আরও কত চমৎকার!

অধ্যাপক মিষ্টার মায়ার্স বলিলেন: ঠাকুর-কবির মূল কবিতাটি শোনবার ভারি আগ্রহ আমার হচ্ছে। কথার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন: ঠাকুর-কবির দেশের অনেকগুলি ছেলেকেই ত এ-সভায় উপস্থিত দেখছি, মূল কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারেন—সভায় এমন কেউ আছেন?

সত্যব্রত এই সময় উঠিয়া উত্তর দিল: আপানাদের সমক্ষে ঠাকুর কবির কবিতা আবৃত্তি করবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য এবং ভাগ্যবান বলে মনে করছি। আমার পক্ষে আরও গৌরবের হচ্ছে—ঠাকুর-কবি বাঙ্গালী, তাঁর মূল কবিতার ভাষা বাঙ্গলা। এখন কথা এই, বাঙ্গলা কবিতা কি আপনাদের বোধগম্য হবে!

অধ্যাপক ব্যালফোর্ড কহিলেন: এ কথার উত্তরে আমি আমার বন্ধু অধ্যাপক মিষ্টার বর্টের কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলছি—ভালো কবিতা ভালো লাগবেই, তার ভাব শ্রোতার প্রাণে মনে দোলা দেয়—প্রকৃতির প্রাণের সঙ্গে তার যোগ থাকে; ভাষা নিয়ে গোল বাধে না। মানুষের ভাষা ত সাপ বোঝেনা, কিন্তু মানুষের মুখে বাজানো বাঁশীর

সুরে সেও তন্ময় হয়। প্রকৃত গানে প্রকৃতির প্রাণও রসে উঠে। তুমি বাঙ্গলা ভাষাতেই কবিতা পড়।

সত্যব্রত কহিল: তাহলে এ সম্বন্ধে ঠাকুর-কবির নিজের যে অভিমত, শুনলে আপনারা আরো খুসী হবেন। তিনি বলেন—নিজের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতাই হচ্ছে কবিত্ব। আর, কাব্যের যাঁরা যথার্থ রসজ্ঞ তাঁরা নিজের ভাব বা ভাষাকে কাব্যে খোঁজেন না—যে কোন ভাব বা ভাষার রূপ তাতে ফুটে উঠলেই তাঁরা আনন্দ পান।

সত্যব্রতের মুখে কাব্য সম্বন্ধে ঠাকুর-কবির এই অভিমত শুনিয়া সভাস্থ সকলেই সমস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অধ্যাপক ব্যালফোর্ড কহিলেন: কাব্য সম্বন্ধে যাঁর এমন উদার মনোবৃত্তি, তিনিই প্রকৃত কবি। তাঁর কবিতা ভালো হবেই।

সত্যব্রত কহিল: এই ভোজসভায় কবিতার আলোচনা হবে এবং ভারতীয় ছাত্রগণ আলোচনায় যোগ দেবেন জেনে আমিই প্রথম ঠাকুর-কবির প্রসঙ্গ তোলবার সৌভাগ্য পাব ভেবেছিলুম। কিন্তু খুবই আনন্দের কথা, আমার স্বদেশীর বন্ধু—বোম্বাই প্রদেশবাসী মিষ্টার পিনাকীলাল এই বিদ্বজ্জন সভার ঠাকুর-কবিকে প্রকাশ করে ভারত-বাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমার বন্ধু যে ঠাকুর-কবির এমন অনুরক্ত ভক্ত, একসঙ্গে বাস করেও এ খবর আমি জানতুম না। আজ এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারছি, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি এবং অজ্ঞতার জন্য আমরা কত ভুল ধারণাকেই মনে পোষণ করে থাকি।

সত্যব্রতর এই উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা পিনাকী নিবিষ্টচিত্তেই শুনিতেছিল

মনে মনে সে তাহার পলিটিক্সের গুরুদেবটির উদ্দেশে সভক্তি প্রণতি জানাইল :—সত্যই, দুর্দ্দান্ত হিংস্র প্রতিপক্ষকে মাত করিবার পক্ষে অপরূপ এই অহিংসার চালটি কি চমৎকার! ভাবী আশার আলো তাহার মানস-চক্ষুর উপর দপ দপ করিয়া যেন অন্যের অলক্ষ্যে জ্বলিয়া উঠিল।

সত্যব্রত তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে :

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দন বাসিনী উর্ব্বশী।

*　　*　　*

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী।

*　　*　　*

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছে তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।
ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী—
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশী।'

দুই চক্ষু পাকাইয়া পিনাকী দেখিল, জনপূর্ণ হল স্তব্ধ, সকলেই উৎকর্ণ হইয়া এই দুর্ব্বোধ্য আবৃত্তি শুনিতেছে। অধ্যাপক ব্যালফোর্ডের

কথাগুলি তাহার মনে পড়িল—সত্যই, সত্যব্রত যেন মধুর সুরে কোন অপূর্ব্ব বাঁশী বাজাইতেছে! দপ দপ করিয়া তাহার মনে আশার যে আলো জ্বলিতেছিল, কে যেন এক ফুৎকারে তাহা সহসা নিবাইয়া দিল। কি সর্ব্বনাশ! অদৃশ্য সাপকে সে-ই খোঁচাইয়া বাহির করিবার উপলক্ষ হইল! যে কবির নামও কোন দিন সে শুনে নাই, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাকেই কিনা সবার উপরে তুলিয়া দিতে হইল, আর সেই শ্রেষ্ঠ কবিও বাঙ্গালী? পিতার চিঠির অক্ষরগুলি অগ্নিরেখার মত তাহার চক্ষুর উপর যেন ফুটিয়া উঠিল। একে রাষ্ট্র-নেতা মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর নামে সে অস্থির, এখন আর এক বাঙ্গালীও কাব্যরাজ্যের গদীর উপর চাপিয়া বসিল! না,—ইহা সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নহে। ঈর্ষ্যা ও হিংসায় তাহার দেহের শিরাগুলি যেন মোচড় দিয়া উঠিল। কিন্তু ঠিক এই অবস্থায় গুরুর নির্দ্দেশ তাহাকে যেন চাবুকের ঘা দিয়া সংযত করিল—"মনের হিংসাকে অহিংসার পরদা দিয়া ঢেকে রাখবে—কুইনিনের পিলের উপরে যেমন চিনির আবরণ পড়ে। রাগ হলে হাসবে, খবরদার—জানতে দেবেনা কাউকে যে তুমি রেগেছ কিম্বা প্রতিপক্ষের উন্নতিতে বেদনা পেয়েছ।"—সঙ্গে সঙ্গে পিনাকীর মুখের ভাব একবারে বদলাই গেল, এমন ভঙ্গিতে সে কবিতার উদ্দেশে চিত্ত নিবিষ্ট করিল যে, উর্ব্বশী কবিতার প্রতি শব্দটি যেন তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমের ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

কবিতা শেষ হইলে শ্রোতাদের উল্লাসধ্বনিতে হলটি মুখরিত হইয়া উঠিল। বহু অনুরোধে সত্যব্রতকে ঠাকুর-কবির আরও কতিপয় বিখ্যাত কবিতা পাঠ করিতে হইল। কবিতাগুলির মর্ম্মকথাও

ইংরাজী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া শ্রোতাদের আনন্দবর্দ্ধন করিল সে। ফলে সমবেত অধ্যাপকগণকে স্বীকার করিতে হইল, যে ভাষায় এমন উত্তম উত্তম কবিতার সৃষ্টি হইতেছে, সেই ভাষা আমাদের শিক্ষা করা উচিত। আমরা এ সম্বন্ধে অবহিত হইব।

ভোজের পর বাসায় ফিরিবার পথে ইণ্ডিয়া কটেজের ছেলেরা পিনাকীর আচরণে একেবারে শতমুখ আর কি!

টম কহিল: মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, পিনেসকে যা ভাবতে তা নয়; তোমার দেশের কবির খবর পর্য্যন্ত রাখে।

ভবানীশঙ্কর কহিল: একেই বলে বাহাদুর! কিছু খরচ করে উইণ্ডসর ম্যাগাজিন একখানা কিনে কেমন সহজে বাজিমাৎ করে দিলে! এখন থেকে দেখছি মাসিক পত্রিকার পাতাগুলোয় চোখ বুলোতে হবে।

সত্যব্রতও পিনাকীর আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। সুযোগ পাইলেই যে-লোক বাঙ্গালীকে সকলের সমক্ষে খাটো করিতে উৎসাহী হইয়া উঠে, তাহার মুখে আজ আর বাঙ্গালী কবির সুখ্যাতি ধরে না! রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকেও কোন দিন যে আমল দেয় নাই, আজ হঠাৎ ঠাকুর-কবির উদ্দেশে তাহার অন্তরে শ্রদ্ধার বান ডাকিল কেন? পিনাকী যে কাব্য-রসিক, তাহার ত কোন নিদর্শনই এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, আর বাঙ্গলা ভাষায় তাহার বুৎপত্তির কোন পরিচয় সে ত দেয় নাই! সংলাপে বরাবরই তাহাকে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে, ভারতের কোন্ বিশিষ্ট ভাষাটি যে তাহার মাতৃভাষা তাহাও সে ব্যক্ত করে নাই। তবে কি পিনাকী বাঙ্গলা

ভাষায় অভিজ্ঞ? সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত কহিল—আমরা বোধ হয় পিনাকীকে ঠিক বুঝতে পারিনি। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর আম আছে, পাকলেও তার রঙ্‌ বদলায় না, কাঁচার মত স্বাভাবিক রঙ্‌ই থাকে, এই জন্য লোকে তার নাম দেয়—বর্ণচোরা আম। পিনাকীও ঠিক্‌ এই জাতীয় আমের মতই। সব জানে, ভিতরটা ওর পাকা, কিন্তু জানতে দেয় না। আমার মনে হয়—পিনাকী বাঙ্গলা ভাষাটাও ভালো জানে। নয় কি পিনাকী? ঈশ্বরের শপথ, সত্য কথা বলবে?

উত্তরটা শুনিবার জন্য সত্যব্রত হঠাৎ থামিল। দলের ছেলেগুলি একটু হাসিয়া কটেজের পথ ধরিল। পিনাকী পিছাইয়া পড়িয়াছিল, সত্যব্রতর সহিত আলাপের এই সুন্দর সুযোগ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল: শপথ করবার আবশ্যক নেই, মিথ্যা আমি বলি না। সত্যিই আমি বাংলা জানি না, ছেলেবেলা থেকে ইংরাজী বলতেই আমরা অভ্যস্ত,—এই ভাষাটাই মাতৃভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে তোমার মুখে আজ বাঙ্গলা কবিতা শুনে বাঙ্গলা ভাষা শিখবার ভারি সাধ হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যেন ঠাকুর-কবির কবিতা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঐ কবিতা পড়ে বোঝবার মত বাঙ্গলা বিদ্যা আমাকে উপার্জ্জন করতেই হবে। এ ব্যাপারে আমাকে তোমার সাকরেদ করে নাও। অবশ্য, তোমাকে অমনি খাটাবো না, যথাসাধ্য দক্ষিণাও দেব।

সতব্রত ঔৎসুক্যের সহিত পিনাকীর কথাগুলি শুনিতেছিল,

E td 1962

হিংসা ও অহিংসা

দক্ষিণার কথা উঠিতেই সে চমকিয়া উঠিল, প্রস্তাবটি যেন তাহার মর্য্যাদার গয়ে সহসা একটু খোঁচা দিল। যে ছেলেটি সহপাঠীদের মধ্যে সর্ব্বাধিক ব্যয়কুণ্ঠ, একটি পেনিও যে হিসাব করিয়া খরচ করে, বাজে খরচের পথটিও কখন মাড়াইতে চাহে না, তাহার মাথায় হঠাৎ বাঙ্গলা শিখিবার সখ চাপিয়াছে এবং তজ্জন্য সে অসঙ্কোচে দক্ষিণার কথাও পাড়িতেছে! চোখে মুখে হাসির ঝিলিক তুলিয়া সত্যব্রত অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল : বল কি, সখের খাতিরে দক্ষিণা দেবে! সত্যি?

—তুমি ত জানো, খেলার ছলেও আমি মিথ্যা বলি না।

—কিন্তু খেলার ছলে একটি পেনিও যে তুমি খরচ করতে ভালবাস না এ খবরও আমি জানি।

—একটা ভাষা শিক্ষাকে তুমি কি ছেলেখেলা বলতে চাও ব্যানার্জ্জী?

—শিখবার মত অনেক ভাষাই ত আছে। হঠাৎ বাঙ্গলার উপর তোমার এ আসক্তি কেন বলবে? ঠাকুর-কবির উর্ব্বশীর রূপজ্যোতি যে তোমাকে এ পথে আকর্ষণ করেছে, এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না।

পিনাকী একটু থামিয়া মনে মনে উত্তরটি ঠিক করিয়া লইল; তারপর কহিল : যদি বলি, প্রায়শ্চিত্যের জন্যই এ পথ ধরেছি।

বিস্ময়ের স্বরে সত্যব্রত কহিল : তার মানে?

পিনাকী কহিল : মানেটা আমাদের দু'জনের ব্যবহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রায় এক সঙ্গেই আমরা ইণ্ডিয়া কটেজে ভর্ত্তি হই। কিন্তু এমনি কুক্ষণে আমাদের চোখোচোখী হইয়াছিল যে সেই থেকেই

একটা রেষারেষি চলে আসছে। তুমি মহৎ, তাই সেটাকে ব্যক্তিগত ভাবেই নিয়েছিলে, আমি কিন্তু এমনি সয়তান যে, আমার আক্রোশ তোমাকে উপলক্ষ করে তোমার জাতি ও দেশের উপরে গিয়ে ঠেকেছিল। শেষ পর্য্যন্ত সেটা এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠে যে, অবস্থাটা আমার সংসারত্যাগী যোগসিদ্ধ বাবাকে জানিয়ে তাঁর কাছে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি প্রার্থনা করি। উত্তরে বাবা চিঠিতে যে উপদেশ দিয়েছেন, তাতে আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে, আমি নতুন মানুষ হয়েছি।—বাবা তাঁর পত্রের প্রথমেই তুলসীদাসের একটা দোঁহা তুলে দিয়েছেন—

য়হ জগ দারুণ দুখ নানা,
সব-তে কঠিন জাতি অপমানা।

এর মানে হচ্ছে—এই জগৎ দারুণ স্থান, এখানে দুঃখও অনেক। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন দুঃখ হচ্ছে—জাতির অপমান। এখন আমার মনে এই দুঃখই ভীষণ বেদনা দিচ্ছে—আমার পুত্র হয়ে তুমি খেলার ছলে এমন একটা বিরাট জাতির অপমান করতে বসেছ—যার সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে। সর্ব্বদা মনে রাখবে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ বাঙ্গালী ছিলেন, বাঙ্গলা থেকেই তাঁরা বোম্বাই প্রদেশে এসে বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এখন আমার উপদেশ শোন, মন থেকে বাঙ্গালী বিদ্বেষ মুছে ফেলে তুমি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা কর, তা হলেই বাঙ্গলার উপর তোমার শ্রদ্ধা আসবে। এইটিই হচ্ছে তোমার প্রায়শ্চিত্য। এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে আমাকে জানাবে, আমি তার ব্যবস্থা করবো।—বাবার এইপত্র পাবার পর থেকেই আমার মনের

গতিরও পরিবর্ত্তন হয়, বোধ হয় সেটা তোমরা লক্ষ্যও করেছ। আমি কিন্তু নীচু হয়ে ব্যাপারটা জানাবার কোন রাস্তাই ঠিক করতে পারিনি। রাস্তা দেখিয়ে দেয়—উইণ্ডসর ম্যাগাজিনে ছাপা ঐ সমালোচনাটা। তার পরেই কলেজের 'গেষ্ট-হল' থেকে নিমন্ত্রণ পাই, রাস্তাও অমনি খুলে যায়। এখন ভাই, তুমি হাত ধ'রে আমাকে পার করে দাও, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

সত্যব্রত এবার স্বাভাবিক স্বরেই কহিল ঃ তাইত, এ যে সত্যিই একটা কাহিনী হে! ভাল, এর পরে আর অন্য কথা নেই। শুনে খুসী হলুম যে, বাঙ্গলার মাটির সঙ্গে তোমারও সম্বন্ধ রয়েছে। যাক্, এসব কথা সকলকে শুনিয়ে লাভ নেই, ফলে এই নিয়ে তোমাকে অস্থির করে তুলবে। তাহলে কাল থেকেই শিক্ষা শুরু করা যাবে, আর দক্ষিণার ব্যবস্থা তোমার বাবাই যখন করবেন জানিয়েছেন, এবং দক্ষিণা নেওয়াটা ব্রাহ্মণের পেশা যেখানে, আমিই বা 'না' বলব কেন? সময় হলেই চেয়ে নেব, এখন কাজ ত চলুক।

রাত্রির রাজপথে প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি ছেলের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্যের অলক্ষ্যে এইভাবে একটা 'প্যাক্ট' হইয়া গেল।

সত্যব্রত ভাবিল, মন্দ কি! হাতের কাঁঠালটি ভাঙ্গিবার মত একটি শক্ত আধারকে খুঁজিয়া বাহির করা ইদানীং তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, এভাবে যে হঠাৎ সেটি হাতের কাছে আসিয়া পড়িবে, কে জানিত? এখন তাহাকে জানিতে হইবে আধারটি ভার সহিবার পক্ষে কিরূপ নির্ভরযোগ্য।

পিনাকীও এই সময় ভাবিতেছিল—যে জাতির সহিত যুঝিতে

হইবে তাহার ভাষাটাকে ছাতুর মত গুলিয়া গলধঃকরণের উপযোগী করিয়া না লইলে জিতিবার সম্ভাবনা থাকে না। ব্যানার্জ্জীকে মডেল করিয়া মতলবের কাঁঠালটি তাহার মাথাতেই ভাঙ্গিতে হইবে। ইহাতে যদি মাশুল কিছু দিতে হয়—কুছ পরোয়া নাই। এখন তলে তলে থাকিয়া ব্যানার্জ্জীর পকেটের সন্ধানটুকু লওয়া চাই।

কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নিয়তি যে অলক্ষ্যে এই দুই সন্ধানীর অভিসন্ধি শু‍ি য়া হাসিতেছিলেন, তাহা কি কেহ লক্ষ্য করিয়াছিল ?

০ ০
০

সত্যব্রত সত্যই এক আশ্চর্য্য প্রকৃতির ছেলে। পাঁচ হাজার ছেলের ভিতর হইতে এই ধরণের দোষেগুণে বেপরোয়া ছেলে আর একটি বাহির করিয়া জোড় মিলাইতে পারা যায় কিনা সন্দেহের কথা। বাল্যকাল হইতেই সত্যব্রত উল্টা রাস্তায় চলিতে অভ্যস্ত। সহজেই যে সব কাজে সাধারণের প্রশংসা পাওয়া যায়, সত্যব্রত ভুলিয়াও সেদিকে ভিড়বে না ; যাহা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত, তাহার ভিতর হইতে আসল বস্তুটি বাহির করিতে সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িত। নিজে আস্বাদ না লইয়া পরের মুখের কথায় সায় সে কিছুতেই দিবে না। দুর্দ্দান্ত বলিতে যে আখ্যাগুলি প্রয়োগ করা চলে, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটি এই ছেলেটি অঙ্গে ভূষণের মতই জড়াইয়া গর্ব্বানুভব করিত। কোন বিষয়ে তাহার ভণ্ডামী অথবা বাড়াবাড়ি ছিল না। বাল্যকাল হইতেই নিজে সে নিজের বিচারক। তবে যতই দুরন্ত ও কাট-গোঁয়ার হউক, আবশ্যক হইলে এমন শিষ্ট সজ্জন সাজিত যে, তাহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহালদের বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। আর

একটি বিষয়ে সে বিশেষ কু-খ্যাত হইয়া উঠে। মিথ্যাকে সাজাইয়া সত্য প্রতিপন্ন করিতে এবং সত্যকে মিথ্যা বানাইয়া দিতে তাহার দক্ষতা সহপাঠী ও প্রতিবাসীদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলে। সত্যর এই ক্ষমতা দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা বলিতেন—লেখাপড়া শিখে এ ছোকরা যদি উকীল হতে পারে, তাহলে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে ছাড়বে। সত্যব্রত সকল বিষয়েই বেপরোয়া। নিন্দায় কুণ্ঠিত নয়, প্রশংসায়ও অবিচলিত।

সত্যব্রতর বাবা সিদ্ধনাথ শ্বশুরের অর্থে বিলাত গিয়াছিলেন। শ্বশুর রাজীবলোচন এলাহাবাদের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং অর্থশালী জমিদার। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল জামাতা আই সি এস পাশ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পাকা হইয়া বসেন। কিন্তু সিদ্ধনাথ ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীন প্রকৃতি। পঠদ্দশাতেই আই সি এস্ পদ-প্রত্যাশী ছাত্রদের প্রতি কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধের কড়াকড়ি দেখিয়া তাঁহার অন্তর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে এবং তিনি সিবিল সার্ব্বিসের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবার সঙ্কল্প করেন। এই সম্পর্কে শ্বশুরের সহিত সিদ্ধনাথের মনোমালিন্য ঘটে। তিনি জামাতাকে জানাইলেন—'ব্যারিষ্টার নয়, সিবিলিয়ান হয়েই তোমাকে এলাহাবাদে ফিরতে হবে।' সিদ্ধনাথ উত্তর দিলেন—'সে পাট চুকিয়ে দিয়েছি, ব্যারিষ্টার হয়েই এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রাকটিস্ করবো।' জামাতার স্পর্দ্ধায় ধনকুবের শ্বশুর জ্বলিয়া উঠিলেন, লিখিলেন 'এই যদি তোমার সত্যিকার ইচ্ছা হয়, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হও ; আমার কাছ থেকে টাকা আর যাবে না, কোন সম্পর্কই তোমার সঙ্গে থাকবে না।'

সিদ্ধনাথের স্ত্রী সাবিত্রীদেবী একমাত্র শিশুপুত্র সত্যব্রতকে লইয়া সে সময় পিত্রালয়েই ছিলেন। বিবাহের সময় যদিও প্রকাশ পাইয়াছিল যে, সিদ্ধনাথের পিতা মস্ত বড় লোক—প্রকাণ্ড একটা কয়লার খনির মালিক। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই তাঁহার সেই খ্যাতির প্রতিষ্ঠা তাসের প্রাসাদের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে; সমস্ত সম্পত্তি—মাত্র কয়েকখানি পরিধেয় বসন ব্যতীত—বসত-বাড়ীর প্রত্যেক জিনিষটি উত্তমর্ণদের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি যে কোন্ পথে তাঁহার নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ করেন—কেহই তাহার সন্ধান পায় নাই। সিদ্ধনাথ তখন শ্বশুরালয়ে থাকিয়া এফ-এ পড়িতেছিলেন। ডাকযোগে পিতার যে শেষ পত্রখানি তাঁহার হাতে আসে, তাহাতে এই সাংঘাতিক ব্যাপারটির আভাসটুকু সংক্ষেপে এইভাবে লেখা ছিল:

'ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আজ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। আমি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে নামি, পিছনে ছিল আমার বাবার প্রচুর দেনা, সম্মুখে সহস্র বাধা। তথাপি নিজের চেষ্টায় বাবার আত্মাকে ঋণমুক্ত করিয়া নিজেও প্রতিষ্ঠাপন্ন হই। কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারি নাই। হঠাৎ যে কেমন করিয়া বড় হইয়াছিলাম তাহা যেমন ভাবিয়া পাই না, তেমনই কি করিয়া যে মহাঋণে জড়াইয়া পড়িলাম ঠিক করিতে পারি না। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলাম—কর্ম্মজীবনের এইখানেই দাঁড়ি টানা উচিত। তাই সর্ব্বস্বের বিনিময়ে মুক্তির চাবিকাঠিটি লইয়া তার দরজাটির সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমাকে সন্ধান করিবার চেষ্টা করিও না, পাইবে না। তোমার গর্ভধারিণী সাধ্বী ও লক্ষ্মীরূপা ছিলেন। তিনটি বৎসর হইল তিনি পরলোকের পথে পাড়ি দিয়াছেন, আমার দৃঢ়-

বিশ্বাস যে, সৌভাগ্যের ঝাঁপিটিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে, আমার জীবনে আর ফিরিবে না। এখন তোমার কাছে আমার এইটুকু বক্তব্য যে, বাবার প্রচুর ঋণ মাথায় লইয়াও রিক্ত অবস্থায় আমি সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম ; তোমার পশ্চাতে ঋণ নাই, সহায় আছেন ধনাঢ্য শ্বশুর। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় তুমি বৃত্তিও পাইয়েছ। শুধু আমার ঐশ্বর্য্য নয়—তোমার এই কৃতিত্বের জন্যই রাজার মত প্রভাবশালী রাজীবলোচন গাঙ্গুলী মহাশয় তোমাকে জামাতার মর্য্যাদায় বরণ করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ-সুবিধাও তোমার অল্প নয়। এ অবস্থায় আমার নিরুদ্দেশযাত্রা কোন পক্ষেরই ক্ষোভের বিষয় না হওয়াই উচিত। আমার এই অতর্কিত প্রস্থানকে মহাপ্রস্থান বলিয়াই গ্রহণ করিতে পার।'

শ্বশুর রাজীবলোচন অবশ্য জামাতার পৈতৃক সম্পত্তি উত্তমর্ণদের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু সিদ্ধনাথের আপত্তিই তাহাতে অন্তরায় হইয়া উঠে। পিতার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রচেষ্টাই করিতে সম্মত হন নাই। শ্বশুরও এই জেদি প্রকৃতি ছেলেটিকে ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই। বরং তাহাকে নিকটে রাখিয়া কৃতবিদ্য করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হন। ফলে, সিদ্ধনাথ বি, এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলে তিনি তাহাকে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাহার অদৃষ্টক্রমে এক বৎসর পরেই সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে মত পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধনাথ তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিলেন।

শ্বশুরের শেষ পত্র পাইবার পর সিদ্ধনাথ পত্নী সাবিত্রীকে

সকল কথা জানাইয়া লিখিলেন—'তোমার বাবা আমাকে এখন ভারি মুস্কিলে ফেলেছেন। তাঁর টাকাই প্রবাসে আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল। সেটি এখন সরে যাচ্ছে। সুতরাং তোমায় সাহায্যই আমারপ্রধান ভরসা। এণ্ট্রেন্স থেকে শুরু করে বরাবর বৃত্তি পেয়েছি, সে টাকার অধিকাংশই তোমাকে দিয়েছি। আমার বাবা তোমাকে একশো মোহর যৌতুক দিয়েছিলেন, তাঁর দেওয়া গয়নাও পাঁচ হাজারের কম নয়। এ সময় যেমন করে হোক হাজার পাঁচেক টাকা আমাকে পাঠাবে। বছর দেড়েকের মধ্যেই আমি দেশে ফিরবো। ওখানে গিয়ে সম্বৎসরের মধ্যেই এই টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দেব। আমার বাবা রিক্ত থেকে লক্ষপতি হয়েছিলেন, আমি তাঁর ছেলে। এই টাকাই আমার সৌভাগ্যের ভিত্তি রচনা করবে। টাকার প্রত্যাশায় আমি রইলুম ; হাত আমার খালি, সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, আলো দেখাও।'

যথাসময় স্ত্রীর পত্র আসিল, কিন্তু তাহাতে অন্ধকার ত কাটিলই না বরং আরও গাঢ়ভাবে তাঁহাকে যেন নিমগ্ন করিয়া দিল। সহ-ধর্ম্মিণী সাবিত্রী দেবী লিখিয়াছেন—'বিলেতে গিয়ে তোমার বুদ্ধি-লোপ হয়েছে বলেই আমার বাবার সহস্র দয়ার কথা ভুলে অকৃতজ্ঞের মত ব্যবহার তুমি আজ করছো। আমার বাবার টাকায় তুমি যখন বিলেতে পড়তে গেছো, তাঁর ইচ্ছামতই পড়াশোনা করতে তুমি বাধ্য। তোমার অবাধ্যতার জন্যে বাবা যদি হাত গুটিয়ে থাকেন সে দোষ কার? আমার বাবা তোমাকে মুস্কিলে ফেলেছেন, না তুমি নিজেই সাধ করে মুস্কিলকে ডেকে এনেছো? আরো আশ্চর্য্যের কথা এই

যে, তুমি তোমার দেউলে-বাবার নজীর দেখিয়ে সৌভাগ্যের ভিত্তি রচনার কল্পনা করেছো! এতে লজ্জায় ঘৃণায় মাথা আমার নীচু হয়ে গেছে। তোমার 'ব্যাঙ্কক্রাপ্ট' বাবা তোমাদের বংশের উপর কলঙ্কের কত বড় ছাপ দিয়ে গেছেন সে ধারণা বোধ হয় তোমার নেই। তুমি আমার কাছে টাকা চেয়েছ; তার মানে, আমি টাকা পাঠিয়ে তোমাকে আমার বাবার সঙ্গে 'চ্যালেঞ্জ' করকার ফুরসুদ দেব! তুমি জামাই, বেইমানী করা তোমার পক্ষে যতটা সোজা, আমি মেয়ে—আমার পক্ষে ততখানি শক্ত। এই যে চিঠিখানা লিখছি—তাঁকে জানিয়ে, তাঁর অনুমতি নিয়ে। এখন আমার কথা শোন, ওসব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দাও। যা পড়তে গিয়েছ ওখানে, তাই পড়ো; 'সিবিলিয়ান' হয়ে ফিরে এস। তোমার সুমতি হয়েছে জানিয়ে 'কেবল' করলেই টাকা পাবে। পাঁচ হাজার কেন—দশ হাজার টাকা পাঠাতেও বাবার আপত্তি নেই।'

পত্নীর এই পত্রখানি বিধিলিপির মত রিক্ত অসহায় ঋণগ্রস্ত প্রবাসী যুবার জীবন-যাত্রার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি যে প্রলোভনকে কোন দিন প্রশ্রয় দেন নাই, এখন তাহাই যেন হাতছানি দিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল।

ইহার যে মর্ম্মান্তিক পরিণতি ঘটে, পরবর্ত্তী মেলে সংক্ষিপ্ত এক খানি পত্র তাহার কাহিনী বহন করিয়া এলাহাবাদে উপস্থিত হইল। পত্রখানি স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশেই লিখিত, তাহা এইরূপ:

'তোমার চিঠি চিরদিনের মতই আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান চূড়ান্ত রকমেই সৃষ্টি করে দিয়েছে জেনে তুমি হয়ত আশ্বস্ত হবে। প্রবাসে

আমার মান মর্য্যাদা শিক্ষা এবং জীবিকার জন্য আমাকে বাধ্য হয়ে এমন এক সমাজের নিকট আত্মবিক্রয় করতে হয়েছে—এর পর শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছাড়া অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলা ভিন্ন উপায় নেই। এই পত্রখানি সেই নির্দ্দেশ নিয়েই চলেছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধই আর রইল না। আমার পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে তোমার উপর স্বামীর অধিকার স্থাপনের জন্য কোন রকম চেষ্টা কদাচ হবে না, তুমিও অতঃপর দাম্পত্য-বন্ধন-মুক্ত হয়ে নিজের ইচ্ছানুসারে কালযাপনের অধিকারিণী হলে! যে দুর্ভাগ্য শিশুটি তোমার অঙ্ক আশ্রয় করে আছে, তার সম্বন্ধেও আমি সকল স্বত্ব ত্যাগ করলুম।'

ব্যাপারটি যে এরূপ সাংঘাতিক হইবে, এপক্ষ কল্পনাও করেন নাই। টাকার অভাবে বিদেশে ছেলের জেদ অধিকদিন স্থায়ী হইবে না, মত পালটাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিবে এই ধারণাটাই দৃঢ় ছিল। পাকা বিষয়ী মানুষ হইয়াও গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার হিসাবে একটা মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিলেন। যাহাকে লইয়া হিসাব, সে রহিয়াছে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে এমন এক সুদুর্গম স্থানে—ইচ্ছা করিলেই যাহার নাগাল পাইবার উপাই নাই। এক্ষেত্রে স্বভাবতই সংশোধনের যে ব্যবস্থা হইবার কথা, তাহার অবশ্য অন্যথা হইল না, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। গোড়া কাটিয়া গাছের গায়ে জল ঢালিলে পণ্ডশ্রমই প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। সিদ্ধনাথের নামে প্রেরিত 'কেবেল' এবং টাকা বিলাত হইতে ফেরৎ আসিল। কন্যা কাঁদিয়া কহিল—'কি হবে বাবা?' বাবা তখন উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। তাঁহার পরিচিত এক ইংরেজ

বন্ধু—যিনি দীর্ঘকাল এলাহাবাদে কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়া বিলাতে অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন, জামাতা-সংক্রান্ত ব্যাপারটি তাঁহাকে জানাইয়া প্রতিকারপ্রার্থী হইলেন। উক্ত ভদ্রলোকের নাম মিষ্টার জনসন। যথাসময় তাঁহার নিকট হইতে যে সমাচার আসিল, তাহা সিদ্ধানাথের মৃত্যু সংবাদের মতই মর্ম্মান্তিক।

মিষ্টার জনসনের পত্রে প্রকাশ পাইল যে, সিদ্ধানাথ সত্যই তাঁহাদের নাগালের বাহিরে ইহজীবনের মত চলিয়া গিয়াছেন। বিলাতের কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা সিদ্ধনাথের প্রতি আকৃষ্টা হয়। কন্যার ধনবতী বিধবা মাতা ভবিষ্যৎ উন্নতির নানারূপ প্রসঙ্গ তুলিয়া সিদ্ধনাথকে প্রলুব্ধ করিতে সচেষ্ট থাকেন। সিদ্ধনাথ কিন্তু তাহাতে বিচলিত হন নাই। তিনি যে বিবাহিত এবং তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ একথা কন্যার মাতাকে তিনি জানাইয়া দেন। সিদ্ধনাথ ভাবিয়াছিলেন, ইহা'র পর কন্যাপক্ষ নিরস্ত হইবে। কিন্তু কন্যার বুদ্ধিমতী মাতা কন্যার মনের অবস্থা বুঝিয়া সিদ্ধনাথকে জানান—তিনি যদি দেশের সম্পর্ক কাটাইয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন তাহাতেও তাঁহার কোন আপত্তি নাই। তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি এবং সঞ্চিত অর্থের আয়ে তাহাদের জীবন নিশ্চিন্তায় ও নিরুদ্বেগে কাটিয়া যাইবে। ইহার উপর সিদ্ধানাথ যদি বিদ্যার্জ্জন করিতে চান তজ্জন্য তিনি অকাতরে তাঁহার ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। কোন অর্থকষ্টই তাঁহার থাকিবে না। সিদ্ধনাথ এ প্রলোভনও দমন করেন, এমন কি এই ভদ্র ধনী পরিবারটির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হওয়া সত্ত্বেও, ইহার পর তাঁহাদের সংশ্রব পর্য্যন্ত ছিন্ন করিয়া ফেলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী দূরদর্শিনী মহিলাটি যে সিদ্ধনাথের উপর

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, সিদ্ধনাথ তাহা জানিতেন না। এদিকে উপর্য্যুপরি কয়মাস যখন তাঁহার টাকা আসা বন্ধ হইয়া যায়, নিজের সঞ্চিত অর্থ এবং সৌখীন সামগ্রীগুলি বিক্রয় করিয়াও তিনি সামলাইতে পারেন নাই, সে অবস্থায় তাঁহাকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার সর্ত্ত খুব শক্ত। অগত্যা একান্ত নিরুপায় অবস্থায় স্ত্রীর নিকট তিনি টাকার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, বেচারীর অবস্থাটা স্ত্রীও উপেক্ষা করিয়া নিষ্ঠুর নির্দ্দেশ দিলেন। চড়াসুদের দেনা তখন তাঁর নাক ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পরিশোধ না করিলে পরদিনই তাঁর বে-ইজ্জত হইবার কথা। অগত্যা, যে প্রলোভনকে তিনি দমন করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে তাহাই একান্ত কাম্য হইয়া উঠিল। উক্ত মহিলার সর্ত্তে সম্মতি দিয়া তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। মহিলা তৎক্ষণাৎ তাঁর সমস্ত অভাব মিটাইবার জন্য পাঁচশো পাউণ্ডের চেক কাটিয়া দেন। বিবাহ তাঁহাদের হইয়া গিয়াছে, দেশে সিদ্ধনাথের বিবাহিতা স্ত্রী আছে জানিয়াই কন্যা তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। তবে সিদ্ধনাথ স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বিবাহের পূর্ব্বেই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুতরাং এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে নিষ্পত্তির কোন পথইআর নাই। আইনের আশ্রয় লইলে ক্লেদকারীই বাড়িবে—যে কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা আর যোড়া লাগিবে না।

মিষ্টার জনসনের চিঠি পাইবার পর এ-পক্ষকে সিদ্ধনাথের সম্বন্ধে সকল আশাই ত্যাগ করিতে হইল। গাঙ্গুলী মহাশয় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—'আমিও নিশ্চিন্ত হলুম। বুঝলুম—সে মৃত, আত্মহত্যা

করেছে। এ হচ্ছে রক্তের দোষ।' কন্যাকে প্রবোধ দিলেন—'তুমি মন খারাপ ক'র না। মা, যার প্রকৃতি এমন উদ্ধত, প্রবৃত্তি এত নীচ—তাকে নিয়ে কখন সুখী হতে পারতে না। মনে কর—সে নেই। এখন ছেলেটাকে মানুষ করে তোল—বংশগত ব্যাধিটা ওকে যাতে না স্পর্শ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য। ওকে আমরা শোধন করে গড়ে তুলবো।'

সিদ্ধনাথ যখন বিলাত যাত্রা করেন, তাঁহার পুত্র তখন শিশু মাত্র, বয়স পাঁচ মাসও পূর্ণ হয় নাই। সূতিকাগারেই গাঙ্গুলী মহাশয় দৌহিত্রের নামকরণ করেন—বাবু। পিতামাতার পত্রগুলির অধিকাংশ স্থান অধিকার করিত বাবুর প্রসঙ্গ লইয়া। সাবিত্রী লিখিতেন স্বামীকে—'বাবু যে কি ভীষণ দুরন্ত হয়েছে লিখে তা জানান কঠিন। এইটুকু ছেলের ভয় ডর নেই, হামাগুড়ি দিয়ে সারা বাড়ী ঘুরে বেড়ায়।' সিদ্ধনাথ পত্রে ছেলেকে বাহোবা দিয়া লিখিতেন—'এ দেশের পৌনে ষোল আনা ছেলে এমনি দুরন্ত। আমার ইচ্ছে করে বাবুকে নিয়ে আসি এখানে।' স্বামীর এই ইচ্ছাটি সাবিত্রী হাসিতে হাসিতে পিতামাতাকে শুনাইয়া সে সময় একটা কৌতুকোচ্ছ্বাস তুলিয়াছিলেন। এখন সে কথাটা ঝাঁ করিয়া গাঙ্গুলি মহাশয়ের মনে পড়িয়া গেল। যদি জামাতা কোনদিন ছেলেটাকে লইয়া যাইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করে! তাড়াতাড়ি তিনি তাহারও সম্ভাবনায় দাঁড়ি টানিয়া দিলেন। কন্যার অজ্ঞাতে তাঁহার নাম দিয়াই সিদ্ধনাথের নামে এই মর্ম্মে এক 'কেবেল' পাঠাইলেন—'তোমার প্রস্তাব গ্রাহ্য; আমরা তোমাকে মৃত সাব্যস্ত করে নিয়েছি। মাঝখানে ছিল বাবু—সরু সূতোটির মত,

তাও ছিঁড়ে গেছে। লজ্জায় সে পৃথিবীর বাইরে পালিয়ে গেছে। সব শেষ ঃ' সঙ্গে সঙ্গে শিশুর নামটিও পাল্টাইয়া গেল, বাবু অতঃপর সতু হইল, ইহা সত্যব্রত নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

সাবিত্রী কিন্তু এই ঘটনার পর আশ্চর্য্য রকম গম্ভীর হইয়া পড়েন, ক্বচিৎ তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিত, তাহাও স্থায়ী হইত না—চপলার মত চকিতে অদৃশ্য হইয়া যাইত। যাহার কলহাস্যে বিশাল অট্টালিকা সদা সর্ব্বদা মুখরিত হইয়া উঠিত, এখন তাহার কথাটি পর্য্যন্ত কেহ শুনিতে পায় না। বাড়ীর পরিজনদের মধ্যে এই মেয়েটিই বরাবর সর্ব্বাধিক ভোজন-বিলাসিনী এবং নিত্য নূতন বেশভূষার অনুরাগিণী, কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি হইলেন যেন যৌবনে যোগিনী! ভোজনের বিলাস বা বেশভূষার আসক্তি কোনটিই তাঁহাকে আর আকৃষ্ট করিতে পারিল না। কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দীর্ঘসময় তিনি পূজায় লিপ্ত থাকেন, কিন্তু কোন্ দেবতার উদ্দেশে তাঁহার এই তপস্যা—মনের মণিকোঠায় অধিষ্ঠিত গোপন দেবতাটি ভিন্ন বাহিরের কেহই তাহার কোন নিদর্শন পায় না। পক্ষান্তরে সকল ব্যাপারেই নিষ্ঠাবতী বিধবার মত ভোগ-বিলাসে নিস্পৃহা এবং আমোদ প্রমোদে উদাসীন হইয়াও সাধ্বী সধবার পরিচিত আচারগুলি গ্রহণ করিতে সাবিত্রীকে অতি মাত্রায় সচেতন দেখা যাইত। ইদানীং নিরামিষ ভোজনে অভ্যস্ত থাকিলেও, প্রতি একাদশীর দিন বাড়ীর সধবাদের সহিত একত্র বসিয়া তিনি শ্রদ্ধার সহিত আমিষ ভোজন করিতেন; বিশেষত একাদশী তিথিতে পল্লীর সধবাদিগকে পর্য্যায় ক্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া সারি-ভোজনে যোগ দিতেও তাঁহাকে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল দেখা যাইত। মাসের মধ্যে এই দুইটি দিনের ভোজের

বৈচিত্র্য—বিশেষতঃ, বিবিধ পর্য্যায়ের আমিষ খাদ্য সম্ভারের প্রাচুর্য্য সাবিত্রীর অতীত ভোজন-বিলাসের পরিচয় দিত।

কন্যার বৈরাগ্য প্রথম প্রথম মাতাকে চিন্তিত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আপত্তি ও উপদেশ অজস্র ধারায় বহিত; কিন্তু সাবিত্রী এসম্বন্ধে প্রতিবাদ তুলিতেন না, বিতর্ক করিতেন না, সম্মতিও দিতেন না। মুখখানি নত করিয়া পাষাণ প্রতিমার মত তিনি বসিয়া থাকিতেন। একদিন এই অবস্থায় পিতামাতা বিস্ময়াতঙ্কে দেখিলেন, মৌনবতী কন্যা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, চক্ষুদুটি নিষ্পলক, নিশ্বাস পড়িতেছে না। তৎক্ষণাৎ হাহাকার পড়িয়া গেল, গৃহচিকিৎসক আসিলেন। সেবা-শুশ্রূষায় কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রীর সংজ্ঞা ফিরিল। বিজ্ঞ গৃহ-চিকিৎসক উপদেশ দিলেন—কোন বিষয়েই এঁকে ব্যস্ত বা বিব্রত করবেন না, নিজের ইচ্ছানুসারেই চলতে দেবেন, যে পথ ইনি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন—ফেরাতে চেষ্টা করবেন না, পারবেন না। বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার উপর যদি কোন অশান্তি আসে, তাহলে এর জীবন বিপন্ন হবে।'

সুতরাং সাবিত্রীর কৃচ্ছ্রসাধনায় পিতামাতা বা বাড়ীর পরিজনরা কোনরূপ হস্তক্ষেপ আর করেন নাই। তবে কৌতুকানন্দের এই বহু বাঞ্ছিত উৎসটি এইভাবে অকস্মাৎ স্তব্ধ হওয়ায় গাঙ্গুলী-বাড়ীর উৎসবানন্দ যে বহুলাংশে ক্ষুন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

দৌহিত্র সত্যব্রত ক্রমে ক্রমে মাতার স্থান অধিকার করিতেছিল। সাবিত্রীও নাকি শৈশবে এইরূপ জেদি, এইরূপ দুঃসাহসী এবং অসম্ভব রকমের দুরন্ত ছিল। মাতামহের শিক্ষায় ও কৌশলে শৈশব হইতেই

'বাবা' শব্দটির সহিত বালকের পরিচয় ঘটে নাই। তাহার প্রধান বুলিই হইয়াছে—বাবু। মাতামহকে সে 'দাদু'র পরিবর্ত্তে 'বাবু' বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্ত হয়। বালকের দুঃসাহস ও দৌরাত্ম্যে কেহ বাধা দিবার সাহস পায় না।

গাঙ্গুলী মহাশয় হইতেছেন পাকা বিষয়ী মানুষ। বিষয় রক্ষার জন্য ছল বল কৌশল এগুলি তিনি অস্ত্রের মত প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে তিনি এতবড় ওস্তাদ ছিলেন যে, হাইকোর্টের ঝুনো আইনজ্ঞগণ পর্য্যন্ত অবাক হইয়া তাঁহার তারিফ করিতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত রকমের 'এলেম'টি বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৌহিত্র সতুর অন্তরটির উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে এবং কৈশোরেই সে এই বিদ্যায় রীতিমত পরিপক্ক হইয়া পড়ে। শুধু ইহাই নয়, দৌরাত্ম্য, হঠকারিতা ও দুঃসাহসে বালক সত্যব্রত সর্ব্বত্র যেন অপরাজেয় হইয়া উঠে। বিধিনিষেধ বা শাসন তাহার গতি এবং প্রবৃত্তিকে ঠেকাইতে পারে না। পক্ষান্তরে পড়াশুনার ব্যাপারে তাহার মেধা এমনই অসাধরণ যে, পুস্তকের কীটের মত সর্ব্বক্ষণ পুস্তকের পাতার উপর চক্ষু ও মন নিবদ্ধ না রাখিয়াও সে সহপাঠীদের মধ্যে সর্ব্বাধিক মেধাবী ও প্রতিভাশালী ছাত্ররূপে শিক্ষক মহাশয়দের প্রশংসা অর্জ্জন করে। সহপাঠী বা সমবয়সীদের মধ্যে কেহ কোন বিষয়ে তাহাকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রবর্ত্তী হয় ইহা সত্যব্রত কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না, একটা অদম্য জেদ যেন তাহাকে অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য পিছন হইতে ধাক্কা দিতে থাকে। সত্য যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে, কুমারসিং নামে

এক পাঞ্জাবী ছাত্র তাহাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হয়। সহপাঠীদের মধ্যে সর্ব্বাধিক দীর্ঘাকৃতি সুশ্রী সুন্দর ও বলিষ্ঠ বলিয়া সত্যের খ্যাতি ছিল। নবাগত ছাত্র কুমার সিং এবিষয়ে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। কুমার সিংহের পিতা সামরিক বিভাগে কমাণ্ডিং অফিসারের পদে পাকা হইয়া এলাহাবাদে আসিয়াছেন। এত বড় পদস্থ লোকের পুত্রের প্রতি ক্লাসের ছেলেরা অতিমাত্রায় সম্ভ্রম প্রকাশ করিলেও সত্যব্রতকে এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ উদাসীন দেখা যাইত। কুমারসিংহের মুখে সর্ব্বদাই বড় বড় কথা; ছেলেরা অবাক হইয়া শুনিত, আর সত্যব্রত মুখ টিপিয়া হাসিত। ছেলেদের কেহ এ সম্বন্ধে সত্যর উপেক্ষার কারণ জানিতে চাহিলে সে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিত: ক্লাসে পড়ার কথাই ভাল, ওর ঘরের কথা জানবার যদি ইচ্ছা এতই বড় হয়ে থাকে বাড়ীতে গিয়েই শুনতে পার: বাপের চাকরীর পায়া নিয়ে ছেলের বড়াই করা আহাম্মুখী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যর কথা কুমারসিংহের কানে উঠিতে বিলম্ব হইল না, সে সরাসরি সত্যকে জিজ্ঞাসা করিল: তোমার বাবা কি করে?

প্রশ্নটা যেন চাবুকের মত সত্যর পীঠে পড়িল। কি উত্তর সে ইহার দিবে? বাবার সম্বন্ধে তাহার এইমাত্র অভিজ্ঞতা যে, তিনি ছিলেন এবং এখনও আছেন। তবে কোথায়, তাহা কেহ জানে না—সেও নয়। সুতরাং সে কি বলিবে! কিন্তু কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র সত্যব্রত নয়, ঝাঁ করিয়া উত্তর একটা সাজাইয়া বলিতে তাহার মুখে কোনদিন বাধিত না, এদিনও বাধিল না। মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করিয়া সত্য কুমারসিংহের কথার উত্তরে কহিল:—আমার বাবা মানুষ তৈরী করেন।

কুমারসিংহ কহিল: সে কাজ ত ভগবানের!

সত্য উত্তর দিল: কোন বড় কাজ কেউ কি একলা করতে পারে, তাহলে 'য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট' কথাটার সৃষ্টি হয়েছে কেন?

কুমারসিং জিজ্ঞাসা করিল: তোমার বাবা তাহলে ভগবানের য়্যাসিষ্ট্যণ্ট্ নাকি?

সত্য কহিল: নিশ্চয়ই, তোমার বাবাকে বরং জিজ্ঞাসা করে দেখো।

কুমারসিং দেখিল, কথার কৌশলে ছেলেটা তাহাকে হারাইয়া দিয়েছে, এখন শক্তির কৌশলটি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে মুখরক্ষা করিতে হইবে। তাই উদ্ধতভাবে সহসা সে কহিয়া উঠিল: বাঙ্গালী শুধু বোল-চালেই ওস্তাদ।

সত্য উত্তরে কহিল: বাঙ্গালী সব কাজেই ওস্তাদ, বললুম না— বাঙ্গালী মানুষ তৈরী করে।

টিফিনের ছুটির সময় এই বিতর্ক চলিতেছিল। এই সময় ঘণ্টা বাজিতেই খেলার মাঠ ছাড়িয়া ছেয়লরা ক্লাসে ছুটিল। বৈকালে ছুটির পূর্ব্বে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাত্রদিগকে ষান্মাষিক পরীক্ষার ফল জানাইয়া দিলেন। ক্লাসের ছেলেরা জানিল—সত্যব্রত প্রত্যেক 'সাবজেক্টে' সর্ব্বাধিক নম্বর পাইয়া 'রেকর্ড' ভাঙ্গিয়াছে, আর কুমারসিং ইংরাজীতে শতকরা কুড়ি এবং গণিতে একটি 'গোল্লা' পাইয়াছে।

ছুটির পর পথে কুমার সিং আহত ব্যাঘ্রের মত সত্যব্রতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কহিল: পাস করাটাই বড় কথা নয়, তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে গায়ের জোর,—সেটার বোঝাপড়া করতে চাই। তোমার বাবা মানুষ তৈরী করে, আর আমার বাবা মানুষ মারে। আমি আমার বাবার ছেলে—

বলিতে বলিতেই সে সত্যব্রতকে জাপ্টাইয়া ধরিল। দেহের শক্তি এবং মনের জোর কোনটিই সত্যর অভাব ছিলনা, কিন্তু কুস্তিতে অভ্যস্ত অথবা তাহার মারাত্মক প্যাঁচগুলি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় সে কাবু হইয়া পড়িল। বিজয়োল্লাসে সদর্পে কুমার সিং মৃতকল্প সত্যব্রতকে শুনাইয়া দিল: গায়ের জোরে যে বড়, সেই বেশী বাহাদুর, যেহেতু মানুষকে সে চিড়িয়ার মত টিপে মারতে পাবে।

সত্যব্রত বেচারী নতমুখে নীরবে প্রতিদ্বন্দ্বীর কথাগুলি শুনিল, কোন প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু পরাজয়ের এই অপমান পরীক্ষায় তা ার বিপুল সাফল্যের গৌরবকে যে ম্লান করিয়া দিয়াছে, সে নিজেও যেমন অনুভব করিল, তাহার মুখ চক্ষুর ভঙ্গি সহপাঠীদের মনেও ইহা বদ্ধমূল করিয়া দিল।

এই ঘটনার পর ীক্ষা-ব্যাপারে ক্লাসের অর্দ্ধ শতাধিক সহপাঠীর অধস্তন হইয়াও কুমারসিং তাহার দেহের দুর্ব্বার শক্তির প্রভাবে সর্ব্বাধিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল। সত্যব্রতর মত দুঃসাহসী ও প্রচণ্ড শক্তিশালী ছেলেকে শক্তির কৌশলে যে মৃতকল্প করিতে পারে, সে কি সাধারণ ছেলে! সত্যব্রত সেই যে মার খাইয়া বাড়ী যায়, আর স্কুলে মুখ দেখাইতে আসে নাই। ছেলেরা শুনিল, সে অসুস্থ হইয়া হাওয়া বদলাইতে মির্জাপুর গিয়াছে। প্রায় পাঁচ মাস পরে সহসা এক দিন তাহাকে ক্লাসে উপস্থিত দেখিয়া ছেলেদের মুখগুলি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কেবল কুমারসিং মুখ খানা বাঁকাইয়া ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটাইয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। ক্লাসের মধ্যে শুধু ইঙ্গিতাভিনয়ই চলিল। টিফিনের ছুটিতে

সেগুলি মুখরিত হইয়া উঠিল। কুমার সিং উপরপড়া হইয়া বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করিল: গায়ের ব্যথা সারতে পুরো পাঁচটা মাস কেটে গেল হে? এখন ত মানবে—বাঙ্গালী শুধু বোল চালেই ওস্তাদ?

সত্যব্রত সহজকণ্ঠে উত্তর দিল: বাঙ্গালী মুখের কথা পাল্টায় না, বাঙ্গালী সব বিষয়েই যে ওস্তাদ—এটা সকলেই জানে, তোমাকেও মানতে হবে।

ছেলেদের বুকগুলি ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল ভয়ে। কি সর্ব্বনাশ! এখনও সত্যর চৈতন্য হয় নাই, সেই পুরাতন জেদটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে,—কুমার সিংহের কাছে নাস্তানাবুদ হইয়াও?

সত্যর মুখের কথা কুমার সিংহের মুখখানা আরক্ত করিয়া দিল, হাত দুইখানি কচলাইয়া গর্ব্বিতভাবে সে কহিল: মানামানিটার বোঝাপড়াও তাহলে এখনি হয়ে যাক।

বলিতে বলিতেই সে সত্যর দিকে আগাইয়া গেল। সত্যর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে চাহিয়া এবং ডান হাত খানি তুলিয়া সে কহিল:—আজ থাক, কাল শনিবার, দেড়-টার পর ছুটি। খেলার মাঠে সবার সামনেই বোঝাপড়াটা হবে'খন।

কুমার সিংহের হিংস্র প্রবৃত্তি তখন সীমা ছাপাইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টার প্রতীক্ষাকে সে যেন স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। মুখখানা তাহার নেকড়ে বাঘের মুখের মত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সত্যর উপর পূর্ব্ববৎ সে ঝাপাইয়া পড়ে আর কি! কিন্তু এই সময় টিফিনের সময় উত্তীর্ণ হইবার দুইটার ঘণ্টাধ্বনি তাহাকে সহসা সংযত করিয়া দিল, ছেলেরা ক্ষিপ্রগতিতে ক্লাসে চলিয়া গেল। কুমার

সিংহের রাগ কিন্তু তখনও পড়ে নাই; ক্লাসে বসিয়াই ছেলেদিগকে পাকে প্রকারে শুনাইয়া দিল: কালকের কথা কাল আছে। আজ ত আগে হাতের সুখ মেটাবো, ছুটির পর পথেই দেখে নেব। কিন্তু সত্য তাহাকে সে সুযোগ দিল না, ছুটির পর ছেলেদের ভীড়ে সে যে কোথায় মিশিয়া গেল, কুমারসিংহ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার সন্ধান পাইল না। অগত্যা সঙ্গীদিগকে শুনাইয়া কহিল: আচ্ছা, কালই হবে, দেখবে কি হাল ওর করি!

পরদিন ছুটির পর বিদ্যালয়ের সমস্ত ছেলে খেলার মাঠে সমবেত হইল। কথাটা ইতিমধ্যেই ছেলেদের ভিতর এই ভাবে রাষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাঙ্গালী ছেলে সত্যব্রত পাঞ্জাবী ছেলে কুমারসিংহের সহিত কুস্তি লড়িবে। ছয় মাস পূর্ব্বে কুমারসিংহের হাতে সত্যব্রতর শোচনীয় পরাজয়ের দৃশ্যটা সকল ছেলে না দেখিলেও শুনিয়াছিল। আজ তাহাদের শক্তি পরীক্ষা দেখিবার জন্য ছেলেদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। প্রথম শ্রেণীর কতিপয় বলিষ্ঠ ছাত্র মধ্যস্থ রূপে প্রতিযোগী ছাত্রদ্বয়ের কুস্তি পরিচালনার ভার লইলে সংঘর্ষ শুরু হইল। কুস্তির প্যাচে অনভিজ্ঞ প্রতিযোগীকে পূর্ব্ববৎ সহজে হারাইয়া দিবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কুমারসিং উত্তেজিত ভাবে সত্যব্রতকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অপূর্ব্ব কৌশলে সত্যব্রত তাহার আক্রমণ হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া কুমারসিংকে চমকিত করিয়া দিল। সে বুঝিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী এক্ষণে আর আনাড়ি নয়, কুস্তির কৌশল শিখিয়া তবে তাহাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়াছে। কুমারসিংহের যতগুলি প্যাচ জানা ছিল, সবগুলি প্রয়োগ করিয়াও সে সত্যব্রতকে কাবু করিতে

পারিল না। অতঃপর সত্যব্রত পর পর কতিপয় নূতন প্যাঁচের সাহায্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহত ও বিব্রত করিয়া পরবর্ত্তী একটি প্যাঁচের কৌশলে এমন জোরে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল যে, চীৎ ত সে হইলই, উপরন্তু উঠিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল। ছেলে মহলে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল সত্যব্রতর নামে। কিন্তু বিজয়ী তখন অপ্রমত্তভাবে বিজিত প্রতিযোগীর পুনরুত্থানের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। প্রায় বিশ মিনিট পরে কুমারসিং মধ্যস্থগণের শুশ্রূষায় উঠিয়া বসিলে, সত্যব্রত তাহার দিকে চাহিয়া অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল :—আর একদান হবে বন্ধু ?

আহত কণ্ঠে কুমারসিং কহিল :—বুঝেছি, পাঁচটা মাস তুমি এই কসরৎই করেছ। কিন্তু এর শোধ আমিও একদিন নেব।

সত্য কহিল :—সে পরে হবে। আজকের কথা আজ হোক। উঠে লড়বার শক্তি আছে ?

কুমারসিং কহিল :—আজ আমি লড়ব না।

সত্য এবার জোর গলায় কহিল :—তাহলে তোমার মনের পাতায় এখন লিখে রাখো—বাঙ্গালী শুধু বোলচালেই ওস্তাদ নয়, ইচ্ছা করলে সব বিষয়েই সে ওস্তাদ হতে পারে। আর একটা কথা, কাল আমি লড়তে রাজী নয় জেনেও তুমি লড়বার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলে। এখন থেকে বলা রইল—যখন ইচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে লড়তে পারো, আমি সব সময় লড়বার জন্যে তৈরী থাকবো।

কুমার সিং কোন উত্তর না দিয়া খেলার মাঠ হইতে চলিয়া গেল। ছেলেরা তাহাকে শুনাইয়া চীৎকার তুলিল :—সত্যব্রতকি জয় !

সত্যব্রতর দুর্ব্বার জেদের এই একটিমাত্র কাহিনীই উল্লেখ করা হইল, এমন কত কাহিনীই তাহার পাঠ্যজীবনকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

* *
*

সত্যব্রতর দাদামহাশয় যে ভাবে দৌহিত্রকে গড়িয়া তুলিবেন ভাবিয়াছিলেন, সত্যব্রতর স্বাধীন ও সবল চিত্ত কিন্তু তাহাতে ধরা দেয় নাই। নিজের প্রবৃত্তির তালে তালে পদক্ষেপ করিয়া সে দাদামহাশয়কে অতিষ্ঠ ও বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। একদা বৃদ্ধ শুনিলেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যর সৌরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তীর পরিবারবর্গের সহিত সত্যব্রতর রীতিমত ঘনিষ্ঠতা চলিয়াছে এবং এই সূত্রে জজসাহেবের এক দৌহিত্রীর নামের সহিত সত্যব্রতর নাম জড়িত হইয়া একশ্রেণীর লোকের আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছে। সত্যব্রত তখন বি, এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ইতিমধ্যেই এলাহাবাদ শহরের ভিতর সত্যব্রতর নাম সর্ব্বজনবিদিত হইয়া উঠিয়াছে। গায়ের জোরে, পড়াশুনায়, খেলা-ধূলায়, আন্দোলন-আলোচনায়, স্বদেশিকতায় সকল ব্যাপারেই সত্যব্রত অগ্রণী। সে যাহা নিজে ভাল মনে করিয়া থাকে, সর্ব্বান্তঃকরণেই তাহাতে আত্মনিয়োগ করিয়া তৃপ্তি পায়, অভিভাবকদের বিধিনিষেধ কিছুতেই তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে না। সত্যব্রত এক্ষেত্রে দৃঢ়তার সহিত বলে—আমি প্রচলিত বিধিব্যবস্থার বাইরে, যে পথ ধরিয়া সকলে গন্তব্যস্থানে উপনীত হয়, আমি সেইস্থানে পৌঁছাইবার

অন্য স্বতন্ত্র রাস্তা বাহির করিতে চাই—তাহা যতই দুর্গম বা নিষিদ্ধ হোক না কেন!

মাতামহ গাঙ্গুলী মহাশয়কে সত্যব্রত কখন ভয় করিতে অভ্যস্ত হয় নাই, ভয় যে কাহাকে করিতে হয় কিংবা ভয় বস্তুটির স্বরূপ কি—সব্যব্রত সে সম্বন্ধে বরাবর অন্ধকারেই রহিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় গাঙ্গুলী মহাশয় যখন হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া এবং দুই চক্ষ পাকাইয়া তাহাকে তর্জ্জনের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন: কার হুকুমে তুমি সৌরীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে যাও আর তার নাতনীর সঙ্গে মেলামেশা কর?

সত্যব্রত তখন তাহার বড় বড় দুইটি চক্ষুকে আরও বড় করিয়া শুধু দাদুর ক্রোধারক্ত মুখখানার উপর চাহিয়া রহিল। দাদামহাশয়ের দুই চক্ষুর এরূপ বীভৎস ভ্রূকুটি এবং মুখের স্বরে এরূপ তীব্র বিরক্তি সে বুঝি ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করে নাই। ব্যাপারটার গুরুত্ব বাড়ানো অনুচিত মনে করিয়া সত্যব্রত হাসিয়া ফেলিল।

গাঙ্গুলী মহাশয় এবার জ্বলিয়া উঠিলেন। কণ্ঠস্বর যতদূর সাধ্য ঊর্দ্ধে তুলিয়া কহিলেন: ইতরামীর একটা সীমা আছে রাস্কেল, কি ভেবেছ তুমি শুনি? আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মানে?

সত্যব্রত চটিল না, দিব্য হাসিমুখেই উত্তর দিল: আপনার কথাটার কোন মানেই নেই যে তাই ফিক করে হেসেছিলুম—শুনলেন?

উত্তেজিত কণ্ঠে গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন: কি, আমার কথা বাজে?

দৃঢ়স্বরে সত্যব্রত কহিল: কাজের কথা হলে প্রশ্নটা হেসে উড়িয়ে দিতুম না এটা আপনার বোঝা উচিত ছিল। আপনার হুকুম নিয়ে

এপর্য্যন্ত কোন কাজ করেছি বলে ত মনে পড়ে না। তাহলে আপনিই বলুন, সৌরীন বাবুদের বাড়ীতে যদি আমি যাই আর তাঁর নাতনীর সঙ্গে মিশি, তার সঙ্গে আপনার আর আপনার হুকুমের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? আপনি ত সোজাসুজি ভাবেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, যদিও এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না।

সত্যব্রতর সুস্পষ্ট কথাগুলি গাঙ্গুলী মহাশয়ের ক্রোধ আরও বাড়াইয়া দিল কিংবা তাহাকে রীতিমত আহত করিল, তাহা ঠিক বুঝা গেল না; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু ও বিদ্রূপরঞ্জিত হইয়া বাহির হইলঃ সৌরীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে এঁটো পাতা চাটতে যাওয়াটা তাহলে তোমার পক্ষে খুব বাহাদুরীর কথা—ভালো, ভালো, তার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ সব জেনেও—

দাদামহাশয়কে কথাটা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই সত্যব্রত কহিলঃ মাপ করবেন, আপনার ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতাকে আমি কোনদিন স্বীকার করিনি, এখনও করব না। দলাদলির ব্যাপারে সৌরীন বাবুর সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য আছে বলেই যে আমাকেও চাটুকারদের মত কুৎসা গাইতে হবে, আর তাঁর বাড়ীতে ঢোকা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ জেনে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে, তার কি মানে আছে? আপনার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য আছে বলে আমাকেও যে তাতে সায় দিতে হবে—আপনি কি তাই ভেবে রেখেছেন?

গাঙ্গুলী মহাশয় এবার বজ্রকণ্ঠে কহিলেনঃ সবুর, আর কোন কথা তোমার সঙ্গে আমার নেই; হুইলের সুতো আমি ছেড়ে দিয়ে

হিংসা ও অহিংসা

দেখছিলাম মাছটার দৌড় কতখানি, সুতো এখন গুড়িয়ে নিচ্ছি আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হচ্ছে হুকুমদারী। আমার পয়ল. হুকুম হচ্ছে সৌরীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর ত্রিসীমানায় তুমি যাবে না।

হুকুমটি এক নিশ্বাসে শুনাইয়া দিয়াই গাঙ্গুলী মহাশয় উঠিয়া গেলেন, এ সম্বন্ধে দৌহিত্রের উত্তর শুনিবার কোন আগ্রহই তাঁর দেখা গেল না।

সপরিবার সৌরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সত্যব্রতকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে সত্যব্রতর দ্বার আবরিত ছিল। পারিবারিক মনোমালিন্য সত্ত্বেও চরিত্রগত একটা বিশিষ্টতা চক্রবর্ত্তী পরিবারকে এই দুঃসাহসী ছেলেটির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজেও উদার মতাবলম্বী—কোনরূপ সঙ্কীর্ণতাকে তিনিও প্রশ্রয় দিতে অভ্যস্ত নহেন। এ হেন সম্ভ্রান্ত এবং উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সদাশয় ব্যক্তির সহিত রাজীবলোচন গাঙ্গুলীর মনোমালিন্যের উপলক্ষ হইতেছে একটি নারী—যাহার কন্যার সহিত সত্যব্রতর ঘনিষ্ঠতার আভাস প্রকাশ পাইয়াছে গাঙ্গুলী মহাশয়ের অনুযোগপূর্ণ উক্তির মধ্যে। ব্যাপারটির মূলতত্ত্ব এইরূপ:

গাঙ্গুলীমহাশয়ের কোন আত্মীয়ের সহিত সৌরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের কথা পাকা হইয়া যায়। কিন্তু বিবাহের দিনে শহরবাসী সবিস্ময়ে শুনিলেন—সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তবে কন্যার বিবাহ বন্ধ হইবে না, কন্যাপক্ষ অন্য পাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন।

ব্যাপারে কন্যাপক্ষ হইতে রাষ্ট হয় যে, পাত্রের কতিপয় গুরুতর

দোষের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহারা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাত্রপক্ষও সঙ্গে সঙ্গে কন্যার বিরুদ্ধে কদর্য্য অপবাদ রটাইয়া পাল্টা জবাব দিলেন। শুধু ইহাতেই পাত্রপক্ষের গাত্রদাহের অবসান হইল না, অপবাদটিকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে নানাবিধ চক্রান্তও চলিতে লাগিল। প্রত্যাখ্যাত পাত্র অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং প্রভাবশালী, উপরন্তু রাজীবলোচন গাঙ্গুলীর মত ধনাঢ্য জমিদার তাহার পৃষ্ঠপোষক। পদমর্য্যাদা ও বিদ্যার প্রভাবে কন্যাপক্ষ শক্তিশালী জমিদারবংশের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া বাহোবা লইবে, ইহা কি কখন সহ্য করা যাইতে পারে! লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরপরাধিনী কন্যার বিরুদ্ধে চতুরঙ্গবাহিনী সজ্জিত হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল।

সৌরীন্দ্রমোহন বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। উপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্য কন্যার বয়স কৈশোরের সীমা অতিক্রম করে। কন্যাই তাঁহাকে মনোনীত পাত্রের চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিবার অনুরোধ জানান। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়—কন্যার অভিযোগ সত্য, প্রচুর আর্থিক প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি সত্ত্বেও পাত্র দুশ্চরিত্র ও উন্মার্গগামী। অতঃপর তিনি যে পাত্রকে মনোনীত করিলেন, তিনি সহায়সম্পদহীন হইলেও প্রতিভাবান শিক্ষাব্রতী, বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ্চ স্কলার, তাঁহার আলয়েও শিক্ষাদান ব্যাপারে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। ভবিতব্যের বিধানে গৃহশিক্ষকের আসন হইতে তাঁহাকেই সদ্য সদ্য বরের আসনে আনিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। দরিদ্র পাত্রের রূপ ও বিদ্যা অনেকের প্রশংসা আকর্ষণ করিলেও অবস্থাগত পার্থক্য আবার কাহারো কাহারো মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করিল। কিন্তু সৌরীন্দ্র

মোহন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিধাতার নির্দ্দেশের মতই সঙ্গতি-হীন বিদ্বান পাত্রকে স্বীকার করিয়া লইলেন—কন্যাকেও এই ব্যাপারে বিশেষ উৎফুল্ল দেখা গেল

বিবাহের পর দুই বৎসর পাত্রকে তাঁহার রিসার্চ্চের জন্য এলাহাবাদে থাকিতে হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষের অনাচার এরূপ কদর্য্য হইয়া উঠে যে, সৌরীন্দ্রমোহনের মত পদস্থ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিও ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কন্যার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া বহু নামহীন পত্র, কবিতা, ছড়া, পুস্তিকা প্রভৃতি শহরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে, বিরুদ্ধ পক্ষের এরূপ হৃদয়হীন আচরণ বিশিষ্ট শ্রেণীর বিরক্তিকর হইলেও একশ্রেণীর কুৎসা-লিপ্সুর কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া তোলে। এমন কি, স্বামীর নিকটেও পত্নীর কুমারী-জীবনের কদাচারমূলক বহু অমূলক প্রসঙ্গ নানা ভাবে আসিয়া তাঁহাকে অতিষ্ঠ ও বিব্রত করিয়া দেয়। এই অপ্রীতিকর অবস্থা সাংঘাতিক ও মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে উক্ত বিব্রত দম্পতির নবজাতকন্যা রেবার অন্নপ্রাসনের উৎসব রজনীতে। সৌরীন্দ্র মোহন দৌহিত্রীর অন্নপ্রাসন উপলক্ষে প্রচুর ঘটা করিয়াছিলেন। শহরের বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত এবং ভদ্র ব্যক্তিবর্গ সপরিবার আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রাজীবলোচন গাঙ্গুলীও এদিন সৌরীন্দ্রমোহনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। তাঁহার উপস্থিতি উৎসবের শোভা, সমৃদ্ধি ও আনন্দ বৃদ্ধি করে। সৌরীন্দ্রমোহন উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে বলেন: আমাদের সমাজের মাথার মণি গাঙ্গুলী মহাশয়ের শুভাগমনে আমার আয়োজন আজ সার্থক হয়েছে।

রাজীবলোচন মৃদু হাসিয়া পাল্টা জবাব দেন: ‘একথা জজসাহেবের

মুখে সাজে না, সমাজের মাথা এখন উনিই—আমরা ত চাষার সামিল, জমি আঁকড়ে পড়ে থাকি। দয়া করে ডেকেছেন, এইটিই আমাদের ভাগ্য আর ওঁর সৌজন্য।'

রাজীবলোচনের কথাগুলি যে সরল নয়, রীতিমত ঝাঁঝ আছে—অনেকেই সেটা উপলব্ধি করেন।

সৌরীন্দ্রমোহনও ব্যথিত হইয়া জানান : কর্ম্মক্ষেত্রে কার কি প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে তার ত কোন সম্বন্ধ নেই গাঙ্গুলীমশাই, এখানে বরং আচার-নিষ্ঠা এবং মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাই বড়। আমার পদের জন্য নিজেকে আমি কোনদিনই বড় ভাবিনি, বরং সমাজের দিক দিয়ে বরাবরই আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করি।'

গাম্ভীরমুখে রাজীবলোচন বলেন : আপনি মহানুভব!

উৎসব উপলক্ষে গান বাজনারও আয়োজন থাকে। শহরের কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আহূত হইয়াছিলেন। গান যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় ভিতরে নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ সকলকে চমকিত করিয়া দিল। পরক্ষণে প্রকাশ পাইল যে, মেয়ে সাজিয়া একটা গুণ্ডা ভিতরে ঢুকিয়াছিল, কিন্তু ধরা পড়িয়া গিয়াছে। লোকটাকে বাহিরের উৎসব স্থলে সর্ব্বসমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করা হইলে দেখা গেল - পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক অ-বাঙ্গালী প্রিয়দর্শন যুবা খাঁকি রঙের হাফ-প্যাণ্ট ও গেঞ্জির উপর একখানি জঙ্গলা বেনারসী সাড়ী ও ব্লাউস পরিয়া এবং পরচুলের খোঁপা আঁটিয়া নারী সাজিয়াছে। কাপড়খানি এতই জমকালো যে, সমবেত প্রত্যেক মহিলার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সে নিজেকে অ্যাড্‌ভোকেট দুনিরাম আগরওয়ালার কন্যা বলিয়া পরিচয়

দেয়। কিন্তু তুনিরাম আগরওয়ালার এক আত্মীয়ার কানে কথাটা উঠিতেই তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে চান। সেই সময় ছদ্মবেশী গৃহস্বামীর কন্যা—রেবার জননীর সহিত নিভৃতে আলাপ করিতেছিল। তাহার সংলাপ ও ভাব-ভঙ্গি রেবার মাতার মনে সন্দেহ উপস্থিত করে। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মহিলার উপস্থিতেতে এবং তাহার প্রশ্নে ছদ্মবেশী বুঝিতে পারে—যে-পরিচয়ের সুযোগ লইয়া সে এ-বাড়ীতে আসিয়াছে তাহা ফাঁস হইয়া গিয়াছে। তখন সে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করে, এবং এই সময় তাহার মাথা হইতে পরচুলের খোঁপাটি খুলিয়া পড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা চীৎকার করিয়া উঠেন। ছদ্মবেশীও ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু গৃহস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে সে এভাবে আসিবার যে কারণ নির্দ্দেশ করিল তাহাতে উৎসবস্থলে একটা দূষিত বাতাস ঝঞ্ঝার বেগে বহিয়া সমস্ত আনন্দ যেন এক মুহূর্ত্তে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। পাপীষ্ঠ অসঙ্কোচে ও নির্ভীককণ্ঠে জানাইল—জজসাহেবের এই কন্যাটির সহিত অনেকদিন হইতেই তাহার সদ্ভাব। মেয়ে সাজিয়া বহুবার সে এ-বাড়ীতে আসিয়াছে, অন্যান্য স্থানেও এইভাবে দেখা-সাক্ষাৎ তাহাদের হইয়াছে। কোনদিন কেহ তাহাকে সন্দেহ করে নাই। একটু ভুলেই আজ সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

সৌরীন্দ্রমোহনের ন্যায় মাননীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শুদ্ধান্তের উপর এরূপ কটাক্ষ যে অত্যন্ত অশোভন এবং ইহা যে ছদ্মবেশী যুবার মিথ্যাচার, আমন্ত্রিতগণের অধিকাংশই এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও ব্যাপারটি অত্যন্ত মর্ম্মন্তিক হইয়াই এই পরিবারটির শান্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত

দিল। উৎসবস্থলে সৌরীন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধ পক্ষেরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চাপাকণ্ঠের গুঞ্জন উঠিয়া একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল। ধৃত ছদ্মবেশীকে পুলিস-পাহারায় হজতে পাঠানো হইলে, রাজীবলোচনই বিদ্রূপের সুরে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: এ অবস্থায় বরাবরই দেখে আসছি শ্যালের পিছনেই তাড়াহুড়ো পড়ে, কিন্তু ঘরের হাঁড়ি ঠিক থাকে। আগে থাকতে হাঁড়ি সামলালে—এমনটি ঘটতো না।

গৃহস্বামীর স্বজাতি, স্বধর্ম্মী ও স্ববর্ণ বিচক্ষণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের মুখে এরূপ মন্তব্য শুনিয়া অনেকেই ক্ষুব্ধ হইলেন, আবার কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিলেনও। এখানেই ব্যাপারটির নিস্পত্তি হইল না গাঙ্গুলীমহাশয় এবং তাঁহার পক্ষভুক্তগণ জলস্পর্শ ত করিলেনই না, উপরোক্ত এ সম্পর্কে গৃহস্বামীর কাতর অনুরোধের উত্তরে কতিপয় শ্লেষাত্মক স্বরের যে খোঁচা দিয়া গেলেন, তাহা সর্ব্বাধিক মর্ম্মান্তিক।

ব্যাপারটি সব দিক দিয়াই বেদনাদয়ক হইয়া উঠিল। সৌরীন্দ্রমোহন বুঝিলেন, শিক্ষা বিদ্যা ও সংস্কৃতির পথে বাঙ্গালী জাতি যতই অগ্রবর্ত্তী হউক না কেন, মেয়েদের ব্যাপারে তাঁহারা এখনও অনেক পিছাইয়া আছেন। এদেব সুনামের আবরণটি এতই ঠুনকো যে, সাহস করিয়া যে কেহই তাহার উপর মুখের কথার একটি আঘাত দিলেই আর রক্ষা নাই! তখন তিনি যত বড় বিশিষ্ট ঘরের কন্যা বা বধূ হউন না কেন, হিংস্র দুর্ব্বৃত্ত নরাধম আততায়ীর কথিত অপবাদের যূপকাষ্ঠে তাঁহাকে মাথা গলাইতেই হইবে। নীতিবাগীশরাও তখন মন্তব্য করিয়া বসিবেন—যা রটে তা বটে! এদিকে যে-শিশুটিকে উপলক্ষ করিয়া এত বড়

উৎসবের সৃষ্টি হইয়াছিল, গ্রীষ্মের আঁধির প্রচণ্ড আবর্ত্তে তাহা ত ভাঙ্গিয়া গেলই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা মাতার অদৃষ্টও বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। সেই রাত্রিতেই পিতা নিরুদ্দিষ্ট হইলেন, মাতা আত্মহত্যা করিলেন! এ'দিকে ধৃত ছদ্মবেশী আদালতে স্বীকার করিল যে, মেয়েটির সহিত কস্মিনকালেও তাহার আলাপ ছিল না, টাকার লোভে সে এই অপকর্ম্ম করিয়াছিল। এক বাঙ্গালী বাবু তাহাকে মেয়ে সাজাইয়া এইভাবে কথাগুলি বলিবার তালিম দিয়াছিল। বাবুটির নাম তাহার মনে নাই, ঠিকানাও জানে না। বিচারে অবশ্য অপরাধীর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কর্তৃপক্ষ মূল অপরাধীকে ধরিতে পারেন নাই।

রেবার পিতারও আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সৌরীন্দ্রমোহন রেবাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। লোকের মুখের কথার আঘাত যাহাতে সে নিরুদ্বেগেই সহ্য করিবার মত শক্তি পায়, চলার পথে নির্ভীক ভাবে স্বচ্ছন্দে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে—হঠাৎ যাহাতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি দৌহিত্রীকে শিক্ষা দেন, সকল বিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া তুলেন। মায়ের শোচনীয় মৃত্যুর কথা তুলিয়া তিনি রেবাকে প্রায়ই বলেন, গায়ে গণ্ডারের চামড়ার বর্ম্ম এঁটে তোমাকে এর প্রতিশোধ নিতে হবে; জগতের লোক যেন জানতে পারে তোমার কাজে দিদি—বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে তুমি হচ্ছ জ্বলন্ত আগুনের একটা দীপ্তি।

দাদুর উক্তি রেবা যে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার

হিংসা ও অহিংসা

শিক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তির দ্বারায় নানা সূত্রেই তাহা সে প্রকাশ করিয়া আসিতেছে।

কলেজের ছেলেরা রেবার অনবদ্য রূপের চারিপাশে মক্ষিকার মত ঘুরিয়া বেড়াইত, রেবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের ভাব ভঙ্গি ও আচরণগুলি লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিত। কোন ছেলের সহিত না মিশিলেও তাহাকে লইয়া ক্লাসের ছেলেদের ভিতর যে একটা রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, ইহাতে সেও বিশেষ কৌতুক অনুভব করিত। পূর্ব্বোক্ত পাঞ্জাবী ছাত্র কুমার সিং প্রবেশিকা পরীক্ষায় বার দুই অকৃতকার্য্য হওয়ায় পিছাইয়া পড়ে এবং ঘটনাচক্রে তাহাকে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে রেবারই সহপাঠী হইতে হয়। সত্যব্রত তখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র। পড়াশুনায়, খেলাধূলায় সকল বিষয়েই সে ছাত্র-মহলের আদর্শ। স্কুলের সেই ব্যাপারের পর হইতে কুমার সিং বরাবরই সত্যকে এড়াইয়া আসিয়াছে। সহসা কোনদিন মুখোমুখি হইলেও সে মুখ ফিরাইয়া লয়। সত্যব্রত যে ব্যাপারে লিপ্ত থাকে, কুমারসিংকে তাহার ত্রিসীমানায়ও দেখা যায় না। উচ্চ শিক্ষার পথেও এখন দীর্ঘ ব্যবধান পড়িয়াছে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে সে-ই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ। সুতরাং শারীরিক শক্তির ঔদ্ধত্যে সে উক্ত শ্রেণীর ছাত্রদিগকে সর্ব্বদাই দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। রেবা এই সময় বালিকা বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া এই কলেজে যোগদান করে। রেবার রূপের আলোকে কলেজের এই শ্রেণীটি যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যদিও আরও কতিপয় বিশিষ্ট বংশ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বালিকা এই

শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিল এবং কুমার সিংহের ক্ষুধিত দৃষ্টি তাহাদের উপর নিবদ্ধ থাকিত, কিন্তু রেবাকে দেখিয়া অবধি সে যেন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। ক্লাসে বা ক্লাসের বাহিরে কোন সূত্রে সামান্য একটু সুযোগ পাইলেই সে শক্তির কসরৎ দেখাইয়া অথবা সহপাঠিগণকে বলপ্রকাশে নানাভাবে বিব্রত করিয়া তরুণী সহপাঠিনীদের বিশেষতঃ রেবাদেবীর প্রশংসা আকর্ষণে তৎপর হইত। অন্যান্য মেয়েরা মুখ টিপিয়া হাসিত, তাহাদের চোখেমুখে কৌতুকের ভঙ্গি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত, কিন্তু রেবাকে রীতিমত গম্ভীরই দেখা যাইত। ক্লাসের ভিতরে অধ্যাপকের অনুপস্থিতে এরূপ ব্যাপার ঘটিলে সে ক্লাস ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইত, আর বাহিরে এরূপ হুল্লোড় দেখিলে সে ছুটিয়া ক্লাসে আসিয়া আশ্রয় লইত। সকলেই লক্ষ্য করিত, রেবার অভাবে কুমার সিংহের উৎসাহ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—সহপাঠীদিগকে অব্যাহতি দিয়া সে রেবার অনুসন্ধানে ছুটিয়াছে।

নিজে নীরব এবং নির্লিপ্ত থাকিলেও তাহার প্রতি এই দুর্দ্ধর্ষ সহপাঠীর অর্থপূর্ণ অনুরাগকে উপলক্ষ করিয়া ক্লাসের মধ্যে যে একটা হাসাহাসি ব্যাপার চলিয়াছে, রেবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়ে তাহা সহজেই উপলব্ধি করে। পুরুষজাতির প্রতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ বিতৃষ্ণা এই ব্যাপারে ক্রমশঃ প্রতিহিংসায় পরিণত হয়; তাহার আত্মশক্তি ও দুঃসাহস তাহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে।

কুমার সিং হঠাৎ লক্ষ্য করে, তাহার সাধনা নিষ্ফল হয় নাই, দেবী প্রসন্ন হইয়াছেন। এখন আর তাহাকে দেখিলে রেবার সুন্দর মুখখানা অন্ধকার হইয়া যায় না—বরং তাহাতে হাসির আভা পড়ে, তাহার

শক্তির কসরৎ সে সকৌতুকে উপভোগ করে। হঠাৎ চোখোচোখী হইলে মুখখানি সলজ্জ হাসিতে ভরিয়া যায়, আর দুই চোখের কোণ হইতে তীরের মত একযোড়া ফলা ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকখানা যেন বিদ্ধ করিয়া দেয়।

কুমার সিংহের সাহস ক্রমশ বাড়িতে থাকে, বড় ঘরোয়ানার এই বাঙ্গালী মেয়েটির সহিত ভাল করিয়া মিশিতে ও ভাব জমাইতে সে আকুল হইয়া উঠে। অবাস্থাটি উপলব্ধি করিয়া সহপাঠিনী যমুনা খান্না, গঙ্গাবাঈ দেউস্কর, অম্বা নাইডু, মতিয়া নেহেরু, জাহানারা খাতুন, অমৃতকুমারী কাপুর প্রভৃতি বিভিন্ন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মেয়েরা রেবাকে একান্তে ডাকিয়া বলিল: সিং বেচারা তোর জন্যে শিং নেড়ে-নেড়ে কাহিল হয়ে পড়ল যে রেবা, তুই ভাই এবার মেহেরবানি একটু কর্, নৈলে শেষ পর্য্যন্ত কি খুনের দায়ে পড়বি?

রেবা উত্তর করিল: সিংয়ের জন্যে তোদের প্রাণে যদি এতই দরদ, নিজেরাই ত এগিয়ে যেতে পারিস, আমাকে টেনে মরছিস্ কেন?

মতিয়া হাসিয়া বলিল: আমরা যে ওর 'আউট অফ সাইট' কাজেই 'আউট অফ মাইণ্ড' হয়েই আছি! সিংয়ের লম্ফ-ঝম্প যত কিছু শুধু তোরই জন্যে।

অমৃত কাপুর তাহার স্থূল বপুটি নাচাইয়া শ্লেষের স্বরে বলিল: তোদের দেশের কবিই ত গান বেঁধেছে ভাই—'বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায়!' আমাকে চাইলে আমি ত ভাই হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেতুম।

রেবা বলিল: তোর যখন স্বদেশবাসী, দুইজনেই তোরা পাঞ্জাবী—

চেহারার দিক দিয়েও মানানসই, তখন আফশোষ কিসের? বলিস্ ত আমি কথা পাড়ি, ঘটকালী করি!

অমৃত মুখখানা মলিন করিয়া বলিল: বৃথা খেটে মরবি, ফল হবে না। আমার বাবা বিয়ের ব্যাপারে ভারি গোঁড়া, পাঞ্জাবী হলেও জাতে আমরা উঁচু,—ওদের সঙ্গে চলন নেই।

রেবার মুখে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: আর বাঙ্গালী বলে আমাদের ভিতরে বুঝি কোন বাধা নেই, যে চাইবে—তাকেই বিয়ে করতে হবে?

মাদ্রাজী মেয়ে অম্বা মুখখানা শক্ত করিয়া উত্তর দিল: নিশ্চয়। আমারই ছোট চাচা হায়দ্রাবাদের এক বাঙ্গালী বাবুর মেয়ের রূপ আর বিদ্যায় মুগ্ধ হয়ে যেই বিয়ে করতে চাইলেন, অমনি তাকে পেয়ে গেলেন। আমার চাচা আর তোদের ঘরের মেয়ে সরোজিনীর ছবি টাইমস অফ ইণ্ডিয়ায় ছাপা হয়েছে দেখিসনি? সরোজিনী চ্যাটার্জ্জী এখন মিসেস সরোজিনী নাইডু!

অমৃতকুমারীও সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল: আমারও নজীর আছে। কলকাতা শহরের নামজাদা টেগোর ফ্যামিলীর মেয়ে সরলাদেবী বাঙ্গলা দেশে মনেরমতন বর না পেয়ে আমারই জাতভাই রামভজের গলায় মালা দিয়েছেন—এ খবরও ত কাগজে বেরিয়েছে, তবে? কুমারসিং এসব খবর জানে না বুঝি ভেবেছিস? যদি সে বুঝত সত্যিই তুই দুর্ল্লভ, তাহলে অত চুলবুল করত না।

ক্রোধে ক্ষোভে রেবার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে উত্তর দিল: যে-জাতের ভিতরে চার পাঁচ কোটি মেয়ে

কিলবিল করছে, এই দুটো মেয়েই কি তাদের আদর্শ? যে জাতির মেয়ে সরোজিনী সরলা, সেই জাতির অগ্নিশিখা আমি রেবা; ওভাবে প্রবৃত্তির মোহে যাঁরা পথ হারিয়েছেন তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে ভুল দেখাতে আর বাঙ্গালী মেয়েদের আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখতেই যে আমাকে অবতর্ণ হতে হয়েছে! আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়ার আবরণ, হাতে শিক্ষা দেবার চাবুক।

পরিহাসের ব্যাপারে ঘটনাটা যে বিপরীত রাস্তা ধরিয়াছে, রেবার উত্তেজিত মূর্ত্তি সে সম্বন্ধে সপাঠিনীদিগকে সচকিত করিয়া দিল, তাহারা তখন সভয়ে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ক্লাসের দিকে ছুটিল।

রেবার কথাটা কিন্তু অমৃতকুমারীর গায়ে কাঁটার মত বিঁধিয়া গেল। অমৃতকুমারী এবং কুমারসিংহ উভয়েরই মাতৃভূমি পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর নগরী। ঠিক স্বজাতি না হইলেও উভয় পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতি ও বাধ্য-বাধকতা প্রচুর। এলাহাবাদেও ইহারা একই মহল্লায় পাশাপাশি দুইটি অট্টালিকায় বসবাস করে। অমৃতকুমারীর পিতা সিভিল সার্জ্জনের পদে পাকা হইয়া বসিয়াছে। কথায় কথায় অমৃতকুমারী কুমারসিংকে রেবার স্পর্দ্ধার কথাটা শুনাইয়া মন্তব্য করিল: বাঙ্গালীর মেয়ের মুখে এতবড় তেজের কথা শুনলে গা জ্বালা করে না? এর তেজ যদি তুমি ভাঙতে পার কুমারসিং, তাহলে বুঝবো— সত্যিই তুমি বাহাদুর ছেলে, একদিন তোমার বাবার মতন জাঁদরেল হবে।

কুমারসিং বুকখানা ফুলাইয়া আর মুখখানা লাল করিয়া উত্তর দিল: যে ঘোড়া শুরুতে যত তড়্‌ফায়, সেই শেষে তত বেশী পোষ

মানে। এই ছুঁড়িটারও সেই দশা হয়েছে। মুখে যাই বলুক, ও আমাকে চায়, পছন্দ করে।

অমৃত জিজ্ঞাসা করিল: তুমি কিসে বুঝলে যে ও তোমাকে চায়, পছন্দ করে?

কুমারসিং বলিল: ওর মুখ দেখে আর চোখের চাউনি থেকে।

অমৃত হেসে বলে: তাহলে ভেতরে ভেতরে আসনাই চলেছে বলো!

কুমারসিংহের মুখের হাসি বিশ্রীভাবে ফুটিয়া উঠিল। অমৃত তাহার পীঠে কোমল করে মৃদুমধুর একটি কীল বসাইয়া শাসাইয়া বলিল: তবে রে ছেলে, আমার সঙ্গে লুকোচুরী?

পরদিনই কুমারসিং উত্তেজনার আবেগে এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। সেদিন একঘণ্টা আগে ইহাদের ক্লাসের ছুটি হওয়ায় রেবা উপরের অলিন্দে দাঁড়াইয়া গাড়ী আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কয়েকজন সহপাঠীও এই সুযোগে তাহার সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কুমারসিংকে অলিন্দের দিকে আসিতে দেখিয়া তাহাদের মুখগুলি পলকে যেন শুখাইয়া গেল।

রেবা তখন অলিন্দের রেলিংএর উপর পীঠটি রাখিয়া মাথার চুলে জড়ানো কাঁটাটি খুলিতেছিল। কুমারসিংহের সহিত চোখাচোখী হইতেই আহার চোখদুটি কৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাঁটাটি ছিটকাইয়া নিচের প্রাঙ্গণে পড়িল! পরক্ষণে বিপন্নের মত সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল: ঐ-যাঃ, চুলের কাঁটাটা পড়ে গেল যে, কি হবে?

হিংসা ও অহিংসা

ছাত্রদের মধ্যে দুইজন বলিষ্ঠ ও সপ্রতিভ ছাত্র অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়াই সিঁড়ির দিকে ছুটিল। কুমারসিংহের টনকও তৎক্ষণাৎ নড়িয়া গেল; তাই ত, ভারি একটা সুযোগ তাহার হাত ফস্কাইয়া প্রতিযোগীদের হাতে যাইবার দাখিল হইয়াছে যে! অমনি সিংহ বিক্রমে সেও ছুটিল কাঁটার সন্ধানে। অবশিষ্ট ছেলেরা হাসিমুখে রেবার দিকে চাহিয়া কহিল: দেখছেন কি, 'টগ অফ ওয়ার' বাঁধলো বলে?

রেবাও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া নিচের দিকে ঝুঁকিয়া কহিল: বাঁধলো নয়, বেঁধেছে—চেয়ে দেখুন কি কাণ্ড!

এভাবে কথা শুনিয়া এবং দেখিবার নির্দ্দেশ পাইয়া ইহারা বুঝি বর্ত্তাইয়া গেল। রেবার দুই পাশে দাঁড়াইয়া নিচের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিতেই দেখিল: কাঁটাটি লইয়া সত্যই ধস্তাধস্তি বাঁধিয়া গিয়াছে। কুমারসিং প্রতিপক্ষকে প্রবল ঘুসিতে হারাইয়া কাঁটা উদ্ধার করিয়া উপরে আসিতেছে।

তুচ্ছ ব্যপারটির জন্য এই সংঘর্ষ দেখিয়া রেবা তখন উভয় পার্শ্বের সহপাঠীদের মধ্যে হাসিয়া লুটোপুটি খাইবার জো আর কি! কাঁটা হাতে করিয়া সলম্ফে উপরে আসিতেই এই অশোভন দৃশ্যটি যেন কুমারসিংহের চোখে সূঁচ ফুটাইয়া দিল! যাহার জন্য নিচে সে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ঘুসাঘুসী করিয়া আসিল, সে কিনা এখানে আর কয়টি বাঙ্গালী ছোকরার পাল্লায় পড়িয়া হাসিয়া খুন হইতেছে? কাঁটাটি রেবার গয়ের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিয়া সে আহত ব্যাঘ্রের মত দুর্দ্ধর্ষবেগে রেবার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী ছেলে কয়টিকে আক্রমণ

করিল। আক্রান্ত ছেলে কয়টি ঘাবড়াইয়া গিয়াছে দেখিয়া রেবা দুই চক্ষু পাকাইয়া শ্লেষের সুরে তাহাদিগকে তাতাইয়া দিল: অত স্ফূর্ত্তি পাঞ্জাবীর ঘুসীতে নিবে গেল নাকি ?

রেবার কথায় ছেলেগুলির শক্তিও যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল, সগর্জ্জনে তাহারা কুমারসিংকে প্রতি-আক্রমণ করিল। নিচের ছেলে দুইটিও কোলাহল শুনিয়া এই সময় দ্রুতবেগে উপরে আসিয়া পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইতে ইহাদের সহিত যোগ দিল।

ছয় সাতটি ছেলে এক সঙ্গে মরিয়া হইয়া যখন কুমারসিংকে চারিদিক দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে, সেই সময় তৃতীয় এক ব্যক্তি অকুস্থলে আসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে এবং অপূর্ব্ব কৌশলে কুমারসিংকে মুক্ত করিয়া ছেলেদের পানে চাহিয়া অনুযোগের সুরে কহিল: সাতজন মিলে এক জনের উপরে পড়ায় পৌরুষ কিছু নেই, তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

আগন্তুক সত্যব্রত, কলেজের উচ্চশ্রেণীর সর্ব্বাধিক প্রশংসিত মেধাবী ও শক্তিমান ছাত্র। ছেলেরা ইহাকে শ্রদ্ধা করে, মেয়েদের মুখেও এই অদ্ভুত ছেলেটির প্রশংসা যেন ধরে না। কিন্তু এপর্য্যন্ত এই ক্লাসের কোন মেয়ে সত্যব্রতর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায় নাই।

সত্যব্রতকে দেখিয়া এবং তাহার অনুযোগ শুনিয়া ছেলেরা প্রকৃত ব্যাপারটা তাহাকে খুলিয়া বলিল। যে দুইটি ছেলে সর্ব্বাগ্রে নিচে গিয়া কাঁটাটি কুড়াইয়াছিল তাহারাও সাক্ষ্য দিল—কুমারসিং পরক্ষণে সেখানে গিয়া কিভাবে তাহাদিগকে ঘুসাইয়া কাঁটাটি কাড়িয়া লয়। শেষে তাহারাই জিজ্ঞাসা করিল: আপনিই বলুন, এ অবস্থায় এই পাজীটাকে সবাই মিলে আক্রমণ করা কি অন্যায় হয়েছে ?

হিংসা ও অহিংসা

ছেলেটির মুখে পাজী কথাটা শুনিয়াই কুমারসিংহের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুসী পাকাইয়া বক্তার মুখের চাবালি লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

সত্যব্রতর সতর্ক দৃষ্টি ইহার দিকে নিবদ্ধ ছিল, সে খপ করিয়া কুমার সিংহের উদ্যত বলিষ্ঠ হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বজ্রকণ্ঠে কহিল: হুঁসিয়ার !

কিন্তু কুমার সিংহের প্রকৃতি তখন হিংস্র ব্যাঘ্রের মত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, আবদ্ধ হাতখানা মুক্ত না করিয়া মুষ্টিবদ্ধ বাম হাতখানি অতর্কিতভাবে সত্যব্রতর চক্ষুর উপর সবেগে চালাইয়া দিল।

কুমারসিংহের দুর্ভাগ্য, সে জানিত না যে ইদানিং এক নিগ্রো চ্যাম্পিয়ানের নিকট মুষ্টিযুদ্ধের কৌশলগুলিও বহুলাংশে শিখিয়া সত্যব্রত দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। আততায়ী কর্ত্তৃক একখানি হাত ধৃত হইলে অপর হাতখানি কি ভাবে মুক্ত করিতে হয়, আর—সে অবস্থায় উভয় পক্ষের কর্ত্তব্য কি, সত্যব্রত তাহা অবগত ও অবহিত ছিল বলিয়াই কুমার সিংহের মত শক্তিশালী আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণ হইতে চক্ষু-রত্নটিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল এবং পাল্টা আক্রমণে চক্ষুর পলকে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।

স্পন্দিত-বক্ষে রেবা এই সংঘর্ষ লক্ষ্য করিতেছিল ; সে ভাবিয়াছিল, বেচারী সত্যব্রতর মুখখানা বুঝি এই দুরন্ত ছেলেটির ঘুসীতে থেঁতো হইয়া যাইবে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—ছুটিয়া গিয়া কুমারসিংহের মুখের উপর তাহার চুলের সূচীমুখ কাঁটাটি বিঁধিয়া দিয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থাটির মোড় ঘুরাইয়া ফেলে। কিন্তু চিন্তার এই সময়টুকুর মধ্যেই

আক্রান্ত ছেলেটি ইন্দ্রজালের মত যে-বিস্ময়জাল রচনা করিয়া দিল, তাহা যেন কল্পনাতীত ব্যাপার! সে এবার বায়ুর গতিতে সত্যব্রতর সম্মুখে গিয়া কহিল: আপনি সত্যব্রত ব্যানার্জ্জী, থার্ড ইয়ারে পড়েন?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই অসামান্য সুন্দরী মেয়েটির দিকে একটিবার চাহিয়া সত্যব্রত উত্তর দিল: 'হ্যাঁ।' পরক্ষণেই সে পাল্টা প্রশ্ন করিল: তোমাদের ক্লাসের ছুটি ত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, কোনো মেয়েকেই দেখছি না এখানে; তাহলে এদের সঙ্গে মিশে হুল্লোড় করা হচ্ছে কেন?

এরূপ প্রশ্ন যে অপরিচিত ছেলেটির তরফ হইতে এভাবে আসিবে—রেবা তাহা কল্পনাও করে নাই। অন্য কাহারও মুখে ঠিক এই ধরণের কথা শুনিলে সে হয়ত ক্ষেপিয়া উঠিত, কিন্তু আজ তাহার মুখে বিদ্রোহের কোনরূপ ভঙ্গি দেখা গেল না, সহজ কণ্ঠেই সে প্রশ্নটার উত্তর দিল: বাড়ী থেকে গাড়ী এখনো আসেনি তাই এখানে দাঁড়িয়েছিলুম। হুল্লোড় আমি কারুর সঙ্গে করিনি, আর সেটা আমার অভ্যাসও নয়। আপনি ঐ ভদ্রলোকের ছেলেগুলিকে জিজ্ঞাসা করবেন—আমাকে এখানে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও ওঁরা ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন কেন? তা ছাড়া, আমার হাত থেকে চুলের কাঁটাটি নিচে পড়ে যেতেই ওঁরা কেন ছুটলেন, আর—ঐ পাঞ্জাবী ছেলেটি আমার কাঁটা নিয়ে মারামারি বাঁধালেন কেন?

কুমারসিং ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আড়চোখে সত্যব্রত ও রেবার পানে তাকাইতেছিল। রেবার মুখের কথাটা শেষ হইবা মাত্র সে মুখখানা বিকৃত করিয়া এই সময়

কহিয়া উঠিল : তুমি এক নম্বরের খেলোয়াড় মেয়ে আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখে নেব।

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া সত্যব্রত তর্জ্জনের স্বরে কহিল : খবরদার! ফের যদি তুমি এঁর প্রতি কোন রকম অভদ্র ব্যবহার কর, তাহলে তোমার কলেজে আসার পথ বন্ধ করে দেব জেনো।

মুখখানা বিকৃত করিয়া এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে সত্যব্রতর পানে চাহিয়া কুমারসিং চলিয়া গেল। অপর ছেলেগুলিকে লক্ষ্য করিয়া সত্যব্রত কহিল : আশা করি তোমরাও ভবিষ্যতে সতর্ক হবে। কলেজে পড়ছ, উচ্চ শিক্ষার দিকে তোমাদের যখন লক্ষ্য—ভদ্র-কন্যার মর্য্যাদা সম্বন্ধেও তোমাদের সচেতন হওয়া উচিত। মনে রেখো, এখন থেকে তোমাদের ক্লাসের উপর আমার বিশেষ নজর থাকবে।

ছেলেরা কোন উত্তর দিল না, তাহাদের মুখগুলি দেখিয়া মনে হইল—প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। অতঃপর রেবার দিকে চাহিয়া সত্যব্রত কহিল : তোমাকেও বলছি রেবা দেবী, নিজের মর্য্যাদা সম্বন্ধে যদি প্রত্যয় থাকে নিজের মনে, তাহলে কেউ অপমান করতে সাহস পাবে না। আত্মরক্ষা আর আত্মমর্য্যাদা এ দুটোর সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সচেতন থাকা উচিত। আশা করি আর কোনদিন এ কলেজে এমন কোন অপ্রীতিকর কাণ্ড বাধবে না—আমাদের মুখ যাতে নিচু হয়। যদি দেখ, কেউ তোমাকে জ্বালাতন করছে বা কোন বিশ্রী ব্যাপার ঘটবার উপক্রম হচ্ছে—তখুনি আমাকে জানাবে, আমি তার প্রতিকার করব।

এই সময় একখানি গাড়ী আসিয়া দেউড়িতে থামিল। সত্যব্রত কহিল: তোমার গাড়ী এসেছে, যাও।

রেবা কহিল: আপনিও আস্থন। আমার দু চারটে কথা আপনাকে বলবার আছে।

সত্যব্রত কহিল: কথা বলতে বলতেই চল। মুখও চলুক, পাও আমাদের চলতে থাকুক।

রেবা কহিল: আমার সম্বন্ধে আপনি দেখছি সব জানেন, মায় আমার নাম—এমন কি গাড়ীখানা পর্য্যন্ত।

সত্যব্রত কহিল: শুধু তাই নয়, তোমাকে নিয়ে যে ছেলেদের ভিতরে একটা বিশ্রী আলোচনা চলেছে, সেটাও আমার অজানা নয়; জাতীয়তার দিক দিয়ে আমি এটাকে রীতিমত একটা অপমান বলেই ধরে নিয়েছি। এর প্রতিকারের জন্যে প্রস্তুত হয়েই আমাকে এখানে আসতে হয়েছিল। আশা করি, আমার সম্বন্ধে তুমি অন্য কোন রকম ধারণা মনে তুলবে না। আর, এখন থেকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবে—জাতির মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন থাকাই আমাদের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য। সর্ব্বদা মনে রাখবে—আমি বাঙ্গালী, ভারতের শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি আমরা, শিক্ষায় প্রতিষ্ঠায় বিদ্যায় আচারে—আমরা সবার উপরে। মানবতা ও জাতীয় স্বাধীনতার বাণী যে-বাঙ্গালীর কণ্ঠ থেকে প্রথম নির্গত হয়ে সারা ভারতে প্রতিধ্বনি তুলিছে—আমরা তার প্রতীক; বন্ধনপীড়িত দেশকে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিতেই বাঙ্গালী আজ বিশাল ভারতে এগিয়ে এসেছে, আজ তাদের ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষার পথে যদি তুচ্ছ রূপের আলোকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে, তাতে হবে

জাতির পতন; বাঙ্গালীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পাতাগুলো শতছিন্ন হয়ে পথের ধূলোর সঙ্গে মিশে যাবে। নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে আদর্শ হারিয়ে আমরা যেন এই বাস্তব দুঃস্বপ্নকে বরণ করে না আনি।

সত্যব্রতর সতেজ কণ্ঠের কথাগুলি যেন বক্তৃতার মতই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া তাহার অনুগমনকারী রেবা ও বাঙ্গালী ছেলেগুলিকে একসঙ্গে অভিভূত কয়িয়া দিল। একটু পূর্ব্বেও ছেলে-কয়টির মনে একটা কদর্য্য ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছিল—সত্যব্রত বুঝি তাহার শক্তির কসরৎ দেখাইয়া তাহাদের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইল। কিন্তু শেষের কথাগুলি সত্যব্রতর কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইয়া তাহাদের অন্ধ ধারণা যেন একেবারে পাল্টাইয়া দিল। তাহারা এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, কেন এই ছেলেটি শিক্ষায় সামর্থ্যে সমগ্র কলেজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আর—তাহারা পবিত্র শিক্ষায়তনে আসিয়া নৈতিক আদর্শ হইতে কিভাবে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়াছে,—অধ্যয়নে অধ্যাপকের মনোরঞ্জন অপেক্ষা সহপাঠিনীদের মনোরঞ্জনে কিরূপ প্রতিযোগিতা তাহারা সুরু করিয়া দিয়াছে! কলেজের এই কৃতী ছাত্রটি যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া আজ তাহাদের অধঃপতনের পথটি দেখাইয়া দিল। কয়টি ছেলেই এক সঙ্গে নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিয়া সত্যব্রতকে কহিল: সত্যই আমরা ভুলের রাস্তা ধরেছিলুম, আপনার কথায় আমাদের চৈতন্য হয়েছে; আমরা আপনার কাছে শিক্ষা নেব, শক্তি চর্চ্চা করব, চরিত্র গঠনের সাধনা করব। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আর, রেবা দেবীও এখন থেকে জেনে রাখুন—আমরা তাঁকে দেবীর মত শ্রদ্ধা করব, আমরা থাকতে

কেউ কোন রকমে ওঁর অমর্য্যাদা করতে পারবে না। এখন থেকে আমরা শুধু ওঁর সহপাঠী নই, প্রত্যেকেই ওঁর ভাই।

রেবাও সত্যব্রতকে সেদিন সহজে নিষ্কৃতি দিল না, সেও অনুরোধ করিল: আমাকেও আপনার শিষ্যা করে নিতে হবে সত্যব্রতবাবু, বাঙ্গালী জাতির যে ছবিখানি অল্প কথায় আপনি আমাদের চোখের সামনে এঁকে দেখালেন, সেখানি যাতে নিখুঁত করে মনের ভিতরে রাখতে পারি—সে শিক্ষা আমাকে দিতে হবে।

এই সূত্রে রেবার দাদামহাশয়ের সহিতও সত্যব্রতর ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইয়া উঠে। রেবা সেদিনের কাহিনীটি আগাগোড়া সৌরীন্দ্রমোহনকে শুনাইয়া চমৎকৃত করিয়া দেয় এবং পরদিনই তিনি স্বয়ং হাইকোর্ট হইতে ফিরিবার সময় সত্যব্রত ও রেবাকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া নিজের বাড়ীতে আনেন। সত্যব্রতর সহিত আলাপ করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, ছেলেটি সত্যই সকল বিষয়েই অসাধারণ, এমন ছেলের কখনই কোন ক্ষেত্রেই পদস্খলন হইতে পারে না। অতঃপর তাঁহার একান্ত আগ্রহে সত্যব্রত রেবার শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সত্যব্রতর অপূর্ব্ব শিক্ষার প্রভাবে রেবা তাহার দুইপায়ের শৃঙ্খলের সহিত মনের শৃঙ্খলটিও কাটিয়া ফেলিবার যোগ্যতা লাভ করে। শরীর ও মনের পরিপূর্ণ চর্চ্চায় তাহার রূপশ্রী এমন মহিমময়ী হইয়া উঠে যে, যে-কোন পুরুষের মস্তক শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে—তাহার মত নারীর উদ্দেশে, এবং সেই সঙ্গে সমাজের উদ্দেশে, সভ্যতার উদ্দেশে, মানবতার উদ্দেশেও।

সত্যব্রতর মাতামহ রাজীবলোচন কথাটা শুনিয়া যখন সত্যব্রতকে

ধমকাইয়া দেন, তখন রেবার শিক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। সে এফ, এ পরীক্ষা দিয়াছে এবং সত্যব্রত বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বুদ্ধিমান সত্যব্রত পরীক্ষার সময় এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটি লইয়া কোনরূপ গোলযোগ তুলে নাই, কিন্তু পরীক্ষার পরেই সে নিজমূর্ত্তি ধরিল।

পরীক্ষার মধ্যে সে রেবাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় যায় নাই, কিন্তু পরীক্ষা যেদিন শেষ হইয়া গেল—ইউনিভারসিটি হইতে বরাবর সে রেবাদের বাড়ীতে আসিতেই সৌরীন্দ্রমোহনের সেক্রেটারী তাহাকে একখানি পত্র দিলেন। পত্রখানি পড়িয়া সত্যব্রত যেন বজ্রাহতবৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন :

> হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে বসে গোটা ভারতের অনেক রকম মানুষ আমাকে দেখতে হয়েছে—কিন্তু তাদের ভিতরে এমন কাউকে দেখিনি সকল দিক দিয়েই যে অসাধারণ! আমার দৌহিত্রী রেবার কল্যাণে সেই আদর্শ মানুষটিকে আমি আমার বাড়ীতে বসেই প্রথম দেখি আর সেইজন্যই বিশ্বাস করে রেবার শিক্ষার ভার তার হাতে তুলে দিই এই ভেবে যে, তার শিক্ষায় রেবা জগতের লোকারণ্যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারবে। আমার সে আশা সফল হয়েছে, রেবার শিক্ষাও হয়েছে পূর্ণ। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রেবার শিক্ষাদাতাকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত জেনেও, এবং তার কাছে অশেষ ঋণে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞের মত আজ সকল সম্বন্ধ ছেদন করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এই অপ্রীতি-

কর অবস্থাটির উপলক্ষ কি, আশা করি—তুমি নিজেই তা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তা সত্ত্বেও ব্যাপারটিকে এমন গুরুত্ব দেবেনা—যার জন্য তোমার স্নেহের শিষ্যাটির তরুণ জীবন তার জননীর মতই বিষময় হয়ে উঠে! যেহেতু আমার দৃষ্টিতে তুমি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী এক অসাধারণ ছেলে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবনের ব্রত সার্থক হোক, সাধনা তোমার সিদ্ধিলাভ করুক, বাঙ্গালী-জীবনের আর এক নবীন প্রভাতের ঘোষণা ফুটে উঠুক তোমার মুখ দিয়ে।

চিঠিখানি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই পকেটে ফেলিয়া সত্যব্রত বাড়ীতে চলিয়া আসিল। রেবার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বা এ সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার কোন আগ্রহই তাহার আচরণে দেখা গেল না। কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই রাজীবলোচনের সহিত প্রথমেই তাহার দেখা হইল, তিনি যেন সত্যব্রতর প্রতীক্ষা-ই করিতেছিলেন। চোখো চোখি হইতেই প্রশ্ন করিলেনঃ পরীক্ষা বুঝি শেষ হল আজ?

গম্ভীর মুখে সত্যব্রত উত্তর দিলঃ হ্যাঁ।

পুনরায় প্রশ্নঃ ইউনিভারসিটি থেকে বরাবর এখানে আসছ, না সৌরীনবাবুর বাড়ীতে আড্ডাটা জমিয়ে—

কথাটা শেষ করিবার অবসর তাঁহাকে না দিয়াই তীক্ষ্ণকণ্ঠে সত্যব্রত কহিলঃ সৌরীনবাবু সম্বন্ধে কোন কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, করলেও তার উত্তর পাবেন না।

কথাটা বলিয়া এবং কোন উত্তর শুনিবার প্রতীক্ষা না করিয়া সে

সবেগে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। মুখখানির এক বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া রাজীবলোচন আপন মনে বলিলেন : সয়তানের বাচ্ছা সয়তানই হয়। ধূলোপায়েই সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে—তাই এত ঝাঁঝ্। এক চিঠিতে সব মাত, একেই বলে জমিদারী চাল!

সত্যব্রত বরাবর মায়ের নিজস্ব ঘরখানির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া গাঢ়স্বরে ডাকিল : মা!

সাবিত্রীর জীবন সেই অবধি একই ধারায় চলিয়া আসিতেছে। কালের দীর্ঘ আবর্ত্তনেও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। রুদ্ধকক্ষে বসিয়া অধিকাংশ সময় পূজা পাঠ, আয়তী রক্ষার অনুকূলে একাদশী তিথিতে সধবাগণের সহিত একত্র ভোজন প্রভৃতি কিছুরই ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার ঘরখানি ঠিক ঠাকুরঘরের মতই পবিত্র এবং শান্তিপূর্ণ; সংসারের কর্ম্মকোলাহলের রেসমাত্রও এখানে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। মাতার ঘরের পার্শ্বেই সত্যব্রতর শয়নঘর এবং ক্ষুদ্র একটি পাঠাগার। সকালের দিকে অর্দ্ধ ঘণ্টা এবং সায়াহ্নে একটি ঘণ্টা সত্যব্রত মায়ের সহিত কথাবার্ত্তার সুযোগ পায়। এই সময়টুকুর অধিকাংশ পুত্রের উদ্দেশে সদুপদেশ দানে অতিবাহিত হইয়া থাকে।

এদিন অসময়ে কক্ষদ্বারে পুত্রের আহ্বান শুনিয়া সাবিত্রীর মনটি বুঝি সন্দেহে দুলিয়া উঠিল। তিনি তখন একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া বসিয়াছিলেন। বইখানি হাতে করিয়াই দ্বারদেশে ছুটিয়া আসিলেন, পুত্রের মুখখানি দেখিবামাত্র বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না যে, একটা

কিছু অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটিয়াছে। পরীক্ষার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে তাঁহার পিতার সহিত পুত্রের যে কথান্তর হইয়াছিল, পুত্র সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক থাকিলেও, তাহার অজ্ঞাতে পিতা সকল কথাই কন্যাকে শুনাইয়া দিয়া শক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শেষে এমন আশ্বাসও তিনি দিয়েছিলেন যে বোড়ের চালে দুইপক্ষকেই মাত করিয়া দিবেন! সৌরীন চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে ভাল করিয়াই চিনে— পুনরায় ঘঁটাইতে সাহস করিবে না। সে নিজেই সত্যকে তার বাড়ীর সংস্রব হইতে সরাইয়া দিবে—তাঁহাকে মুখ ফুটাইয়া কিছুই বলিতে হইবে না। পিতার কথাগুলি সাবিত্রী নীরবেই শুনিয়াছিলেন, শক্ত হইবার জন্য পিতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতিও দিয়াছিলেন, কিন্তু এসম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা কোনরূপ প্রতিবাদ তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই। ভাগ্যবিপর্যয়ের পর হইতে ব্রতচারিণীর মত তিনি বাক্‌সংযমে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে সাধারণতঃ তাঁহার মুখের বাণী ক্বচিৎ বাড়ীর পরিজনদের কর্ণগোচর হইত। সাংসারিক কোন ব্যাপারেই যে লোক লিপ্ত থাকেন না, তাঁহার পক্ষে ক্রোধ বা বিক্ষোভের কোন কারণও কদাচ ঘটে না, ঘটিলেও নিজের অসাধারণ সহনশীলতায় তিনি সমস্তই উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

সত্যব্রতর মুখে বিক্ষোভের গভীর ছায়া লক্ষ্য করিয়া সাবিত্রী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন: কি হয়েছে বাবা?

সত্যব্রত সংক্ষেপে রেবা ও তাঁহার মাতামহের সংক্রান্ত সকল কথা বলিয়া সৌরীন্দ্রমোহনের নিকট সদ্য প্রাপ্ত পত্রখানি মাতার হাতে দিল। সাবিত্রী একদৃষ্টিতে তাহা পড়িয়া পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন:

আমি সব শুনিছি বাবা! সৌরীনবাবুর মেয়ের অত বড় সর্ব্বনাশের মূলে যে মস্ত একটা চক্রান্ত থাকে আর সে চক্রান্তের সঙ্গে আমাদের অতি আপনার লোকের যে যোগাযোগ ছিল, বড় কষ্টেই আমাকে সেটা বলতে হচ্ছে। কাজেই ওঁদের সংস্রবে তোমার যাওয়াটাই হয়েছে মস্ত একটা ভুল। তোমার দাদামশাই কিছুতেই এটা সহ্য করতে পারবেন না, তাই কাঁটা দিয়ে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন বাবা, দাদামশায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আর সম্প্রীতি রাখতে হলে তোমাকে সবই সহ্য করতে হবে। সৌরীনবাবুদের নামও তিনি তোমার মুখে শুনতে পারবেন না—সম্বন্ধ রাখা ত পরের কথা।

সত্যব্রত কহিল : সৌরীনবাবুদের সঙ্গে দাদামশায়ের ব্যবহার থেকে যে সন্দেহ আমার মনে শক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে, সেইটের মীমাংসা আমাকে এখনি করতে হবে। আমার বাবার সম্বন্ধে যে সব কথা আমাকে দাদামশাই বরাবর শুনিয়ে এসেছেন, তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে—সেটাও সত্যি নয়, তার ভিতরেও গোল আছে, গলদ আছে; বাবার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোমাকে কোনদিন করিনি। তুমিও আমাকে কোন কথাই বলনি। দাদামশাই অন্ততঃ আশি হাজার বার আমাকে শুনিয়েছেন যে, বিলেতে গিয়েই তাঁর পদস্খলন হয়—একটা নীচ জাতের মেমকে বিয়ে করে জাতি ধর্ম্ম পরিবার পরিজন সব তিনি ছেড়েছেন, তাঁর নাম করলেও পাপ হয়। আজ আমি জানতে চাইছি তোমার কাছে—বাবার সম্বন্ধে আগাগোড়া সমস্ত কথা। আমার বাবার প্রবৃত্তি যে এত নীচ হতে পারে—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মা,—যতক্ষণ না তোমার মুখে তাঁর জীবনের ইতিহাস শুনছি।

দেহটাকে যেন জোর করিয়া খাড়া রাখিয়া সাবিত্রী পুত্রের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কথা ফুরাইবার পরও কিছুক্ষণ প্রস্তর প্রতিমার মত তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সত্যব্রত চাহিয়া দেখিল, মায়ের মুখখানি ছায়ের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুইচক্ষু নিস্প্রভ, স্বচ্ছ তারাদুটি স্থির, মূর্চ্ছাহত হইবার ঠিক যেন পূর্ব্বাবস্থা। তাড়াতাড়ি মায়ের সন্নিকটে গিয়া সত্যব্রত কহিল: বুঝতে পেরেছি মা, আমার বাবার সম্বন্ধে আমাকে অন্ধকারে রাখাই তোমার ইচ্ছা, মুখে তুমি কোন কথাই বলতে পারবে না। তোমার বাবাকে তুমি অপরাধী করতে চাও না; আমার বাবা আমার কাছে সমাজের কাছে জাতির কাছে দেশের কাছে চির অপরাধী হয়ে থাকেন—তোমার বাবার ইচ্ছায় তোমাকেও তাই স্বীকার করতে হয়েছে। তাহলে এখন আমারও কর্ত্তব্য হচ্ছে—নিজের চেষ্টায় আমার বাবার সম্বন্ধে সত্যকার সংবাদ সংগ্রহ করা।

পুত্রের শেষের কথাগুলি যেন সাবিত্রীকে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইবার সুযোগ দিল। তাহার স্থির দেহখানি দীর্ঘ একটি নিশ্বাসের ভারে সহসা দুলিয়া উঠিল। পরক্ষণে তিনি ধীরে ধীরে ঘরখানির প্রান্তভাগে স্থাপিত সুশ্রী আলমারিটির ডালা খুলিয়া গজদন্ত-নির্ম্মিত কারুকার্য্য-খচিত একটি বাক্স বাহির করিলেন। প্রায় একটি মিনিট নিবদ্ধ দৃষ্টিতে হাতের বাক্সটির পানে চাহিয়া থাকিয়া তিনি পুনরায় স্বাভাবিকভাবে দুই চক্ষু তুলিয়া সত্যব্রতর পানে চাহিলেন। সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া সত্যব্রতর মনে হইল, তাহার তপস্বিনী জননী অন্তর্নিহিত সমস্ত সঙ্কোচ যেন সবলে ছিন্ন করিয়া সত্যকার মর্ম্মবাণী ব্যক্ত করিবার

জন্য প্রসন্নভাবেই তাহার পানে তাকাইয়াছেন, তাঁহার হাতের তুষারশুভ্র আধারটির মধ্যেই বুঝি সেই বাণীর উপাদান পুঞ্জিভূত হইয়া আছে।

পুত্রের কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইবার পূর্ব্বেই মাতা মৃদুস্বরে কহিলেনঃ প্রায় দুই যুগ আগে এই বাক্সটি আমার হাতে আসে। আমার শ্বশুরের শেষ স্মৃতিচিহ্ন এটি। তোমাদের বংশের যথাসর্ব্বস্বই এর মধ্যে আছে। আমি জানতুম, একদিন তুমি আমার কাছে এর জন্যে কৈফিয়ৎ চাইবে। কিন্তু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা শোনবার মত মনের অবস্থা আমার নেই। এই বাক্সের ভিতরে যে সব কাগজপত্র আছে সে গুলো যতই গোপনীয় হোক, তোমাকে পড়বার অনুমতি আমি দিলুম। ওদের মধ্যেই তুমি সত্যের সন্ধান পাবে। ও বাক্স আজ থেকে তোমার, ওর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্তই তোমার। আমার শুধু একটা অনুরোধ বাবা, আমার বা আমার বাবার যত অপরাধই হোক, তুমি সেটা ক্ষমা করবে; না পারো, সব ক্ষোভ মনের মধ্যেই চেপে রাখবে; বাইশ বছর আগেকার যে অপ্রিয় ব্যাপারটা চাপা পড়ে আছে, তুমি যেন তার ঢাকা খুলে এ বাড়ীতে কিম্বা এ-শহরে তার বিষাক্ত বাস্প ছড়িয়ে দিয়ো না। রেবার মা আত্মহত্যা করে বেঁচেছে। আমি কিন্তু বেঁচে থেকে প্রায়শ্চিত্ত করছি আমার পাপের; আত্মহত্যার পথ ধরে বাঁচবার ইচ্ছা আমার নেই; এই ভাবে জীবন্মৃত হয়ে থাকাই আমার সাধ। তুমি যেন অনর্থ বাধিয়ে আমার এ সাধে বাদ সেধোনা, বাবা! তার চেয়ে যদি তুমি তোমাদের বংশের পরিচয়-ভরা এই বাক্সটি নিয়ে

এখানকার সম্পর্ক কাটিয়ে যেতে চাও—মনোবাঞ্ছা তোমার পূর্ণ হোক বলে—আশীর্ব্বাদই করব। কিন্তু আমার বাবাকে যদি কোনরকম আঘাত তুমি দাও, আমি তা সহ্য করতে পারব না—তখন আমাকে রেবার মায়ের পথটিই একান্ত অনিচ্ছাতেও বেছে নিতে হবে।

সতব্রত স্তব্ধভাবে মায়ের মর্ম্মভেদী কথাগুলি শুনিল। বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না যে—এই ক্ষুদ্রাকৃতি সুশ্রী আধারটির মধ্যে এমন কোন সাংঘাতিক বার্ত্তা নিহিত আছে যাহা সত্যই অনর্থকর। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মর্ম্মপীড়িতা তপস্বিনী জননীর মহিমময়ী মূর্ত্তির সহিত মর্ম্মবাণীও তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সে জানু পাতিয়া শ্রদ্ধাসহকারে আধারটি গ্রহণ কয়িয়া গাঢ়স্বরে কহিল :—তাই হবে মা, আমার বাবার সম্বন্ধে যে-সংবাদই আমি পাই না কেন—আর সেটা যত সাংঘাতিকই হোক, তার জন্যে তোমার বাবার সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করতে যাবো না।

নিজের ঘরে গিয়া সত্যব্রত বাক্সটি খুলিতেই দেখিতে পাইল, তাহার ভিতরে একতাড়া চিঠি, কতকগুলি মুল্যবান অলঙ্কার এবং একশত পঁচিশটি মোহর রহিয়াছে। চিঠির তাড়াটি খুলিতেই প্রথম দিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা যে পত্রগুলি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল, কয়েকছত্র পড়িতেই বুঝিতে পারিল যে—সেগুলি তাহার পিতার লিখিত, বিলাত হইতেই আসিয়াছিল। প্রত্যেক পত্রের ভাষা এত মার্জ্জিত এবং বিষয়বস্তুর অধিকাংশই শিশুপুত্র 'বাবু'র বৃত্তান্তে এমন ভাবে পূর্ণ যে পড়িতে সত্যব্রতর মনে কোনরূপ বিকার দেখা দিল না, জননীর উদ্দেশে লিখিত পিতার প্রথম যৌবনের পত্রগুলি পড়া যে

বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের পক্ষে অনুচিত - সে সম্বন্ধে মনে কোনরূপ দ্বিধাও উপস্থিত হইল না। যে পিতাকে সে কোনদিন দেখিবার সৌভাগ্য পায় নাই—শুধু তাঁহার সম্বন্ধে মাতামহের রূঢ় কঠোর অভিযোগই শুনিয়াছে, এতকাল পরে তাঁহার সুন্দর হস্তক্ষরের মধ্য দিয়াই আজ বুঝি সেই অতিনিন্দিত অতি আপনার মানুষটির স্নেহ প্রবণ অনিন্দ্য সুন্দর অন্তরটির সুস্পষ্ট পরিচয় সে পাইল। যাঁহার হাতের লেখা এমন সুন্দর, ভাষা এমন নির্ম্মল—প্রতি শব্দটি যেখানে স্নেহের রসে টুলটুল করিতেছে, তিনি কথনো কি মন্দ হইতে পারেন? সাধ্বী স্ত্রী স্নেহের পুত্র, আত্মীয় স্বজন, জাতি-ধর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেশান্তরীণ হইতে পারেন? চিঠির ভাষার মধ্য দিয়া সত্যব্রতর চক্ষুর উপর যেন তাহার দেশান্তরিত নিরুদ্দিষ্ট পিতার দিব্যমূর্ত্তি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় পিতার পরবর্ত্তী পত্রগুলির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল আরও তীব্র হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পরের পত্রগুলির ভাষা ভাব ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিদ্রোহাত্মক হইলেও সত্যব্রত তাহাতে পিতার কোনরূপ ত্রুটির আভাস ত পাইলই না, বরং তাঁহার তেজ জেদ ও দৃঢ়তার প্রশংসাই তাহাকে মনে মনে করিতে হইল। এমন কি, পিতার শেষ পত্রখানির শেষাংশে লিখিত—'যে দুর্ভাগ্য শিশুটি তোমার অঙ্ক আশ্রয় করে আছে, তার সম্বন্ধেও আমি সকল স্বত্ব ত্যাগ করলুম'—এই মন্তব্যটুকুর জন্যও সত্যব্রত পিতাকে অপরাধী করিতে পারিল না।

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য পত্রগুলিও সাবিত্রী সংগ্রহ করিয়া এই তাড়ার মধ্যে রাখিয়াছিলেন। মিষ্টার জনসনকে লিখিত ইংরাজী পত্রের নকল, তাহার উত্তর এবং সাবিত্রীর নাম দিয়া সিদ্ধনাথের নিকট প্রেরিত

শেষ'কেবেল'টির প্রতিলিপি পর্য্যন্তও ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। সিদ্ধনাথের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া এবং তাহার নিকট শিশুপুত্রের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদটি পাঠাইয়া সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার এই হীন প্রচেষ্টাটি সত্যব্রতকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিল।

প্রত্যুষেই সে মাতার গৃহে তাঁহার প্রদত্ত বাক্সটি হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়াই মাতা শিহরিয়া উঠিলেন, এক রাত্রিতেই তাহার আকৃতির যেন আশ্চয্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, অনিদ্রাজনিত ক্লান্তির ছায়া সুন্দর মুখখানিকে ম্লান ও বিবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বুদ্ধিমতী জননীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সারারাত্রি ব্যাপিয়া কি মর্ম্মান্তিক বেদনা পুত্রকে সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল না—গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে তিনি শুধু পুত্রের মুখেব দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রশ্ন পুত্রই তুলিল, পিতার প্রস্তাবটি গ্রাহ্য এবং শিশুপুত্রের মৃত্যুর প্রসঙ্গ সম্বন্ধে লিখিত কেবেলের ইংরাজী প্রতিলিপিখানি মাতার সম্মুখে মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল: এই কেবেলখানি কে লিখেছিলেন মা? লেখা নিশ্চয়ই তোমার হাতের নয়—দাদুর হস্তাক্ষর বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার চিঠির বাণ্ডিলের ভিতরে যখন আছে, তুমিও ব্যাপারটা জানতে বলে মনে হচ্ছে। আমার কোন কথা এ সম্বন্ধে বলবার নেই, মুখ তুমি আগেই বন্ধ করে দিয়েছ। শুধু আমার জিজ্ঞাস্য—আমার মৃত্যুর মিথ্যা খবরটি তাঁর কাছে পাঠাবার কি কারণ হয়েছিল?

জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া সাবিত্রীদেবী কহিলেন: পাছে তোমাকে তিনি পরে দাবী করেন, তাই বাবা এই খবরটা পাঠিয়েছিলেন।

সত্যব্রত পুনরায় প্রশ্ন করিল : তুমি তাহলে জানতে ! কিন্তু আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না মা, কি করে তুমি এতবড় মিথ্যা খবরটা তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলে ! এ খবরটি তাঁকে পাঠাবার কোন কারণ ত ছিল না—তিনি যখন নিজেই সম্বন্ধ ছিন্ন করেছিলেন !

সাবিত্রী কহিলেন : খবরটা যখন ওভাবে পাঠানো হয়, আমি অবশ্য জানতুম না, তাহলে হয়ত প্রতিবাদ করতুম। 'কেবেল' পাঠাবার পর বাবা আমাকে নকলটা দেন। তখন আমার আর কিছুই করবার ছিল না। যাই হোক, এখন আমার মাথার দিব্য বাবা—

মুখখানা শক্ত করিয়া সত্যব্রত কহিল : দিব্য দেবার দরকার নেই মা, তোমার মনের কথা আমি জানি। এ ব্যাপার নিয়ে কোন আলোচনাই আমি দাদুর সঙ্গে করব না। কেননা তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আমার বাবাকেই ছোট করা হবে। আমি আবার বলছি মা, আমার বাবার জন্যে তোমার বাবার সঙ্গে আমি ঝগড়া করব না।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন : তাহলে বাক্সটা তুমি ফিরিয়ে আনলে কেন ? আমি ত ফেরৎ দিতে বলিনি বাবা ! বরং চিঠির তাড়াটা তুমি আমাকে দিয়ে বাক্সটা নিজের কাছে রাখ—ওর ভিতরে যা কিছু আছে, সে সবই তোমার।

সত্যব্রত কহিল : এই 'যা কিছু'র জন্যেই এক বিরাট পুরুষকে আমরা হারিয়ে ফেলিছি মা ! কি রকম ব্যাকুল দৃষ্টিতে দিনের পর দিন তিনি এগুলোর প্রতীক্ষা করেছিলেন, কাল সারারাত ধরে আমি তা ভেবেছি। এর একটা দানাও আমি আমার কাজে লাগাতে পারব না মা, এসব

তেমার কাছে থাক্, ওগুলোর চেয়ে চিঠির তাড়াটাই আমার বেশী দরকার, যে স্নেহময় বাবাকে কোন দিন দেখিনি—শুধু তাঁর কুৎসাই শুনিছি, এগুলোকে উপলক্ষ করে আমি তাঁকে ভাববার চেনবার জানবার সুযোগ পেয়েছি ; তাই এগুলিকে সঙ্গের সাথী করে রাখতে চাই। বাক্সের ভিতর থেকে শুধু এই চিঠির বাণ্ডিলটি নিয়ে আর সবই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি মা—তুমি কিছু মনে ক'র না।

সাবিত্রীর দুই চক্ষু তখন বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আর্ত্তস্বরে তিনি কহিলেন : তাহলে যে কথা আমার মুখ দিয়ে কাল বেরিয়েছিল, তাই নির্ঘাত সত্য হয়ে দাঁড়াল বাবা, তুমি কি তাহলে—

অশ্রুর আবর্ত্তে সাবিত্রীর কথা এখানে রুদ্ধ হইয়া গেল। সত্যব্রত মাতার প্রশ্নের বিষয়টি উপলব্ধি করিয়া ক্ষিপ্রকণ্ঠে কহিল : না মা, এখনি আমি সব ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ছি না, তবে এটা ঠিক, এ বাড়ীতে—এ শহরের সংস্রবে আমি থাকতে পারব না। আমি যে কি করব, এখনো ঠিক করতে পারিনি মা। তবে তুমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে, আমার দ্বারায় তোমার বাবার কোন ক্ষতি হবে না, আর কোন অশান্তিও দেখা দেবে না ; আমার এখন লক্ষ্য শুধু মা—পথের সন্ধান করা। সন্ধানটুকু পেলেই তোমাকে জানাবো।

* *

*

যথাসময় পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে জানা গেল যে, সত্যব্রত প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। এফ-এ পরীক্ষায় সে বৃত্তি

পাইয়াছিল, বি, এ পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়া আত্মীয়-স্বজনের আনন্দবর্দ্ধন করিল। এই সময় রাজীবলোচন সত্যব্রতর সাফল্যকে উপলক্ষ করিয়া এক প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিলেন এবং এ সম্পর্কে কাণাঘুসায় প্রকাশ পাইল যে, তাঁহার আত্মীয়স্থানীয় ধনাঢ্য ভূস্বামী অখিলরঞ্জনের কন্যার সহিত সত্যব্রতর শুভবিবাহের কথা চলিয়াছে, প্রীতিভোজে তিনিও সকন্যা যোগদান করিবেন। এই অখিলরঞ্জনের সহিত একদা স্যার সৌরীন্দ্রমোহনের কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হয় এবং পরে ভাঙ্গিয়া যায়—ইহাকে উপলক্ষ করিয়াই রাজীবলোচনের সহিত সৌরীন্দ্রমোহনের মনোমালিন্য ঘনীভূত হইয়া উঠে।

কিন্তু রাজীবলোচনের ভবনে যে সময় বিপুল জাঁকজমকে প্রীতি-ভোজের উৎসব চলিয়াছে, ঠিক সেই সময় সত্যব্রত রামদুর্গ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী আনন্দময় রাজপণ্ডিতের সেরেস্তায় বসিয়া একখানি একরার-নামায় স্বাক্ষর করিতেছিল। রামদুর্গ রাজ্যের সরকার সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—কতিপয় গ্রাজুয়েট যুবাকে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ইউরোপে পাঠানো হইবে এবং শিক্ষান্তে তাহারা রামদুর্গ রাজ্যের উন্নতি ও গঠনমূলক কার্য্যে উপযুক্ত বেতনে যোগদানে বাধ্য থাকিবে—এই সর্ত্তে সরকার তাহাদের উচ্চশিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবেন। সত্যব্রত এই ব্যাপারে প্রার্থী হইলে তাহার আবেদন সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হয় এবং চুক্তিপত্র সম্প্রাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাহাকে রামদুর্গ রাজ্যে আহ্বান করেন।

সত্যব্রত পোষ্ট আফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কথাটা বাড়ীতে

জানাজানি হইবার সুযোগ দেয় নাই। উৎসবের পূর্ব্বদিন কোন নিমন্ত্রণ রক্ষার অছিলায় এই বলিয়া সে গৃহত্যাগ করে যে, যথাসময়েই সে প্রীতি ভোজের উৎসবে যোগ দিবে। কিন্তু পরিপূর্ণ উৎসবের সময় যখন সত্যব্রতর নামে হাঁকডাক পড়িয়া গেল, সে সময় অপরিচিত একটি ছেলে খামে আঁটা একখানি পত্র গৃহস্বামীর হাতে দিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাজীবলোচন খামখানি খুলিতেই যে পত্রখানি বাহির হইল, তাহাতে কতিপয় ছত্র এইভাবে লিখা ছিল ঃ

দাদু,—সম্মানের সঙ্গে বি, এ পাস করে বৃত্তি পাওয়াটা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়—যার জন্যে রীতিমত আড়ম্বরে একটা ভোজের প্রয়োজন। এর পিছনে যে আর একটা মহোৎসবের পরিকল্পনা করে রেখেছেন—সকন্যা অখিলরঞ্জন বাবুর আগমনেই সেটা সকলেরই বোধগম্য হয়েছে। কিন্তু এরূপ উৎসবের ভিতর এমন সব ব্যসন উপস্থিত হয়েছে—যেগুলো দুঃস্বপ্নের মতই তিক্তজনক। তাই, আপনার উৎসবের সংস্রব ছেড়ে তফাতে সরে যাচ্ছি। মাথা উঁচু করে পিতা পিতামহের পরিচয় দেবার ক্ষমতা যার নেই—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার আলোকেও বংশ-তরুর সন্ধান যে পায়নি, তাকে উপলক্ষ করে কোন উৎসব রচনা—নিষ্ঠুর আঘাত দেবার মতই বেদনাদায়ক! তাই অবস্থাটা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করে অনাগতের পথে পাড়ি দিচ্ছি। আমার এই যাত্রাকে আমাদের কৌলিক বিশেষত্ব বলেই সাব্যস্ত

করবেন, কিন্তু অনুরোধ এই যে—আলেয়ার পিছনে আলো নিয়ে ছুটবেন না। উৎসবস্থলে বসে যখন এই পত্র আপনি পড়বেন—আমি তখন তিনশো মাইল তফাতে এগিয়ে এসে আমার ভাগ্যের পাতায় কালির আঁচড় টানছি জানবেন।

পত্রখানা পড়িয়াই রাজীবলোন বাহকের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না। অখিলরঞ্জন নিকটেই বসিয়াছিলেন, প্রশ্ন করিলেন: ব্যাপার কি মামা, কার চিঠি? 'এসে বলছি' বলিয়াই রাজীবলোচন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন বরাবর কন্যা সাবিত্রীর কক্ষে। এত বড় একটা উৎসবের ব্যাপারে সাবিত্রী নির্লিপ্ত ভাবেই নিজের ঘরে বসিয়া প্রদীপের স্নিগ্ধ দীপালোকে শ্রীমদ্ভাগবতের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পিতাকে উত্তেজিত-ভাবে আসিতে দেখিয়াই তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজীবলোচনের মুখখানা তখন বিরক্তির ভারে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। রুক্ষস্বরে কহিলেন: বেশ যা হোক মা, বাড়ীতে এত বড় একটা কাণ্ড চলেছে, আর তুমি ঘরখানির ভেতর চুপটি করে বসে আছ! কি করে যে অষ্টপ্রহর একই জায়গায় এক ভাবে বসে থাকতে পার তা ত ভেবে পাইনে। যাক্, এখন তোমার ছেলে কি কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে দেখ।—বলিয়াই হাতের চিঠিখানা তিনি স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মানা কন্যার হাতে গুঁজিয়া দিলেন;

চিঠিখানি রুদ্ধনিশ্বাসে পড়িয়া সাবিত্রী পিতার হাতে ফিরাইয়া

দিয়া ম্লানমুখে মৃদুস্বরে কহিলেন : এর জন্যে রাগ করে মনকে বিষিয়ে তুলে ত কোন লাভ নেই বাবা, যার অদৃষ্টে যেটা লেখা আছে হাজার চেষ্টাতে সেটা খণ্ডানো যায় না—সেও ত আপনি জানেন।

হুঙ্কার দিয়া রাজীবলোচন কহিলেন :—এসব কথা শুনতে ভাল, বলা ও সহজ; কিন্তু আসলে ভুয়ো। জানো, এভাবে গা-ঢাকা দিয়ে আমাকে কি রকম মুস্কিলে সে ফেলেছে? অখিলের মেয়ের সঙ্গে হতভাগার বিয়ের কথা পেড়েছিলুম, অখিল মেয়েকে নিয়ে এসেছিল; আজ কথা ঠিক হয়ে যেত। এখন আমি কি বলব? বৈঠকখানায় এক ঘর লোক, সবার সামনে মাথা আমার হেঁট হয়ে যাবে। হতভাগা যে এমন করে আমার মুখ ডোবাবে আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

মুখখানি নিচু করিয়া সাবিত্রী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কন্যাকে এ সম্বন্ধে উদাসীন ও নিরুত্তর দেখিয়া রাজীবলোচনের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল, কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া কহিলেন :—ওদের ঝাড়-টাই হচ্ছে বেইমান, রক্তের দোষ হাজার চেষ্টাতেও নষ্ট হয় না। আমি যদি জানতে পারতুম ঘুণাক্ষরে যে সটকাবার মতলব করেছে, তাহলে হাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে বাড়ীতে কয়েদ করে রাখতুম। তুমি কিছু জানতে না? যাবার আগে তোমাকে কিছু বলে যায় নি?

সাবিত্রী উত্তর দিলেন : আপনি ত জানেন বাবা, তার সম্বন্ধে আপনি যখন যে ব্যবস্থা করেন, আমি তাতে কোন কথাই বলিনি, আর ওর কোন ব্যাপারেই আমি থাকি না। দেখতেই ত পাচ্ছেন—কোন দিকেই আমি চাই না, কিছুতেই মন বসাতে পারি না, তাই চুপ করে ঘরের ভিতরেই পড়ে থাকি। সে যাবে যাবে—একথা ত কদিন ধরেই

শুনেছি, কিন্তু কোথায় যাবে—কেন যাবে—তার সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি, আর আমার ভালও লাগে না। দুঃখকে আমি জয় করেছি, কাজেই কারুর জন্যেই আমার কোন দুঃখ নেই—ভাবনাও নেই।

তাহলে তোমার কাছে কথাটা বলতে আসাই আমার ভুল হয়েছে দেখছি; ভাল, দেখি বেয়ে চেয়ে আমিই কতদূর কি করতে পারি! আমি হচ্ছি সংসারী মানুষ, পাঁচশো লোকের ভাবনা ভাবতে হয়, দুঃখ আমাকে ভয় করে—কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় না—কথাগুলি সদম্ভে কন্যাকে শুনাইয়া রাজীবলোচন চলিয়া গেলেন।

সত্যব্রতও আটঘাট বাঁধিয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিল। রামদুর্গ ষ্টেটের ব্যবস্থায় বিলাতের সুপরিচিত ইণ্ডিয়া কটেজে থাকিয়া পড়াশুনায় কোন অসুবিধা ঘটে নাই। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার পিতার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত এমন কোন নির্ভর যোগ্য তত্ত্ব সে পায় নাই—যাহার সাহায্য কোনরূপ অনুসন্ধান করা সম্ভবপর হইতে পারে। তথাপি, ইণ্ডিয়া কটেজে এবং কলেজে সকল শ্রেণীর সহপাঠীদের সহিত মেলা-মেশা ও খেলা-ধূলায় এই ছেলেটির বিপুল অনুরাগ উৎসাহ দেখিয়া কে বলিবে ইহার পশ্চাতে প্রবল একটা অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত রহিয়াছে। পড়াশুনা এবং আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই কতকটা সময় সত্যব্রত নানা ভাবে প্রায় দুই যুগ পূর্ব্বের বিলাত-প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র সিদ্ধনাথ ব্যানার্জ্জীর অনুসন্ধান-ব্যাপারে অতিবাহিত করিয়া থাকে। কিন্তু যে যুগের সতর্ক ছেলেটি তাহার পশ্চাতের পদচিহ্ন এমন ভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, এ-যুগের এই উৎসাহী ছেলেটির পক্ষে সে সম্বন্ধে কোনরূপ সূত্র আবিষ্কার সম্ভবপর হয় নাই। অবশেষে

রেভারেণ্ড ম্যাক নামে এক আইরিস পাদ্রীর সহিত সত্যব্রতর পরিচয় হয়। বিলাতের অভিজাত সমাজে অ্যাষ্ট্রোলজার রেভারেণ্ড ম্যাকের ভারি সুনাম। কিন্তু তাঁহার পরিশ্রমিকের হার এরূপ পর্য্যাপ্ত যে, ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে তাঁহার দ্বারস্থ হওরা দুঃসাধ্য। সঞ্চিত সমস্ত অর্থের উপর আরও কয়েক শত পাউণ্ড ঋণ করিয়া তাহার বিনিময়ে সত্যব্রত পিতার সম্বন্ধে আইরিস জ্যোতিষীব যে গণনা-ফল সংগ্রহ করে, তাহা আরও জটিল ও রহস্যময় হইয়া উঠে। জ্যোতিষী জানাইলেন, সত্যব্রতর পিতা বাঁচিয়া আছেন, কিন্তু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড বা আয়র্ল্যাণ্ডের কোথাও নাই— অ্যাটল্যান্টিক মহাসমুদ্রের অন্তর্গত কোন দ্বীপে তিনি স্বাস্থ্য-সঞ্চয়েব জন্য বসবাস করিতেছেন। সত্যব্রতর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সত্যব্রত জ্যোতিষীর নিকট মহাসাগরবর্ত্তী দ্বীপটির নাম জানিতে চাহিলে জ্যোতিষী বলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পৃথক গণনা করিতে হইবে, পৃথক গণনার জন্য পারিশ্রমিকও স্বতন্ত্র। কিন্তু সত্যব্রত তখন রিক্ত, ঋণগ্রস্ত। সে অবস্থায় কেমন করিয়া পুনরায় জ্যোতিষীর বিপুল পারিশ্রমিক সংগ্রহ করিবে? রামদুর্গ রাজ্য হইতে নিয়মিত ভাবে মাসিক যে টাকা আসে, তাহাতে ঋণের টাকার সুদ পরিশোধ করিয়া কোনরূপে তাহার পড়াশুনা এবং মেসের খরচ সম্পন্ন হয়। অথচ, পরবর্ত্তী গণনার ফলটি জানিবার জন্য তাহার আগ্রহের অন্ত নাই।

এই চাঞ্চল্যকর মানসিক অবস্থায় সত্যব্রত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সভায় যোগদান করে এবং তথায় কবিতার আলোচনা ব্যাপারে

তাহার পরম প্রতিদ্বন্দ্বী পিনাকীলালের সহিত যে ভাবে সম্প্রীতি ও সন্ধি স্থাপিত হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* *

*

প্রচুর পরিশ্রম ও উদ্যমের সহিত সত্যব্রতর নিকট অধ্যয়ন করিয়া পিনাকী মাস ছয়েকের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষাটি মোটামুটি রকমে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে নূতন একটি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে পিনাকীর অসাধারণ অধ্যবসায় সত্যব্রতকেও চমৎকৃত করিয়াছে। সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য করে—পিনাকীর টেবিলটি বাঙ্গলা কেতাবে ভরিয়া গিয়াছে, বাঙ্গলা সাহিত্যের সহজ-পাঠ্য বইগুলির তালিকা সত্যব্রতর নিকট সংগ্রহ করিয়া ইতিমধ্যেই সে প্রচুর অর্থব্যয়ে ডাকযোগে তাহাদের অধিকাংশই আনাইয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক বইখানি সে যত্ন করিয়া পাঠ করে, দুর্ব্বোধ্য অংশগুলি চিহ্নিত করিয়া রাখে, পরে সত্যব্রতরনিকট হইতে অর্থ বুঝিয়া লয়। শুধু পড়া নয়, সংলাপ ও হস্তলিপি-সম্পর্কেও পিনাকী বাঙ্গালা ভাষার আশ্রয় গ্রহণে অতিশয় সচেতন। সত্যব্রতর সহিত তাহার সকল কথাই বাঙ্গলায় চলে, সেখানে সংলাপে ভুল থাকে—সত্যব্রত সংশোধন করিয়া দেয়। বাঙ্গলা অক্ষরে চিঠিপত্র লিখিতে এবং অন্যের হাতে লেখা বাঙ্গলা চিঠি বা কোন মুসাবিদা পড়িতে তাহার উৎসাহের অন্ত নাই। অভ্যাসের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাঙ্গলা টানালেখা পড়িতে এবং তদনুকরণে লিখিতেও অল্পবিস্তর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু রহস্যের বিষয় এইটুকু যে, শিক্ষাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া উভয়ের ঘনিষ্ঠতা ইদানীং বৃদ্ধি পাইলেও, অন্তর-মহলের দরজাটি কেহই এ পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত করে নাই। পিনাকী জানে, সত্যব্রত কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, দেশে তাহার বহু পরিজন বর্ত্তমান। আর, সত্যব্রত শুনিয়াছে, পিনাকীর পিতা সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ, পিনাকীর আপনার বলিতে সংসারে কেহ নাই; ঘটনাচক্রে বোম্বাইবাসী হইলেও—তাহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বাঙ্গালী, বাঙ্গলার বাসীন্দা। পিনাকী মনে মনে ভাবে, আমার পরিচয় সম্বন্ধে যেমন ধাপ্পা দিয়াছি, সত্যব্রতও তাহার যে পরিচয় দিয়াছে—তেমনি যদি মিথ্যা হয়? সত্যব্রতও পিনাকীকে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই, সন্ধোধৃত বিষধর সর্পের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অহিতুণ্ডিক যে ভাবে তাহাকে লইয়া খেলা করে, সত্যব্রতও পিনাকীর দিকে সেইরূপ সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া ঘনিষ্ঠতা করিয়া থাকে। নিজের দিকে চাহিয়া সত্যব্রত বুঝিয়াছিল—যে পরিচয় পিনাকী ব্যক্ত করিয়াছে, তাহার পশ্চাতে আরও কিছু প্রচ্ছন্ন আছে। কিন্তু তাই বলিয়া পিনাকীর শিক্ষা-ব্যাপারে সে কোনরূপ কপটাচরণ করে নাই। সত্যব্রতর ধারণা—শত্রু যদি বিদেশী বা ভিন্নভাষী হয়, তাহাকে নিজের ভাষায় কৃতবিদ্য করায় লোকসান কিছু নাই। তাই সে অকপটেই পিনাকীকে বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার সহজ পথগুলি দেখাইয়া দিয়াছে। তবে ইহাও সত্য যে, উভয়েই উভয়ের রুদ্ধ অন্তরদ্বার গোপনে উদ্‌ঘাটিত করিতে একান্ত আগ্রহশীল এবং তজ্জন্য কৌশল প্রয়োগ ও সুযোগ সন্ধানে সর্ব্বদাই সচেতন।

আগেই বলা হইয়াছে—লণ্ডন সহরের অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে

Estd 1902
RAJU. HOWRAH
১১১১৮
৩১৫৪

গাওয়ার ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীর দোতালায় ছোট একখানি কামরা ভাড়া করিয়া পিনাকী সেখানে তাহার একটি স্বতন্ত্র আস্তানা পাতিয়াছে। নিজের পরিচয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রাদি তথায় সুরক্ষিত। ব্যাঙ্ক, পোষ্টআফিস, পলিটিক্সের প্রফেসর প্রভৃতির সহিত যাহা কিছু কাজকর্ম্ম সমস্তই উক্ত বাসা হইতে এমন সন্তর্পণে সে সম্পন্ন করিয়া থাকে যে, ইণ্ডিয়া কলেজের কোন ছাত্র ঘুণাক্ষরেও তাহার কিছুই জানিতে পারে না। পক্ষান্তরে, পোষ্টআফিস বা ব্যাঙ্কের সহিত সত্যব্রতর কোন সংশ্রব রাখিবার প্রয়োজনই হয় নাই। প্রতি মাসে রামদুর্গ রাজ্যের বৃত্তি সে লণ্ডনস্থ এজেণ্টের আফিস হইতেই গ্রহণ করে। মন্ত্রী আনন্দময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন নগরীতে রামদুর্গরাজ্যের তরফ হইতে রেসিডেণ্ট সাহেবের মধ্যস্থতায় কোন ইংরাজ কর্ম্মীকে এজেণ্ট নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। এজেণ্টের ব্যবস্থায় রামদুর্গরাজ্যের বিভিন্ন পণ্যরাজি বিলাতের বাজারে সরাসরি নীত হইয়া রাজ্যের আয় প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ফলে, লণ্ডনের সওদাগরী অঞ্চলে উক্ত এজেণ্টের আফিসও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সত্যব্রত রামদুর্গ রাজ্যের সরকারের নির্দ্দেশমত এজেণ্টের আফিস হইতেই তাহার বৃত্তির টাকা গ্রহণ করিত এবং রাজ্যের সরকার—তথা, প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশে অধ্যয়নাদি সম্বন্ধে মাসিক রিপোর্ট এজেণ্টের আফিসের মারফতেই দাখিল করিতে হইত। সুতরাং ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট আফিসের সাহায্য লইবার কোন প্রয়োজনই এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। পিনাকী অনেক চেষ্টা করিয়াও এই এজেন্সী সংক্রান্ত আস্তানাটির কোন সন্ধান পায় নাই। অথচ, সে ভাবিয়া পাইত না যে, সত্যব্রতর

বিলাতবাস ও পড়াশুনার খরচ কে যোগায়, কোথা হইতে প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে তাহার নিকট খরচের টাকা আসে! সংগোপনে ও সন্তর্পণে সত্যব্রতর অনুসরণ করিয়াও তাহার অপর কোন গুপ্ত আস্তানা আবিষ্কার করিতে পারে নাই সে। তাহার কারণ এই যে, সত্যব্রত কলেজ বা কটেজ হইতে সরাসরি এজেণ্টের আফিসে কখন যাইত না, প্রয়োজন হইলে কলেজ হইতেই সেখানে রওনা হইত। মনে মনে উভয়েই লুকাচুরি খেলিত বলিয়া, কেহ কাহাকেও প্রাণ খুলিয়া প্রত্যয় করিতে পারিত না। সত্যব্রতর লুকাচুরির মূলতত্ত্ব আর কিছু নয়— পাছে তাহার অজ্ঞাতবাসের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, মাতামহ রাজীবলোচন সন্ধান পাইয়া তাহাকে বিরক্ত করেন। আর, পিনাকীর আশঙ্কা এই যে, তাহার বংশপরিচয় কোন সূত্রে যদি এই অতিরিক্ত চতুর বাঙ্গালী ছেলেটি জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কঠোর সাধনায় হয়ত একদিন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

কিন্তু উভয় পক্ষ অতিমাত্রায় সতর্ক থাকা সত্ত্বেও একদিন সহসা এক পক্ষের সামান্য শিথিলতায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল।

সেদিন পিনাকীর টেবিলের বিপরীত দিকে বসিয়া সত্যব্রত তাহাকে একটা কঠিন কবিতার অর্থ বুঝাইয়া দিতেছিল। পিনাকী কিন্তু সত্যব্রতর ব্যাখ্যায় মন নিবিষ্ট করিতে পারে নাই, তাহার দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্যব্রতর জামার বুকের পকেটে রক্ষিত লেফাফাটির দিকে নিবদ্ধ ছিল। লেফাফার আয়তনটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ থাকায় পকেটের এলাকা ছাপাইয়া উঠে। উপরের ঐ অংশে লাল কালিতে দেবনাগরী অক্ষরে 'ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্' এই সংস্কৃত বচনটি মুদ্রিত ছিল। পিনাকীর

মনে হইল, সত্যব্রতর পকেটের চিঠিখানার একাংশে মুদ্রিত এই কয়টি শব্দ তাহার চোখের উপর আলপিনের খোঁচা দিতেছে। লেফাফা-খানির রঙ, আর তাহাতে সংস্কৃত বাক্যটির সংস্থানের বৈশিষ্ট্য পিনাকীর ত অপরিচিত নয়; রামদুর্গ-সরকারের সেরেস্তার যাবতীয় কাগজপত্রে এই শব্দটি মুদ্রিত হইয়া থাকে। পরিচিত বস্তুটির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া পিনাকী ভাবিতেছিল, যে রাজ্যের সহিত একদিন তাহাকে বোঝাপড়া করিতে হইবে, সেই রাজ্যের সরকারের লেফাফা সত্যব্রতর পকেটে আসিল কি করিয়া? একবার তাহার মনে হইল, সত্যব্রতকে কথাটা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পরক্ষণে তাহার রাজনৈতিক গুরুর উপদেশ মনে পড়িয়া গেল—'কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে সে সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিবে না, গোয়েন্দার মত গোপনে সন্দিগ্ধ বস্তুটির পিছু লইয়া কৌশলে তাহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবে।' পিনাকী তৎক্ষণাৎ শক্ত হইয়া সত্যব্রতর ব্যাখ্যা শুনিতে মনোযোগ দিল।

সত্যব্রতও লক্ষ্য করিতেছিল, পিনাকী পাঠে যেন তেমন মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছে না। সহসা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল: ব্যাপার কি হে, পড়ায় যে আজ মন বসছে না?

পিনাকী বুঝিল, সে ভারি একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে; মুখও চোখের ভঙ্গিকে সামলাইতে পারে নাই। তাড়াতাড়ি উত্তর দিল: একটা কথা খালি মনে পড়ছে, অথচ বলতে পারছি না, তাই পড়াতেও মন বসছে না। কথাটা কিন্তু তোমার সম্বন্ধেই ব্যানার্জ্জী।

মৃদু হাসিয়া সত্যব্রত কহিল: আমার সম্বন্ধেই যদি, বলতে বাধছে কেন, বলেই ফেল না বন্ধু!

তৎক্ষণাৎ মুখখানা প্রফুল্ল করিয়া পিনাকী কহিল : কথা ছিল, বিদ্যাটি মোটামুটি রকম শিখতে পারলেই একটা দক্ষিণা তোমাকে দিতে হবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তুমি কিছুই পাও নি, চাওনিও কোনদিন। এখন হয়েছে কি, বাবা সব কথা শুনে আমাকে খোঁচা দিয়ে লিখেছেন—'গুরুর কাছ থেকে কাজ আদায় করছ, অথচ গুরুদক্ষিণা দিচ্ছ না, এটা ঠিক নয়। তাঁকে আগে খুসি করা চাই, আর আমি শুনে ভারি খুসি হয়েছি যে তিনিও বাঙ্গালী। তিনি কি চান জিজ্ঞাসা করবে, জেনে আমাকে লিখবে, আমি তার ব্যবস্থা করবো' এখন বল, কি দিয়ে তোমাকে খুসি করি ?

সত্যব্রতর সুন্দর মুখখানি স্বচ্ছ হাসিতে ভরিয়া গেল, কহিল : গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা যদি করতে চাও, সে ত ভাল কথা হে! আর, ব্রাহ্মণের এটা উঁচুদরের পেশাও বটে। তবে আমার খাঁই কিন্তু আরো উঁচুদরের ; পারবে মেটাতে ?

পিনাকী কহিল : দেনেওলা ত আমি নই ব্যানার্জ্জী, তবে ভাবনা কিসের ? তুমি বলবে, আমি জানাবো, আর আমার বাবা দেবে ; এই ত ব্যাপার। বেশ ত' বলো—

সত্যব্রত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর মনটি স্থির করিয়া লইয়া কহিল : আমার দক্ষিণা হচ্ছে গোটাকয়েক গণনার দক্ষিণা। জ্যোতিষী রেভারেণ্ড মিষ্টার ম্যাকের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ ?

ম্যাকের নাম শুনে নাই এমন লোক সে সময় ইংলণ্ডে বোধ হয় কেহই ছিলেন না ; পিনাকী যে শুধু এই বিখ্যাত গণকের দেশবিশ্রুত নামটির সহিত পরিচিত তাহা নহে, সে বিলাতে আসিয়াই মোটা

দক্ষিণা দিয়া তাহার ভাগ্যলিপি সর্ব্বাগ্রে এই অতিমানুষটির মুখে শ্রবণ করিয়াছে এবং প্রয়োজন পড়িলেই তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া থাকে। কিন্তু সত্যব্রতর প্রশ্নের উত্তরে অম্লানবদনে জানাইল: জ্যোতিষী ম্যাক! এ নাম শুনেছি বলে ত মনে হচ্ছে না।

সত্যব্রত কহিল: ভারি আশ্চর্য্য ত, তুমি য়্যাষ্ট্রলজার ম্যাকের নাম শোননি?

অসঙ্কোচে পিনাকী উত্তর দিল: শুনে হয় ত থাকবো, কিন্তু মনে নেই। তার কারণ, জ্যোতিষ আমি মানি না, গণনা আমি বিশ্বাস করি না। আমার কথা থাক, এখন তোমার কথাই বল।

সত্যব্রত কহিল: তাঁর ফী জান ত, একশো পাউণ্ডের কমে কোন প্রশ্নের উত্তর দেন না। আমি ঐ ফী দিয়েই তাঁর কাছে গোটা কয়েক প্রশ্ন গণিয়ে ছিলুম। তা'তেই আমার পুঁজীপাটা ফুরিয়ে গেছে। অথচ এখনো গোটা তিনেক কথা গণাতে হবে।

পিনাকী ক্ষিপ্রকণ্ঠে কহিল: তিনটে প্রশ্নের ফী তোমার চাই—এই ত? বেশ, আজই আমি বাবাকে চিঠি লিখছি। এক মাসের ভিতরেই ফীয়ের টাকা তুমি পাবে।

* *

*

কিন্তু এক মাসের মধ্যেই পিনাকী এ সম্বন্ধে আটঘাট বাঁধিয়া যে কাজগুলি পাকা করিয়া ফেলিল, তাহাতে বৈষয়িক বুদ্ধিতেও তাহার পটুতা যে কতখানি বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যে দিন সত্যব্রতকে সে

কথা দিল, তাহার পরদিনই সে রেভারেণ্ড ম্যাকের সহিত সাক্ষাৎ করিল। আগেই বলা হইয়াছে—ম্যাকের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতাই ছিল। পিনাকীকে দেখিয়াই জ্যোতিষী ম্যাক আদর করিয়া বসাইলেন। ম্যাক বুঝিয়াছিলেন, কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি এই ভারতবাসী হইতে তাঁহার কারবারটির প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হইবে। পিনাকীও বুঝিত, যাহারা পেশাদার গণকের উপর প্রচুর আস্থা রাখে, গণককে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের মনের খবর সংগ্রহ করাও সহজ হইতে পারে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সে ম্যাকের নিকট প্রস্তাব তুলিল যে, ম্যাকের এজেণ্টরূপে সে কাজ করিবে, অনেক গ্রাহক জুটাইয়া দিবে, আর সেই সঙ্গে নিজেও ম্যাকের নিকট গণনা শিখিবে। প্রস্তাবটির সঙ্গে সঙ্গেই একশো পাউণ্ডের একখানি চেক দাখিল ক'রয়া কহিল: এটা আপনার ফী, আমাকে আপনার গণনা বিদ্যা শিখাবেন ব'লে আগাম এটা দিচ্ছি। শিক্ষা শেষ হলে আরও হাজার পাউণ্ড দেব। তাছাড়া হাজার হাজার পাউণ্ডের কাজও আপনি আমার হাত দিয়ে পাবেন। ম্যাক খুসী হইয়া পিনাকীকে তাহার সাকরেদ করিয়া লইলেন। এরূপ একজন তুখড় ভারতবাসী যদি তাহাব সঙ্গে থাকে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জ্ঞাত হইবার তিনি সুযোগ পাইবেন, ক্ষান্তরে ভারতীয়দের মধ্যে তাঁহার পসারও বাড়িবে। ফলে, পিনাকীকে এই মর্ম্মে এক একরারনামায় স্বাক্ষর করিতে হইল যে, পিনাকী ম্যাকের গণনাপদ্ধতির রহস্য জ্ঞাত হইলে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না এবং গ্রেটব্রিটেনের মধ্যে সে কখন এই ব্যবসায়ে ব্রতী হইতে পারিবে না।

সেইদিন হইতেই একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া পিনাকী ম্যাকের সাকরেদী শুরু করিয়া দিল। পনের দিনের মধ্যেই সে মোটামুটি রকমে ম্যাকের গণনাকৌশল শিখিয়া ফেলিল। পিনাকী বুঝিল, অর্থ থাকিলে এবং ক্ষেত্র বুঝিয়া তাহা খরচ করিতে জানিলে অসাধ্য সাধন করা কঠিন নহে। তাহার পিতা প্রতি পত্রেই তাহাকে জানাইয়া আসিতেছেন যে দুই হাতে টাকা ছড়াইয়া সকল বিষয়েই ওস্তাদ হইতে হইবে। দুইচক্ষু বুজাইয়া পিনাকী তিন লক্ষ পরিমিত টাকা স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিতে পারে। এই জন্য তিনি 'ব্যাঙ্ক অফ লণ্ডনে' পিনাকীর নামে চলতি হিসাবে তিন লক্ষ টাকা জমা দিয়াছেন। পিনাকীও প্রয়োজন বিচার করিয়া এবং ভবিষ্যতের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া খরচ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সে এখন বুঝিতে পারিয়াছে—পলিটিক্স (রাজনীতি) ম্যাজিক (যাদুবিদ্যা) এবং য়্যাষ্ট্রলজি (জ্যোতিষ) তিনটিই যখন ধাপ্পাবাজী এবং সাধারণকে মাত করিতে ব্রহ্মাস্ত্র, তখন তাহার মত শিক্ষানবীসের উচিত এই তিনটি বিদ্যাতেই পারদর্শী হওয়া। তাহা হইলে ভারতবর্ষে ফিরিয়া এগুলির সাহায্যে এক অদ্ভুত রাজনীতিক খেলা দেখাইয়া সে ভারতবাসীকে অবাক করিয়া দিবে।

পনের দিন পরেই পিনাকী পাঁচশত পাউণ্ডের আর একখানি চেক ম্যাকের দক্ষিণা হিসাবে দাখিল করিয়া কহিল: ভারতীয়দের প্রশ্ন গণনার ফাইলগুলো আমি দেখতে চাই। যদি তাদের মধ্যে বিলেতে কেউ থাকে, আর এক দফা ঘায়েল করা যাবে এমনি একটা ফন্দী আমি ঠিক করেছি।

ম্যাক সহাস্যে তাহার হাতে আলমারির চাবিটি দিয়া কহিলেন:

প্রত্যেক ফাইলের উপরে গ্রাহকের নাম ঠিকানা টাইপ করা আছে, নাম পড়ে তুমিই বেছে নাও।

সুরক্ষিত ফাইলগুলিব ভিতর হইতে ভারতীয়দের নামযুক্ত ফাইল-কয়টি বাহির করিতে পিনাকীকে বেগ পাইতে হইল না। ইহাদের ভিতরে সত্যব্রতর ফাইলটিও পাওয়া গেল। ফাইলের সঙ্গেই গ্রাহকের প্রশ্ন ও উত্তরের নকলগুলি টাইপ করা ছিল। সত্যব্রতর প্রশ্নগুলি পড়িয়া পিনাকী ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তাহার অন্তরটি তখন বিস্ময়ে ভরিয়া গিয়াছে, জ্যোতিষের ফাইলের প্রশ্ন কয়টি যেন পিনাকীর চোখে আঙ্গুল দিয়া বলিতেছে—নিজের পরিচয় সম্বন্ধে আগাগোড়াই সত্যব্রত ধাপ্পা দিয়াছে। কস্মিনকালেও সে কলিকাতার অধিবাসী নয়, বাসভূমি তাহার এলাহাবাদ। পিতা নিরুদ্দিষ্ট, তাঁহার সন্ধান-সম্পর্কেই সত্যব্রতর প্রশ্ন।

পরদিন পিনাকী ম্যাককে বলিল: সত্যব্রত ব্যানার্জীকে পাকড়াও করেছি। সে রাজী হয়েছে পরের প্রশ্নগুলো গণাতে, টাকা যোগাড় করছে, আসছে সপ্তাহে আসবে। কিন্তু এবার আজে বাজে বললে ত হবে না, খুব হুসিয়ার হয়ে উত্তর দিতে হবে।

ম্যাক বলিলেন: বেশ ত, এবারের প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমিই দেবে। ট্রিকস্‌গুলো ত শিখেছ, এই ফাইল থেকেই তোমার কাজ শুরু হোক।

পরের প্রশ্নগুলিও সত্যব্রত বলিয়াছিল। তৎকালে উত্তর প্রদত্ত না হইলেও সেগুলি ফাইলের মধ্যেই ছিল। পিনাকী ফাইল হইতে তাহার আবশ্যক মত কথাগুলি পকেটবুকে টুকিয়া লইয়া কহিল: আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব স্যর!

হিংসা ও অহিংসা

রাজনীতি শিক্ষার প্রাক্কালে পিনাকী পরম প্রতিদ্বন্দ্বীর চিত্তজয় করিবার সন্ধান পাইয়াছিল, জ্যোতিষ শিক্ষার ফলে সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সত্যকার পরিচয় পাইল। কিন্তু তাহার গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত গণনা-বিদ্যা উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর পকেটের সেই মুদ্রাঙ্কিত পত্রখানির কোন সন্ধান দিতে পারিল না। তবে কি সত্যব্রত রামদুর্গ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী আনন্দময় রাজপণ্ডিত অথবা শিক্ষা-সচিব মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীর কোন নিকট আত্মীয়? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? পিনাকীর রাজনীতির নির্দ্দেশ—যাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন, প্রশ্নের বিষয় সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গ তাহার সমক্ষে তুলিবে না; সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া দিবে, উত্তর পাইতে বিলম্ব হইবে না।

অথচ রামদুর্গ সরকারের মুদ্রাঙ্কিত সেই লেফাফাখানির সহিত সত্যব্রতর কি সম্বন্ধ, এই প্রশ্নটির উত্তর না পাইলে সত্যব্রতর শেষ প্রশ্নের উত্তর রচনাটিও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং যেমন করিয়া হউক, সমস্যাটির সমাধান করা চাইই।

ইতিমধ্যে ইউনিভার্সিটি কলেজের বার্ষিক অভিনয় উৎসব ইণ্ডিয়া কটেজের ছাত্রদিগকে মাতাইয়া তুলিল। নাটকের মহলা যখন শুরু হয়, উদ্যোগীরা সহপাঠী পিনেসকে ছোট একটি ভূমিকায় নামাইবার জন্য বহু চেষ্টা করে, কিন্তু পিনাকী চাঁদার হার বাড়াইয়া দিয়া এই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। অভিনয় সম্বন্ধে পিনাকীর রাজনীতিক গুরু উপদেশ দিয়াছিলেন—'যাঁরা রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তাঁরাই হচ্ছেন বাস্তব অভিনেতা। বাঁধা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা এক একটা বিশেষ ভূমিকার অভিনয় করে থাকেন, কিন্তু রাজনীতিক অভিনেতাকে

দেশের খোলা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সব রকম ভূমিকার অভিনয় করতে হয়।' সুতরাং পিনাকীকে মনে মনে তাহারই মহলা দিতে হইতেছে সর্ব্বক্ষণ, নকল অভিনয়ে যোগ দিবার অবসর তাহার কোথায় ?

অভিনয়ের পূর্ব্ব দিন ইণ্ডিয়ান কটেজের ডিনারের টেবিলে পিনাকীকে লইয়া ছেলেদের মধ্যে বিতর্ক চলিতেছিল। টম বলিল: আমাদের আশা ছিল, পিনেস একটা পার্ট নিয়ে অভিনয়টি জাকিয়ে দেবে। কিন্তু কিছুতেই ওকে রাজী করাতে পারা গেল না।

হেনরী বলিল: আমারা ভুল করেছি গোড়াতেই, পিনেসকে না ধরে মিস্ বাটারফ্লাইকে ধরলেই কাজ হ'ত।

মিস এলাই তখন আহার্য্য পরিবেশন করিতেছিল; কথাটা শুনিবামাত্র মুচকি হাসিয়া কহিল: কিচ্ছু হত না। আমি সেই মেয়ে কিনা, তোমরা মিষ্টার পিনেসকে সঙ সাজিয়ে ষ্টেজে নামাবে আর আমি তাতে প্রশ্রয় দেব ? 'নেভার'—কখন নয় !

আরউইন জিজ্ঞাসা করিল: এ কথার মানে ? মিষ্টার পিনেস ষ্টেজে নামলে সঙ হবেন কেন ? তিনি নিশ্চয়ই অভিনেতার সম্মান পাবেন।

মুখখানি গম্ভীর করিয়া এলাই উত্তর দিল: তাতে আমাদের আনন্দটাই মাটি হবে। তার কারণ, মিষ্টার পিনেস হচ্ছেন বাস্তব অভিনেতা, আমারা প্রত্যহই এখানে ওঁর অভিনয় দেখেছি, এই দেখাটাই হচ্ছে স্বাভাবিক; ষ্টেজে নেমে উনি যা দেখাবেন—সেটা অস্বাভাবিক, আমি তাতে রাজী নই।

পাঁচ সাতটি ছেলে এক সঙ্গে উল্লাসের স্বরে ধ্বনি তুলিল: হুররে !

ভবানীশঙ্কর কহিল : শুনলে ত, মিস বাটারফ্লাই মিষ্টার পিনেসকে কিভাবে চিনে ফেলেছে ? আমাদের খাবার পরিবেষণ করতে করতেই সে পিনেসের স্বাভাবিক অভিনয় দেখে, আর তাতে তন্ময় হয় !

এলাই কহিল : নিশ্চয়। কথাটা আমি হাতে কলমেই প্রমাণ করে দিচ্ছি। তোমরা ত কত রকম ভঙ্গি করছ, কত কি বলছ, কিন্তু চেয়ে দেখ মিষ্টার পিনেসের পানে—সব শুনছেন, অথচ গায়ে মাখছেন না, মুখখানায় কি সুন্দর স্বাভাবিক ভঙ্গি !

পিনাকীর পাশের আসনেই ছিল সত্যব্রত। এখন আর ভোজের টেবিলে এই দুইটি ছেলের কলহ ও বিতর্ক হলটিকে মুখরিত করিয়া তুলে না। ইহাদের মধ্যে হঠাৎ ভাব হইয়া যাওয়ায় অন্যান্য ছেলেরা অস্বস্তি বোধ করে। এখন মিস এলাইকে উপলক্ষ করিয়াই ছেলেরা পিনাকীকে তাতাইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু পিনাকীও রীতিমত সংযত হইয়াছে। সুতরাং ছেলেদের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই।

এলাইয়ের কথাটা শুনিয়া সত্যব্রত আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, পিনাকীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল : শুনছ হে পিনাকী, তোমার বাটারফ্লাইয়ের কথা ? আর চুপ করে থাকা ঠিক নয়, মুখ খোল বন্ধু, অন্ততঃ মুখের ভঙ্গিটা একটু অস্বাভাবিক কর।

পিনাকীর মুখেও হাসি ফুটিতে দেখা গেল। সম্ভবত, এলাইয়ের কথাগুলি তাহার মনে ধরিয়াছিল। মিস্ এলাই যেন তাহার মনের কথাগুলিই টানিয়া বলিয়াছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া এবং মুখের উচ্ছ্বসিত হাসি দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে ভরাইয়া এলাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিল : ধন্যবাদ, মিস্ বাটারফ্লাই !

ক্লেভারিং নামে ছেলেটি জোরে হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল—বাঃ! এই ত সত্যিকার অভিনয়; মিষ্টার পিনেস দেখছি সত্যই খাসা অভিনেতা!

হেনরী কহিল: সুতরাং এঁর মতন সমজদার ছেলেকে দর্শকরূপে পাওয়াটাও ভাগ্যের কথা। আশা করি, মিষ্টার পিনেস আমাদের অভিনয়ের নিরপেক্ষ সমালোচনা করবেন।

পিনাকী কহিল: বেশ, তাতে রাজি আছি।

কিন্তু অভিনয়ের দিন দুপুরের পর হইতেই পিনাকী হঠাৎ এমন ডুব দিল যে, ছেলেরা তাহার কোন সন্ধানই পাইল না। পিনাকী ব্যতীত ইণ্ডিয়া কটেজের ছেলেরা সব চলিয়া গেল। অভিনয়ের পর অন্যান্য বিবিধ আমোদ প্রমোদের আয়োজন এবং রাত্রিভোজনের ব্যবস্থা থাকায় তাহারা স্থির করিয়াছিল—অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সকলে উৎসবস্থলেই অতিবাহিত করিবে, কটেজে আর ফিরিবে না। এলাই পিনাকীকে বলিয়া রাখিয়াছিল যে, সে তাহার সহিত অভিনয় দেখিতে যাইবে। মিসেস ফ্লাণ্ডার্স'ও আমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন; কতিপয় বান্ধবীর সহিত তিনি অনেকটা আগেই বাহির হইয়া পড়েন, যেহেতু অন্যত্র তাঁহার কিছু প্রয়োজন ছিল। এলাই মাতাকে বলিয়াছিল, মিষ্টার পিনেস ফিরিলে সে তাহার সহিত যাইবে। পিনাকী তাহার বাহ্যিক বিনয়নম্র আচরণে মিসেস ফ্লাণ্ডার্সে'র শ্রদ্ধাটুকু বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। হঠাৎ এই ছেলেটির প্রতি 'ল্যাণ্ড লেডী'র প্রীতিভাব ইদানীং প্রবলতর হইবার কারণটুকু ছেলেরা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও ল্যাণ্ডলেডীর তরুণী কন্যা চতুরা এলাইয়ের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। বৈষয়িক ব্যাপারে মিসেস ফ্লাণ্ডার্সে'র হাজার দশেক টাকার

বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কিন্তু টাকাটা তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না। কথাটা গোপন থাকে নাই—ছেলেদের ভিতর জানাজানি হয় এবং সে সম্বন্ধে তাহারা কানাকানি করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। পিনাকীর 'পলিটিক্স' তাহাকে এই সুযোগটুকু কাজে লাগাইবার নির্দ্দেশ দেয়। সে একদিন ছেলেদের অজ্ঞাতে এলাইকে ডাকিয়া বলে: 'আমার একটু উপকার করতে পার মিস্ বাটারফ্লাই!'

মুচকি হাসিয়া এলাই উত্তর দেয়: 'সানন্দে; তার কারণ হচ্ছে—তোমার কিছু উপকার করলে সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু উপহারও মিলবে। কি করতে হবে শুনি?'

পিনাকী পরিপার্শ্বটি সন্তর্পণে দেখিয়া লইয়া চাপা গলায় জানায়: 'আমার বাবা ব্যাঙ্কের মারফত হাজার দশেক টাকা পাঠিয়েছেন, ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফেরবার সময় কতকগুলো জিনিস কিনে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু তার ত অনেক বিলম্ব আছে, তাই এগুলো তোমার মার কাছে গচ্ছিত রাখতে চাই—তিনি যদি তাঁর কারবারে টাকাটা খাটিয়ে সুদে বাড়িয়ে দেন।'

কটেজের কোন ছেলে গোপনে এলায়ের সহিত আলাপ করিতে গেলেই মিসেস ফ্লাওার্স যেন বাতাসের কাছেই সে খবর পাইতেন এবং তৎক্ষণাৎ এরূপ সতর্কতার সহিত তাহাদের অলক্ষ্যে পরদার আড়ালে আসিয়া আড়ি পাতিতেন যে, কেহই জানিতে পারিত না। পিনাকীর ব্যাপারেও তিনি এইভাবে পরদার পিছনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি পিনাকীর মুখ দিয়া বাহির হইতেই কন্যা এলাইকে আর উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিতে হয় নাই, মাতাই তাড়াতাড়ি আত্মপ্রকাশ

করিয়া পিনাকীর সুবুদ্ধির প্রচুর তারিফ দিয়া কাজ গুছাইয়া লন। ফলে, এই সাধুপ্রকৃতির ছেলেটির উপর তাঁহার পূর্ব্বের শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে তাঁহার মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইতে থাকে যে, ছেলেটির বাহিরের হালচাল যত সাধারণই হোক না কেন, আত্মিক ব্যাপারে সে কটেজের সকল ছেলের সেরা, আসল পরিচয়টি সে ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া রাখিয়াছে এখন সেটি বাহির করিতে হইবে। পিনাকীর পিছনের প্রচ্ছন্ন খবরটি জানিয়া লইবার সম্বন্ধে কন্যাকেও তিনি কিঞ্চিৎ উৎসাহ দিয়াছেন। টাকার মোহ যে মিসেস ফ্লাগুসের মত দৃঢ়চেতা মহিলার চিত্তেও বিভ্রম উপস্থিত করিয়াছে এবং ইহার মধ্যে আরও কোন রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে, এলাই তাহার মাতার অস্পষ্ট কথা ও সুস্পষ্ট মুখভঙ্গিতেই উপলব্ধি করিয়া লয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও সে পিনাকীর নিকট হইতে কোন নূতন তত্ত্ব বাহির করিতে পারে নাই। এলাই বেশ বুঝিয়াছে, পিনাকী ছেলেটি তাহার সংস্পর্শে আসিলে যে উৎসাহে মনের ছিপিটি খুলিয়া দেয়, পিছনের কথা তুলিলেই অমনি তাহার উৎসাহের উজ্জ্বল আলোটি হঠাৎ নিবিয়া যায়। তাই সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে, পিনাকীর নিকট হইতে কথাটা বাহির করিতে না পারিলে সে ব্যানার্জ্জীর সহায়তাই অবশেষে লইবে। কেন না, এলায়ের দৃষ্টিতে ব্যানার্জ্জী ছেলেটি সকল ব্যাপারেই অসাধারণ, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পিনাকীর সহিত তাহাকে ভাল করিয়া একবার বুঝাপড়া করিতে হইবে।

ছেলেদের সখের থিয়েটারের দিনটিতে সেই বুঝা-পড়ার ব্যাপারটি অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়িল। কটেজ একরূপ খালি বলিলেই

হয়, কতিপয় পরিচারক ও পরিচারিকা ব্যতীত মাতব্বরদের কেহই উপস্থিত নাই। মিস এলাই সাজিয়া গুজিয়া প্রজাপতিটির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পিনাকী যে অভিনয় দেখিতে যাইবেনা এবং অভিনয় দেখিতে যাইবার সময়টি অতিক্রম করিয়া কটেজে ফিরিবে, সে বিষয়ে এলাই নিঃসন্দেহ ছিল। সুতরাং পিনাকীর সহিত বুঝাপড়া করিবার একটা পরিকল্পনাও সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় পিনাকী চুপি চুপি কটেজে ঢুকিয়া নিঃশব্দে তাহার কামরার দিকে যাইতেছিল। এলাই পিছু পিছু আসিয়া তাহাকে ধরিল, জোরে একটা ঝাকুনি দিয়া কহিল : কোথায় ছিলে এতক্ষণ বল ত,—থিয়েটার দেখতে যেতে হবে মনে নেই? সেজেগুজে বসে আছি আমি তোমার প্রতীক্ষায় কখন থেকে, যেতে হবে না?

পিনাকীর সর্ব্বাঙ্গ বুঝি আলোড়িত হইয়া উঠিল, হৃদ্‌পিণ্ডটির উপর কে যেন হাতুড়ির ঘা দিল; মুখখানা উঁচু করিয়া সে একটি ছোট উত্তর দিল : না।

ঝঙ্কার দিয়া এলাই কহিল : না! যাবে না তাহলে? কেন শুনি?

পিনাকী কহিল : তবে বলি শোন, তুমি ত জান—হিংসার ত্রিসীমানায় আমি যেতে নারাজ। বেছে বেছে ওরা বই ধরেছে—ম্যাকবেথ, আগাগোড়া যার হিংসা আর রক্তারক্তি ব্যাপার। ও বই আমি দেখতে পারি না। তাই সরে পড়েছিলুম। হ্যাঁ, আমি যাব না তবে তুমি যদি একান্তই যেতে চাও—চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মুখখানা মলিন করিয়া এলাই কহিল : তাহলে আমিও যাব না।

তোমার অহিংসার লেকচার আমার ভারি ভাল লাগে। তার চেয়ে এসো আমরা দুজনে গল্প করি।

পিনাকীর অন্তরটি উল্লাসে ভরিয়া উঠিল, মুখে ফুটিল হাসির গভীর রেখা। এলায়ের হাত হইতে নিজের হাতখানি ছাড়াইয়া সে খপ করিয়া দুইহাতে তাহার কোমল করপল্লবটী চাপিয়া ধরিয়া কহিল: তোমার সুমতি দেখে ভারি খুসি হয়েছি বাটারফ্লাই, আমাদের দুজনের মনেই আজকের রাতের স্মৃতিটা স্মরণীয় হয়ে থাকুক!

খিল খিল করিয়া হাসিয়া এলাই কহিল: সেটা কিন্তু সুখের হবে না মিষ্টার পিনাই। কটেজে আজ আর হাঁড়ি চড়বে না! মাও সেখানে ডিনার খাবেন। আমরা যে যাব না—তিনি ত সেটা জানতেন না! চাকরদের রাতের খানার দাম ধরে দেওয়া হয়েছে।

পিনাকী কহিল: বেশ ত, চল না আমরাও আজ বাইরের হোটেলে খেয়ে আসি।

প্রস্তাবটি এলায়ের খুব ভাল লাগিল; কহিল: বেশ কথা, খাওয়াও হবে, গল্পও চলবে।

ভাল একটি হোটেলে গিয়া ভালভাবে উভয়ের খাওয়াও হইল, গল্পও চলিল, কিন্তু আসল কথাটি পিনাকীর মুখ দিয়া কিছুতেই বাহিল করাইতে পারিল না এলাই। তাহার সেই এক কথা: বাবা গৃহী নন সাধু, হাত পাতলেই টাকা পাই, খাই দাই পড়ি,—এর বেশী কিছু বলবার নেই।

এলাই বিস্ময়ের সুরে বলিল: তোমার বাবা যদি সাধু, অত টাকা পান কোথা থেকে?

পিনাকী উত্তর দিল: সাধুদের আবার টাকার ভাবনা! তাঁদের মনে যে ইচ্ছা হয়, ভগবানকে তখনি তা মেটাতে হয়। তাই, যখনই আমার টাকার দরকার হয়, বাবাকে জানাই আর তিনি পাঠিয়ে দেন।

পিনাকীর মুখের দিকে চাহিয়া ও মুখের ভঙ্গি দেখিয়া এলায়ের মনে হইল—পিনাকী তাহাকে ধাপ্পা দিতেছে, আসল কথা সে চাপিয়া যাইতেছে। সেইজন্য পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিতে হইল: দেশে ফিরে তুমি কি করবে তাহলে—সাধু হবে ত বাবার মত?

ঠোঁঠের কোনে হাসির ঝিলিক তুলিয়া পিনাকী উত্তর দিল: দেশে আমি কস্মিন কালেও যাব না, তোমাদের দেশই আমার দেশ, এই জন্যই ত তোমাকে এত ভালবাসি!

উত্তরটা শুনিয়াই এলায়ের মনটা কে জানে কেন মুসড়াইয়া গেল, আর কোন প্রশ্নই সে করিল না।

প্রফুল্ল মুখে উভয়ে হোটেলে গিয়াছিল, ফিরিবার সময় দেখা গেল, পিনাকীর মুখে একটা সঙ্কল্পের আভা পড়িয়াছে, এলায়ের মুখখানা গম্ভীর।

পরিচারকরা তখন হলঘর গুছাইতেছিল। পিনাকী হলে না ঢুকিয়া এলায়ের হাতখানি ধরিয়া কহিল: বই একখানা দরকার, লাইব্রেরীতে চল, বইখানা খুঁজে বার করতে তোমার সাহায্য চাই, মিস্ বাটারফ্লাই।

কোন আপত্তি না করিয়া এলাই পিনাকীর সহিত লাইব্রেরীতে ঢুকিল। মিসেস ফ্লাওয়ার্স ছেলেদের সুবিধার জন্য নিচের তলায় একখানি লম্বা ঘরে নানাবিধ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এবং দেশ বিদেশের সাময়িক পত্রিকাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবশ্য, এই পাঠাগারের

গ্রন্থাদি ব্যবহারের জন্য ছেলেদের নিকট হইতে স্বতন্ত্র চাঁদা লওয়া হইত, কিন্তু প্রয়োজনের অনুরোধে এই ভারটুকু ছেলেরা বেশ আনন্দ সহকারেই বহন করিত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সমবেশ ইণ্ডিয়া কটেজের এই পাঠাগারটিরও বৈশিষ্ট্য। লাইব্রেরীর গ্রন্থাবলী আদান-প্রদানের ভারটুকু এলাইকেই বহন করিতে হয় এবং ঘরের চাবি তাহার নিকটেই থাকে। এলাই চাবি খুলিয়া যেমন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, পিনাকী তৎক্ষণাৎ দরজার উপব পরদাটি টানিয়া দিয়া অতাকতে অপ্রস্তুত সঙ্গিনীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার আরক্ত ওষ্ঠ পুটে নিজের ক্ষুধিত দুইটি ওষ্ঠ মিলাইতে মুখখানা নত করিল।

বিলাতের বিশিষ্ট ঘরের পনোর-ষোলো বছরের মেয়েরা বালিকার পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকিলেও এলাইয়ের সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও পরিবেশে এই মেয়েটির শৈশব অতিবাহিত হয়, বিলাতের জীবন-যাত্রায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তরুণ বয়স্ক ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশায় কিশোরের সীমাপ্রান্তেই যৌবনশ্রী তাহার তনুলতাটিকে কমনীয়ভাবে মঞ্জুরিত করিয়াই রেহাই দেয় নাই, সেই সঙ্গে যৌবনপথের ভালমন্দ রাস্তাগুলিও তাহাকে চিনিবার সুযোগ দিয়াছিল। কটেজের আটত্রিশটি ছেলের আকৃতি ও প্রকৃতি যে এই মেয়েটি তাহার মনের পাতায় আঁকিয়া রাখিয়াছে—নধর সুন্দর অঙ্গুলিটির আরক্তিম নখরটির দিকে তাকাইলেই দর্পণের মত প্রতিটি ছেলের প্রতিমূর্ত্তি সে যে দেখিতে পায়—এ সন্ধান কিন্তু কেহই রাখে নাই। রাখিলে জানা যাইত, এতগুলি ছেলের মধ্যে

মাত্র দুইটি ছেলে এই অকাল পক্ক মেয়েটির নিকট রহস্যময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! তাহারা হইতেছে…সত্যব্রত ব্যানার্জ্জী ও পিনাকীলাল বারোয়া। মিস এলাই তাহার সমস্ত অন্তরদেশ তোলপাড় করিয়া এবং কমনীয় হাতের রমনীয় নখরযুক্ত আঙ্গুলটির উপর অন্তরদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া এই দুইটি ছেলের প্রকৃতির প্রকৃত রূপটি যেন দেখিতে পায় না—কোথায় যেন ফাঁক আছে, ঝপসা ঠেকে; তাই এই দুইটি ছেলেই এলায়ের নিকট প্রহেলিকাময় হইয়া উঠিয়াছে। এই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে সে যখন জিদ ধরিয়াছে, ঠিক সেই সময় অতি বিনয়ী অতি ভদ্র ও অহিংস ছেলেটি সঙ্কোচ ও লজ্জার মুখোসটি খুলিয়া ফেলিয়া এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল যে, এই কটেজের সর্ব্বাধিক দুরন্ত ও ডানপিটে ছেলে ক্লেভারিংয়ের পক্ষেও কোন দিন যাহা সম্ভব হয় নাই। ।কিন্তু মাথায় উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া এলাই এসময় কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার এক ফন্দী বাহির করিয়া ফেলিল। খপ করিয়া ডান হাতের আঙ্গুল দুইটি এমনভাবে পিনাকীর নাসিকা-বিবরে প্রবেশ করাইয়া দিল যে মুখখানা তাহার তৎক্ষণাৎ উঁচু হইয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে তাহার শিথিল বাহুর আবেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া এলাই হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। হাসির সেই গমকের ভিতর দিয়া তীক্ষ্নস্বরে সে ঝঙ্কার তুলিল: সাধু পুরুষের ছেলের মতই ব্যাহার বটে! ব্যানার্জ্জী যদি কটেজে থাকত, তাহলে এইখানেই আজ ম্যাকবেথ প্লে হয়ে যেত।

নখরাহত নাসিকাটি বিব্রতভাবে টিপিয়া ক্ষুব্ধস্বরে পিনাকী কহিল: ম্যাকবেথের ডাইনি ত সামনে, ব্যানার্জ্জীর কথাটা টেনে আনবার মানে?

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া এলাই উত্তর দিল : তুমি তাহলে সত্যিই কানা, ব্যানার্জ্জীর মতলব যখন জান না। তোমার মতনই সেও আমাকে গাঁথতে চায়, কিন্তু এভাবে ডাকাতি করতে হাত বাড়ায়নি কোনদিন।

পিনাকী যেন আকাশ হইতে পড়িল, তাহার অজ্ঞাতেই বুঝি স্তব্ধ কণ্ঠ হইতে বিস্ময়-বিজড়িত একটা শব্দ প্রশ্নের আকারে বাহির হইল : ব্যানার্জ্জী ?

এলাই কহিল : হ্যাঁ, দুনিয়ায় তোমার যদি কেউ শত্তুর থাকে, সে ঐ ব্যানার্জ্জী। তুমি ত জান, ভারতবর্ষ আর ভারতবাসীকে আমার মা কি রকম ভালবাসেন ? তাঁর ওপরে তুমি অসময়ে মার হাতে অতগুলো টাকা তুলে দেওয়াতে তোমার সুখ্যাতি আর মার মুখে ধরে না। ব্যানার্জ্জী সেটা বুঝেছে ; কিন্তু টাকার ব্যাপারটা ত আর জানে না। তাই একটু ফাঁক পেলেই মার কাছে তোমার নামে কত কি বলে, আমাকে তোমার সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে বারণ করে। এর কারণ কি, আর কেউ না বুঝুক—আমি ত আর তোমার মত কানা-বোকা নই—তাই সব বুঝতে পারি।

পিনাকী কহিল : বেশ ত, ব্যানার্জ্জী যদি সত্যিই তোমাকে এত ভালবাসে, তুমিই বা তাতে গররাজী কেন—তাকেই ত ভালবাসতে পার ?

মুখখানি মচকাইয়া এবং দুই চক্ষু দিয়া বিদ্যুৎবর্ষণ করিয়া এলাই কহিল : সাধ করে কি তোমাকে কানা বলি ! মেয়েরা ভালবাসে একজনকে, ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা চেহারা আর রাঙা রাঙা মুখ দেখে অরুচি

ধরে গেছে। মার কাছে তোমাদের দেশের কিষ্টোর গল্প শুনিছি ত, কি কালোই তিনি ছিলেন ; কিন্তু তার ভিতর দিয়ে রূপের যে আলো ফুটে বেরিয়েছিল—তাতে সব মেয়েরা তাঁর জন্যে নাকি পাগল হয়ে উঠতো ; আমিও তাই কালো ভালবাসি, তুমিই আমার সেই 'কিষ্টো' !

বিচিত্রস্বরে কথাগুলি বলিয়া সে এমন ভঙ্গিতে পিনাকীর মুখের পানে তীক্ষ্ণ একটি কটাক্ষ হানিল যে পিনাকী বিহ্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই নখরাহত নাসারন্ধ্রের বেদনা তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিল, মুখখানা ভার করিয়া সে কহিল : থাম, থাম, আর চালাকী করিতে হবে না, ভাল যদি সত্যিই আমাকে বাসতে, তাহলে অমন করে হাত চালিয়ে নাকটা জখম করে দিতে না। তোমাকে আমি চিনিছি।

অতিকষ্টে মুখের হাসি চাপিয়া মুখখানার উপর একটা কৃত্রিম সহানুভূতির চিহ্ন ফুটাইয়া এলাই কহিল : বা-রে, ধর' অমনি দিলেই হল ! তুমি বুঝি আমাকে তেমনি মেয়ে পেয়েছ ? আমি ত তোমাকে ভালবাসি নিজের মুখেই স্বীকার করছি, কিন্তু তুমি আমাকে কি রকম ভালবাস তার কোন প্রমাণ দিয়েছ ?

পিনাকী কহিল : কি প্রমাণ তুমি চাও ?

এলাই যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল : একটা কাজ যদি তুমি করতে পার আমার কথায়, তাহলে বুঝব সত্যিই তুমি আমাকে ভালবাস।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এলায়ের দিকে চাহিয়া পিনাকী কহিল : তা'বলে

শপথ করতে রাজী নই, কাজটার কথা তুমি বলতে পার, শুনতে আমার আপত্তি নেই ; পারাপারির কথা পরে।

এলাই কহিল : তোমাকে তাহলে মনের কথা খুলে বলি শোন, ব্যানার্জীকে আমি মোটেই পছন্দ করি না, কিন্তু সে সামনে এসে দাঁড়ালেই আমি যেন কেমন হয়ে যাই, তার দৃষ্টি আমাকে তখুনি যাদু করে ফেলে। একটু আগে আমাকে নিয়ে যে কাণ্ড তুমি করতে যাচ্ছিলে, ব্যানার্জী যদি এ রকম কিছু করত, আমি কিছুতেই হাতখানা অমন করে তুলতে পারতুম না তাকে বাধা দিতে। আমার মনে হয় লোকটা যাদু জানে। তোমার বাবা যেমন সাধু পুরুষ, ব্যানার্জীর বাবাও হয়ত তেমনি কোন যাদুকর। বাপের কাছ থেকে সে যাদুবিদ্যে শিখেছে, তাই সকলকে এমন বশ করে ফেলেছে। এখন এই ব্যানার্জীর ভেতরকার খবরটি তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে ;

কথাগুলি যেন পিনাকীর অন্তরের ভিতরটি মোচড় দিয়া তাহাকে তাতাইতেছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পিনাকী কহিল : তার ভিতরের খবর আমি কোথায় পাব—আমি কি গোয়েন্দা ?

মৃদু হাসিয়া এলাই কহিল : কাজ আদায় করতে হলে গোয়েন্দা হতে হয়। তবে আমিও তোমাকে কতক কতক সড়ক-সন্ধান দিতে পারি।

দৃষ্টিতে বিস্ময় ভরিয়া পিনাকী তাহার সঙ্গিনীটির পানে চাহিয়া রহিল, কথা ফুটিল না। মুচকি হাসিয়া এলাই কহিল : অবাক হয়েছ বুঝিছি, কিন্তু আমি বাজে কথা বলিনি। এখন কাজের কথা শোন—ব্যানার্জীর কালো রঙের বড় ট্রাঙ্কটির ভিতরে বাদামী রঙের চামড়ার

একটা ব্যাগ আছে, সেটি কাগজপত্রে ভরা। কটেজে যেদিন ছেলেরা কেউ থাকেনা, কিম্বা রাত্তিরে সকলে যখন ঘুমোয়, সে ঐ ব্যাগটি খুলে কাগজপত্রগুলো পড়ে, আর একটা নীল রঙের খাতায় কি সব লেখে। আজ ব্যানার্জ্জী তাড়াতাড়িতে ট্রাঙ্কের চাবি ফেলে গেছে। আমি সেটি হাতিয়েছি। ব্যানার্জ্জীর হাড়হদ্দ জানবার এমন সুবিধের দিন আর পাবে না। এখন আমার কথা এই—যদি তুমি গোয়েন্দাগিরি করে ব্যানার্জ্জীর ভেতরকার খবরটি আমাকে দিতে পার, তবেই বুঝব সত্যি তুমি আমাকে ভালবাস।

এই অপ্রত্যাশিত বার্ত্তায় পিনাকীর মনরাজ্যে বুঝি উল্লাসের একটা আবর্ত্ত বহিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে এলায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিবিড় হইয়া পূর্ব্বের ক্ষোভটুকুও নিশ্চহ্ন করিয়া দিল। কিন্তু মুখের ভঙ্গিতে মনোভাবের কোন ছায়া পড়িল না, বরং সেখানে সন্দেহের আভা ফেলিয়া সে প্রশ্ন করিল : তাতে তোমার কি লাভ ?

মুখখানা উঁচু করিয়া এলাই উত্তর দিল : লাভের কথা খুলে বলতে হবে ? ওর ভেতরটা যদি আমরা জানতে পারি, কোন গলদ যদি সেখানে খুঁজে পাই—তাতেই ব্যানার্জ্জীকে মাত করে দেব, যতবড় যাদুকরই ও হোক না কেন ! তখন দেখবে—শুধু ইণ্ডিয়া কটেজ কেন, গ্রেটব্রিটেনের কোথাও ওর জায়গা হবে না। তাহলে আর দেরী কেন, চল খানাতাল্লাস শুরু করা যাক, চাবি আমার কাছেই আছে।

মনের কৌতূহল দমন করিয়া পিনাকী এলায়ের প্রস্তাবে নীরবেই সম্মতি দিল। বিলাতের ঝুনো রাজনীতিকের শিক্ষা ইণ্ডিয়া কটেজের এই কিশোরী কন্যাটির কূটবুদ্ধির চালে মাত হইয়া গেল।

ট্রাঙ্কটি খোলা হইলে দেখা গেল, এলায়ের কথিত বাদামী রংের চামড়ার ব্যাগটি অন্যান্য জিসিপত্রের নিচে ট্রাঙ্কের তলদেশে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ব্যাগের মুখ ক্লিপে আঁটা, চাবির ব্যবস্থা নাই। ব্যাগটি খুলিতেই এক তাড়া চিঠি এবং বইয়ের আকারে একখানি খাতা পাওয়া গেল। তাহার গোড়া ও শেষের দিকের কতিপয় পাতা পড়িতেই পিনাকী বুঝিতে পারিল, সত্যব্রত তাহাতে তাহার জীবনের সকল কথা ও কাহিনী—ইংলণ্ডে রওয়ানা হইবার দিনটি পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এই খাতার পাতাগুলির ভিতরে এই চাপা ছেলেটির অতীত জীবনের সকল পরিচয়ই পাওয়া যাইবে। ভারতবর্ষ পরিত্যাগের দিনটি অবধি জীবনের ঘটনাগুলি এই খাতায় শেষ করিয়া সে এই ভাবে ব্যাগে ভরিয়া ট্রাঙ্কের তালায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। ইংলণ্ডে প্রবাস-জীবনের রোজনামচাগুলি সম্ভবতঃ তাহার পাঠ্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যেই অথবা ব্যবহার্য্য সুটকেসের ভিতর নিশ্চয়ই সুরক্ষিত আছে। তাহা বাহির করিয়া পড়াটা তেমন কঠিন নহে। কিন্তু বাঙ্গলা টানা লেখা পড়িতে পিনাকী কতকটা অভ্যস্ত হইলেও এতবড় খাতাখানির এতগুলি পাতা রাতারাতি পড়িয়া ফেলা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তাহা ছাড়া ডায়েরীর সহিত এক-তাড়া চিঠিও পাইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বাঙ্গলায় লেখা, কিছু কিছু ইংরাজীও আছে। পিনাকী ভাবিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে, অপ্রত্যাশিত এই সুযোগটুকু কি ভাবে তাহার কাজে লাগাইবে?

এলাই নীরবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিনাকীর পানে চাহিয়াছিল, এখন জিজ্ঞাসা করিল: দেখা হল ত, কি বুঝলে?

পিনাকী উত্তর দিল : দেখছ না, লেখাগুলো বাঙ্গালায়, এত শীগ্‌গীর কি করে বুঝব ?

এলাই কহিল : কেন, তুমিও ত বাঙ্গলা শিখেছ।

পিনাকীর চক্ষুতে বিস্ময়ের আভা দেখিয়া সে হাসিয়া কহিল : আমি সব জানি মশাই, তুমি লুকুলে কি হবে ? ব্যানার্জ্জী আমাকে সব কথাই ভেঙ্গে বলেছে—কেন তুমি বাঙ্গলা শিখছ, ব্যানার্জ্জীকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী জেনেও 'ডুয়েল' না লড়ে কেন তাকে গুরু বলে মেনে নিয়েছ, আমি সবই তার জানি।

এলায়ের কথাগুলি যেন জলন্ত দীপশলাকায় মত পিনাকীয় মস্তিষ্কে ছেঁকা দিল। মনের প্রচ্ছন্ন সঙ্কল্প পলকে বুঝি ডিনামাইটের মত ফাটিয়া পড়িবার জো হইল।

সত্যব্রতর সহিত তাহার কথা ছিল যে, তাহাদের মিলন ও শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ত্তের কথা কেহ কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না,—কিন্তু এই মেয়েটাকে বাগাইবার জন্য সে কিনা কথাটা ফাঁস করিয়া দিয়াছে ! যে মিথ্যা গল্পটি বলিয়া সে সত্যব্রতর অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছিল তাহার পূর্ব্বপুরুষকে বাঙ্গালী সাজাইয়া—এ কথাও ত তাহা হইলে সে চাপিয়া রাখে নাই ? কি বিশ্বাসঘাতক ! কিন্তু পরক্ষণেই রাজনীতিক গুরুর উপদেশ স্মৃতিপথে ঝটিকার বেগে আসিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ সংযত করিয়া দিল, অমনি সে মুখে কৌতুকের হাসি ফুটাইয়া বলিয়া উঠিল : বল কি, ব্যানার্জ্জী তোমাকে সব কথাই ভেঙ্গে বলেছে ! তাহলে ত বুঝতেই পারছ, কেন আমি বাঙ্গলা শেখবার জন্যে বেছে বেছে ব্যানার্জ্জীকেই গুরু ধরেছি ; আমার শিক্ষাটা এখন তোমারই

কাজে লাগছে ত! কিন্তু এত বড় খাতা আর চিঠির বাণ্ডিলটা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শেষ করা ত বড় সোজা কথা নয়—অন্তত সাতটা দিন সময় লাগবে।

এলাই কহিল: তাতে কি, ব্যাগটি যেথানে ছিল তেমনি থাক; তুমি ওগুলো নিয়ে সরে পড়। তারপর পড়া হলে আমাকে ফিরিয়ে দিও, আমি আবার চুপি চুপি ঠিক জায়গায় রেখে দেব।

পিনাকী জিজ্ঞাসা করিল: যুক্তিটা খুবই ভাল, কিন্তু ব্যানার্জ্জী যদি এর মধ্যে ট্রাঙ্ক খুলে দেখে ডাকাতি হয়ে গেছে?

মুখখানা শক্ত করিয়া এলাই কহিল: খুলবে না, আমি বলছি। সে ভার আমার। আর, যদিই খোলে, তাতে কি হয়েছে? আমরা এ কাজ করেছি জানবে কি করে? তখন চোরাই মালগুলো তারই বইয়ের সঙ্গে এমন করে রেখে দেব যে, নিজেই অপ্রস্তুতের একশেষ হবে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে—এগুলো তুমি রাখবে কোথায়? তোমার ট্রাঙ্কে কিম্বা বইয়ের সঙ্গে রাখা ত ঠিক নয়!

পিনকী কহিল: রাখবার জায়গা আমার আছে, ব্যানার্জ্জীর বাবাও সে জায়গা থেকে তার জিনিস খুঁজে বার করতে পারবে না।

এলায়ের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চটুল হাসির ঝলকে সেই দৃষ্টিকে মদিরাময় করিয়া পিনাকীর পানে অপাঙ্গে চাহিল। আবার পিনাকীর মাথা ঘুরিয়া গেল এবং গুরুর উপদেশ ভুলিয়া আবেগভরে সে এলাইকে সবলে বুকের দিকে টানিয়া ভাবাদ্রস্বরে কহিল: তুমি দেখছি পাকা গোয়েন্দারও নাক কান কেটে দিতে পার ডার্লিং! এখন আমার নাক কাটার শোধ ত নিই—

সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি তাহার এলায়ের কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানির সহিত মিলিয়া গেল। এলাই কিন্তু এবার কোন প্রতিবাদ করিল না—বাধা দিতে হাতখানিও তুলিল না।

* *
*

সাতটি অহোরাত্রির মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত রহস্যময় ব্যাপারটির সহিত সংশ্লিষ্ট ইণ্ডিয়া কটেজের তরুণ তরুণীদের কর্ম্মপদ্ধতির রীতিমত ওলট-পালট হইয়া গেল এবং তাহাদের জীবন পথে নূতন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইল।

সত্যব্রতর খাতা ও চিঠিপত্র হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি আত্মসাৎ করিতে পিনাকী যে পরিমাণে সতর্ক ও সচেতন ছিল, এই ব্যাপারটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মেয়েটির প্রতি সেই পরিমাণে তাহার অবহেলা ও অসতর্কতা তাহাকে গুরুতর অসুবিধায় ফেলিল।

চতুর্থ দিনে পিনাকী সত্যব্রতর খাতা ও পত্রের তাড়া এলাইকে ফেরত দিয়া কহিল : ঠিক জায়গাটিতে রাখা চাই, যেমনটি ছিল।

এলাই হাসিয়া কহিল : আমাদের অদৃষ্ট ভাল, এ-ক'দিন ব্যানার্জ্জীর পাত্তাই নেই বললে হয়, কলেজের ত ছুটি; কিন্তু তবু কটেজে থাকতে দেখিনা, অনেক রাত করে ফেরে। কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে নিশ্চয়ই।

পিনাকী কহিল : তাহলে ত সুবিধাই হয়েছে, ফেরবার আগেই কাজটা শেষ করে ফেল।

এলাই তার সুনীল ও সুগোল দুটি চক্ষু-তারকা ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে কহিল: কথাটা কি ছিল শুনি? নিজের কাজটুকু বাজিয়ে নিয়ে কাজের কথা ত দিব্যি চাপা দিয়ে চম্পট দিচ্ছ, তারপর?

মুখে নৈরাশ্যের ভঙ্গি করিয়া পিনাকী কহিল: কাজের কিছুই হয় নি, তুমি যা ভেবেছিলে সেগুড়ে বালি! ব্যানার্জ্জী বেচারীর মাথা রাখবার ঠাঁই নেই কোন চুলোয়, বাপ ওর যাদুকরও নয় কিম্বা কোন রাজা জমিদারও নয়, বরং তাকে জুয়াচোর বলতে পার!

এলায়ের কণ্ঠ হইতে বিস্ময়-বিজড়িত স্বর বাহির হইল মৃদুভাবে: তাই নাকি?

পিনাকী কহিল: এত বড় পাজী ওর বাবা যে শুনলে তুমি ব্যানার্জ্জীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত করতে চাইবেনা মিস বাটারফ্লাই! ওর বাবা বিবাহিত হয়েও এদেশের এক বেচারীকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে যায়, তার পর তাকে খুন করে ফেরার হয়।

এলাই ভীতিকণ্ঠে কহিল: সর্ব্বনাশ, সেই খুনীর ছেলে এই ব্যানার্জ্জী? ওর মা তাহলে ইংরেজের মেয়ে?

পিনাকী কহিল: না, বিলেতে আসবার আগে দেশে যে মেয়েটাকে বিয়ে করে রেখে এসেছিল ওর বাবা, সেই মেয়েটিই হচ্ছে ব্যানার্জ্জীর মা। আর একটা কথা—ওযে মিষ্টার এস, এন, ব্যানার্জ্জীর নেফিউ ব'লে বড়াই করতো, সেটা একেবারে ভুয়ো; দেশে ওর চাল-চুলো কিছু নেই; আমি যে আগে বলতুম লোকটা মিথ্যার পাহাড়, সেইটিই খাটি কথা। কিন্তু সাবধান, যা শুনলে মুখে ছিপি এঁটে রাখবে, আমরা যে ওকে চিনিচি—সব কথা জেনেচি, জানতে যেন না পারে।

চোখে মুখে হাসির ঝলক তুলিয়া এলাই কাহল: বুঝেছি, জানাজানি হলে ব্যানার্জ্জী সামলে নেবে, তাকে জব্দ করে সুখ হবেনা। আচ্ছা, তাই হবে। তোমার ভয় নেই।—বলিয়াই সে চিঠির তাড়া ও খাতাখানি হাতের রুমালে আবৃত করিয়া চলিয়া গেল।

পিনাকীর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি তুখড় ছেলের মনে ঘুণাক্ষরেও কোনরূপ সন্দেহ হইল না যে—তাহার কথাগুলি এই মেয়েটী প্রত্যয় করে নাই বা ব্যানার্জ্জী সম্বন্ধে সংবাদটী তাহার ভালও লাগে নাই, এবং সেও মনে মনে সত্য নির্ণয় সম্বন্ধে একটা মতলব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে! চিঠির তাড়ার মধ্যে সত্যব্রতর দাদামহাশয় ও মিষ্টার জনসনের পত্রগুলি এবং কতিপয় 'কেবেলে'র প্রতিলিপির ভাষা যে ইংরাজী—কৌতূহলী মিস্ এলায়ের পক্ষে সেগুলি পড়িয়া সত্যব্রতর পিতার ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করা খুবই স্বাভাবিক—ইহাও পিনাকী উপলব্ধি করিবার সুযোগটুকু পায় নাই। উপরন্তু, সত্যব্রতর সত্যকার পরিচয়মূলক দলিল দস্তাবেজগুলি হাতাইয়া পিনাকী যে-সময় ইণ্ডিয়া কটেজ হইতে পরমোল্লাসে তাহার গাওয়ার ষ্ট্রীটের অজ্ঞাত আস্তানাটির উদ্দেশে যাত্রা করে—মিস্ এলাইও যে তৎকালে কৌতূহলাক্রান্ত অন্তরে তাহার পিছু লইয়াছিল—পিনাকীর সতর্ক দৃষ্টি তাহার কোন সন্ধান রাখে নাই। পরম প্রতিদ্বন্দ্বীর গুপ্ত রহস্যোদ্ঘাটনের আনন্দ যদি পিনাকীকে অতিমাত্রায় অভিভূত করিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে তাহার অজ্ঞাত আস্তানাটি নখদর্পণে ছকিয়া ফেলা এলায়ের পক্ষে কখনই সহজ হইত না। সম্ভবত, অপ্রত্যাশিতভাবে সাফল্যলাভের আনন্দোচ্ছ্বাসে পিনাকীর রাজনীতিক গুরুর উপদেশ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

সত্যব্রতকে কয়দিন সত্যই অতিশয় ব্যস্ত দেখা গিয়াছিল। এমন কি, থিয়েটারের পরদিন সত্যব্রতর সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র পিনাকী যখন উল্লাসের সুরে জানাইয়া দেয়—'বাবা টাকা পাঠিয়েছেন, তুমি এখন জ্যোতিষী ম্যাকের কাছে যেতে পারো'—এমন সুখবর শুনিয়াও সত্যব্রতকে বিশেষভাবে হর্ষোৎফুল্ল দেখা যায় নাই; মৃদু হাসিয়া শুধু একটি 'ধন্যবাদ' জানাইয়াই সে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পিনাকী তখন সত্যব্রতর সম্বন্ধে বিস্ময়াতঙ্কে ভাবিয়াছিল—কাগজপত্র চুরির ব্যাপারটা জানে নাই ত! কিন্তু পরক্ষণেই এলাই আসিয়া তাহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করে—'যা ভাবছ তা নয়, ব্যানার্জীর আর কিছু হয়েছে; কারুর সঙ্গে হয়ত ঝগড়া বাধিয়েছে, কিম্বা আর কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে; গতিক কিন্তু ভাল নয়। যাই হোক, তোমার এখন জোর বরাত,—কাগজপত্রগুলো পড়বার ফুরসদ পাবে, গোলমাল হবার ভয় নেই।'

পিনাকীর পিছু লইয়া তাহার গোপন আস্তানাটির সন্ধান পাইবার পর এলায়ের প্রধান কাজ হইল—সত্যব্রতর অনুসরণ করিয়া তাহার গতিবিধির রহস্যটি জানিয়া ফেলা। থিয়েটার রজনী হইতেই যে সত্যব্রত অত্যন্ত উন্মনা হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সত্য। ইহার মূলতত্ত্বটিও অত্যন্ত রহস্যময় এবং কৌতূহলোদ্দীপক। অভিনয়ের সময় দর্শকবৃন্দের মধ্যে দুইখানি অতি পরিচিত মুখ মঞ্চ হইতেই সত্যব্রতর চক্ষুকে আকৃষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রথম মুখখানি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সৌরীন্দ্রমোহনের দৌহিত্রী রেবা দেবীর। প্রেক্ষাগৃহের প্রায় পুরোভাগে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত দর্শকগণের পংক্তির মধ্যবর্তী

আসনখানিতে বসিয়া উভয় পার্শ্বের এমন দুইটি প্রিয়দর্শন যুবার সহিত সে হাস্যপরিহাস করিতেছিল—যাহাদের আকৃতি ও পরিচ্ছদে আভিজাত্যের নিদর্শন সুস্পষ্ট। সঙ্গীদ্বয় অবশ্য সত্যব্রতর অপরিচিত, তাহাদের পরিচ্ছদ উচ্চ পদস্থ ইউরোপীয়দের অনুরূপ হইলেও, সত্যব্রত লক্ষ্য করিয়াছিল—রেবার পরিধানে ছিল আসমানী রঙের একখানি বেনারসী, সাড়ীখানি দেখিবামাত্র ঝা করিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, এ রঙটিই রেবার অতিশয় প্রিয়। দ্বিতীয় মুখখানি সত্যব্রতর চক্ষুর উপর পড়িবামাত্রই তাহার মুখখানি বুঝি তৎক্ষণাৎ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল প্রখর দৃষ্টিতে সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছিল—কোনের দিকে একখানি আসনে বসিয়া অভদ্রের মত ক্ষুধিত দৃষ্টিতে যে লোকটি রেবার পানে ঘনঘন তাকাইতেছিল, সে আর কেহ নহে, তাহার ছাত্রজীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী—কুমার সিং। বিরামকালে সত্যব্রত রেবার সন্ধান করিতে ভুলে নাই। কিন্তু তৎকালে সে বা তাহার সঙ্গীরা প্রেক্ষাগারে না থাকায়, সত্যব্রতর পক্ষে এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। পরদিন আমন্ত্রিতদের তালিকার ভিতর হইতে বাঞ্ছিত লোক কয়টির নাম ঠিকানা বাহির করিবার জন্য সত্যব্রতর আগ্রহ ও উদ্যম প্রবল হইয়া উঠে কিন্তু সার্থক হয় নাই। তথাপি তাহার উৎসাহ বাধা পায় নাই; তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প—রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনেতার দৃষ্টিতে যে কয়খানি মুখ সে দেখিয়াছে, বিলাতের লোকারণ্যের ভিতর হইতে তাহাদিগকে বাহির করা চাইই। এদিকে এলাইও মনে মনে স্থির করিয়াছে—ব্যানার্জ্জীর মনের খবরটি যেমন করিয়া হৌক তাহাকে বাহির করিতেই হইবে।

* *

*

জুন মাসটি বিলাতে যেন বসন্তের রাজ্য। বিকালের দিকে সহরের বিভিন্ন পার্কগুলি নানা বয়সের নরনারীতে ভরিয়া যায়। সত্যব্রত ভাবিয়াছিল, রেবা যেখানেই থাকুক—পার্কে না আসিয়া পারিবে না। রেবার প্রকৃতির প্রতিটি রেখার সহিত সত্যব্রতর পরিচয় নিবিড়তম হইয়া আছে। রেবার মত মেয়ের পক্ষে লণ্ডন সহরে সুরম্য ও জনপূর্ণ পার্কগুলি অপেক্ষা প্রাকৃতিক শোভাসম্পদে পূর্ণ বিখ্যাত 'কিউ' উদ্যানটিই অধিকতর প্রীতিদায়ক হইবে জানিয়া সে তমসঃ তীরবর্ত্তী গভীর অরণ্যানীর মত গাম্ভীর্য্যময়ী বিরাট কিউ উদ্যানেই ভ্রমণ করিয়া থাকে। টেমস নদীর বাঁকে বাঁকে সহস্রাধিক বিঘা জমি ব্যাপিয়া এই বিশাল উদ্যানটি গভীর অরণ্যের আয়তন ধরিয়া অদূরবর্ত্তী মহানগরীর সহিত সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা করিবার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিস্তীর্ণ হরিৎ তৃণভূমির উপর বড় বড় অক্সাইড ও ডেজী ফুলের বাহার হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন সমগ্র ভূখণ্ডে আস্তৃত এক খানি সুন্দর কার্পেটের উপর রাশি রাশি ফুল বুনিয়া রাখা হইয়াছে। অদূরে রবার ও সিনকোনা গাছের চারাগুলি বায়ু হিল্লোলে দুলিতেছে। সরকারী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের নিকেতনটিও উক্ত উদ্যানে থাকায় সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এই সকল তৈয়ারী চারা ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে প্রেরিত হইয়া থাকে। চীনা প্যাগোডা এবং জাপানী তোরণ এই বিখ্যাত উদ্যানটির অন্যতম বৈশিষ্ট ;—বিলাত-প্রবাসী চীনা ও জাপানীদের নিকট কিউ উদ্যানের মর্য্যাদা প্রচুর। নদীর দিকে

অরণ্যের গভীরতা ও বিরাট গাম্ভীর্য্য অনেকেই যেমন সানন্দে উপভোগ করিয়া তৃপ্তি পান, পক্ষান্তরে এই বৃহৎ অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতা ও নির্জ্জনতায়—অন্ধকারের আবছাওয়ায় অনেক অনাচারও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শস্পাচ্ছন্ন হরিৎ প্রান্তরটির যে অংশ সরু হইয়া গভীর অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, এলাই আস্তে আস্তে সেই দিকের একটি ঝাউ গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া এক কাণ্ড করিতেছিল। কাণ্ডটিকে সোজা কথায় 'তুক' বা ভালবাসার পরীক্ষা বলাই সঙ্গত। বিলাতের যে-সব মেয়ে অল্প বয়সে প্রেমে পড়ে এবং প্রেমাস্পদের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেই প্রেমাস্পদ তাহাকে ভালবাসে কিনা—ফুটন্ত একটি ডেজী ফুল স্বহস্তে তুলিয়া তাহার পাপড়িগুলি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ব্যাপারটির গণনা করিয়া থাকে। এলাইও মনে মনে সত্যব্রতকে তাহার প্রেমাস্পদ সাব্যস্ত করিয়া ডেজী ফুলের সাহায্যে পরীক্ষায় আসিয়াছে। প্রথমেই সে খুব বড় আকারের একটি ফুল সযত্নে তুলিয়া তাহার প্রথম পাপড়িটি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে মনে মনে বলিল : He loves me, (সে আমাকে ভালবাসে), পরক্ষণে দ্বিতীয় পাপড়িটি ছিঁড়িয়া ঐ ভাবে বলিল : He loves me not (সে আমাকে ভালবাসেনা) এই ভাবে পরবর্ত্তী এক একটি পাপড়ি ছিঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যায়-ক্রমে 'ভালবাসে' ও 'ভালবাসেনা' বলিয়া আবৃত্তি করিয়া চলিল। ক্রমে পাপড়িগুলির সংখ্যা যতই কমিয়া আসিল, এলায়ের বুকের ভিতরটিও ততই ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। কারণ, শেষের পাপড়িটি ছিঁড়িবার সময় মুখের যে-শব্দটির সহিত তাহার মিল হইবে, তাহাই এই ফুলের

গণনার ফল। এখন তাহার অদৃষ্টে কি আছে, অর্থাৎ ব্যানার্জ্জী সত্যই তাহাকে ভালবাসে কিনা—তাহার হাতের ফুলটি এখনি তাহা বলিয়া দিবে; ফুলের এই গণনা মিথ্যা হইবার নয়, যেহেতু ইহা বহু পরীক্ষিত এবং অমোঘ সত্য। কিন্তু এলায়ের দুরদৃষ্টক্রমে ডেজীর শেষের পাপড়িটির সঙ্গে তাহার মুখের যে কথাটির মিল হইল তাহা যেন আর্ত্তনাদের মত শুনাইল—সে আমাকে ভালবাসে না! সঙ্গে সঙ্গে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময় সত্যব্রত এই পথ দিয়া অদূরবর্ত্তী জাপানী তোরণটির দিকে যাইতেছিল। নারীকণ্ঠের আর্ত্তস্বর তাহার গতি রুদ্ধ করিয়া দিল; মুখখানা ফিরাইয়া ঝাউকুঞ্জের দিকে চাহিতেই এলাই তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। সবেগে এলায়ের কাছে আসিয়া স্নেহের সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল: এলাই, তুমি কাঁদছিলে নাকি? ব্যাপার কি!

কোমল করযুগলে সত্যব্রতর দীর্ঘদৃঢ় হাতদুইখানি চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এলাই কহিয়া উঠিল: তবে নাকি তুমি আমাকে ভালবাস না ব্যানার্জ্জী?

এলায়ের কোমল মুষ্টি হইতে ডান হাতখানি ছাড়াইয়া এবং তাহার মাথার উপর রাখিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে সত্যব্রত কহিল: কে বললে মিস্ বাটারফ্লাই? আমি তোমাকে আমার দেশের মতই ভালবাসি। তার কারণ, তুমি আমার দেশকে ভালবাস, আমার দেশ তোমার জন্মভূমি।

উল্লাসের আবেগে এলাই কহিল: তাহলে নিশ্চয়ই আমি ডেজীর পাপড়ি গণতে ভুল করেছি। আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাস

ব্যানর্জ্জী, ভাগ্যিস্ তুমি এসেছিলে—তাই আমার গণনার ভুলটা ধরা পড়ে গেলো। কিন্তু আমিও এর প্রতিদান দেব তোমাকে ব্যানার্জ্জী, তুমি একেবারে চমকে উঠবে, তোমার চোখ খুলে যা'বে; তোমার সামনে আমি একটা সয়তানের মুখোস খুলে দিচ্ছি,—এই দেখো—

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই এলাই তাহার ব্লাউজের ভিতর হইতে কাগজের একটা পুলিন্দা বাহির করিল।

ডেজী ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া প্রণয়পাত্রের প্রণয়-পরীক্ষার গণনার কথা সত্যব্রত ইংরেজ কবির কবিতায় পড়িয়াছে, কিন্তু এযুগেও যে ইংরাজ কন্যারা ডেজী ফুলের সাহায্যে প্রণয়ভাগ্য পরীক্ষা করিতে অভ্যস্ত—তাহা সে জানিত না। কাজেই এলাইয়ের কথাগুলির অর্থ প্রথমে সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। পরক্ষণে তাহার কথার উচ্ছ্বাস, মুখ চোখের ভঙ্গি এবং পদতলে বিচ্ছিন্ন ডেজীর পাপড়িগুলি দেখিয়া ঝা করিয়া কবির কথাটা মনে পড়িয়া গেল, অমনি বিরক্তিতে তাহার মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল কিন্তু ঠিক সেই সময় এলায়ের হাতের পরিচিত পুলিন্দাটি সত্যব্রতর দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর কুঞ্চিত দৃষ্টিকে বিস্ময়াহত ও বিস্ফারিত করিয়া দিল। সবেগে এলাইয়ের হাত হইতে পুলিন্দাটি ছিনাইয়া লইয়া তীক্ষ্ণ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল: এগুলো তুমি কোথা থেকে বা'র করেছ শুনি?

সহজ কণ্ঠেই এলাই উত্তর দিল: সেই কথাই বলতে এসেছি। থিয়েটারের দিন পিনেস মশাই তোমার ট্রাঙ্ক খুলে এগুলি নিয়ে তাঁর গাওয়ার ষ্ট্রীটের অজ্ঞাত বাসায় নিয়ে যান। আমি তাঁর পিছু নিয়ে সেখান থেকে উদ্ধার করে এনেছি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এলাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সত্যব্রত প্রশ্ন করিল : সত্যি বলছ ?

ব্লাউজের ভিতর হইতে দলিলের মত ভাঁজকরা কতিপয় কাগজ বাহির করিয়া এবং সেগুলি সত্যব্রতর হাতে দিয়া এলাই কহিল : এই কাগজগুলো পড়ে দেখ আগে ; এরাই তোমার কথার জবাব দেবে। পিনেসের সেই গোপন বাসা থেকে চুরি করে এনেছি। তিন দিন ওর পিছু নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখেছি—ঘরে ঢুকেই বিড় বিড় করে বড় কাগজখানা সে পড়ে, তার পর মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখে। আগে পড়ে দেখ, ওতে কি আছে।

সত্যব্রত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল : আমার ট্রাঙ্ক থেকে কাগজ পত্র চুরি করেছিল বলে, তুমি তার পিছু নিয়ে আস্তানাটি খুঁজে বার করে তার নিজের কাগজ পত্রগুলোও চুরি করে এনেছ—ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার ত ! কিন্তু এতে তোমার কি লাভ ? এ রকম দুঃসাহসিক অভিযান তুমি করেছিলে কি উদ্দেশ্যে শুনতে পাই ?

গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি সত্যব্রতর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া এলাই কহিল : আমাদের কটেজের 'প্রেষ্টিজ' বজায় রাখবার জন্যেই এর আবশ্যক হয়েছিল। আর—চোরের ওপর এ ভাবে বাটপাড়ি করেছি কেন, এর জবাব হচ্ছে মিষ্টার ব্যানার্জ্জী—তোমার জন্যে। প্রাণখুলে তুমি যাকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত আছ, সে যে কত বড় দমবাজ আর মিথ্যাবাদী—তোমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য। এগুলো ছাড়া আরো একটা উদ্দেশ্য আছে মিষ্টার ব্যানার্জ্জী, এই পিনেস লোকটি আসলে কি—সেটি জানবার কৌতূহল।

এলায়ের কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই সত্যব্রত পিনাকীর গুপ্ত দলিল পত্রগুলির পাঠোদ্ধারে মনোযোগ দিয়াছিল। পিনাকীর পিতার লিখিত পত্রাকারে সেই বিখ্যাত দলিলখানি—পিনাকী প্রত্যহ যাহা ধর্ম্মগ্রন্থের মত শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়া থাকে—অল্পায়াসেই তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গেল। পরবর্তী পত্রখানিতে 'পলিটিক্স' শিখিবার নির্দ্দেশটিও সে সাগ্রহে পাঠ করিল। ফলে, সত্যব্রতর নিকট পিনাকীর কথিত তাহার 'সংসারত্যাগী যোগী পিতাটি'র সত্যকার পরিচয়টিও সুস্পষ্ট হইয়া গেল। রামদুর্গ রাজ্যে স্বল্প কয় দিন থাকিয়াই সত্যব্রত অসাধু দেওয়ান বনোয়ারীলালের কাহিনী শুনিয়াছিল। কিন্তু সেই লোকটিই যে পিনাকীলালের পিতা এবং নিয়তির রহস্যময় নির্দ্দেশে এই ভারতীয় রাজ্যটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পরস্পরের অজ্ঞাতে তাহারা উভয়ে লণ্ডনের একই আশ্রয়স্থল হইতে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে—অদূর ভবিষ্যতে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য...এত বড় গুপ্ততথ্যটি উদ্ঘাটিত করিয়া দিল এই কয়খানি সাংঘাতিক পত্র। হয় ত এই দলিলগুলি এলাইয়ের মত তাহার কাছেও দুর্ব্বোধ্য থাকিত যদি না রামদুর্গ রাজ্যের বিচক্ষণ দেওয়ানজীর নির্দ্দেশে ঐ বিভাগের কতিপয় বিশিষ্ট প্রাদেশিক ভাষা স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিতে সমর্থ না হইত। এই সঙ্গে সুস্পষ্ট হইয়া গেল পিনাকীর বাঙ্গালী-বিদ্বেষের মূলতত্ত্ব এবং সত্যব্রতর নিকট শিষ্যত্ব স্বীকারের রহস্য। নিজের দিকে চাহিয়া সত্যব্রত দেখিল, প্রয়োজন ও সুযোগের অনুরোধে সে হয়ত অনেক স্থলে সত্যকে এড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু সত্যাশ্রয়ী বলিয়া সুপরিচিত পিনাকী সত্য

বস্তুটিকে যেভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া মিথ্যার পথে পাড়ি দিয়াছে—সত্যনিষ্ঠার তাহা এক বিচিত্র নিদর্শন বটে !

এলাই এতক্ষণ ঔৎসুক্যের সহিত সত্যব্রতর মুখের খেলাগুলির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল এবং মনের উদগ্র কৌতূহলকে সে বুঝি জোর করিয়াই চাপিয়া রাখিয়াছিল। এই সময় তাহার সহিত সত্যব্রতর চোখোচোখি হইতেই সে পিনাকীর কাগজপত্রগুলি এলায়ের হাতে দিয়া কহিল: এগুলোর ভিতর থেকেই আমি পিনাকীর জীবন-রহস্য জানতে পেরেছি এলাই। কিন্তু এখন কথা এই, তার কাগজপত্রগুলোর গতি কি হবে ?

এলাই কহিল: এর জন্য তোমার আর কোন ভাবনা নেই ব্যানার্জ্জী, যেমন চুপি চুপি সরিয়ে এনেছি, ঠিক তেমনি করেই রেখে আসবো। তোমার জিনিস ত তুমি পেয়েছ, তবে আর কি ! হ্যাঁ, একটা কথা শুধু—পিনেস যাতে কোন রকমে জানতে না পারে যে—

সত্যব্রত কহিল: তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার এলাই, আমার মুখ দিয়ে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বেরুবে না। তুমি যে এই লোকটার মুখোসখানা খুলে দেখবার সুযোগ আমাকে দিয়েছ এলাই, এর জন্যে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর তোমার পিনেসের সত্যকার যে পরিচয়টি পেয়েছি, তোমাকে জানানো আমি কর্ত্তব্য মনে করছি শোন :—এর বাবা ভারতবর্ষের একটি বড় রাজ্যের মাথা। ঐ রাজ্য থেকে তিনি এত অর্থ সঞ্চয় করেছেন, যাতে আর একটা রাজ্য কেনা যায়। ইংলণ্ডে যতগুলো ব্যাঙ্ক আছে প্রত্যেকটাতেই তাঁর টাকা খাটছে। পিনাকী এখানে খুব সাধারণ ভাবে থাকে বটে, কিন্তু ও

নিজেই লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের মালিক। একদিন পিনাকীই হয়ত ঐ রাজ্যের রাজা হবে। যদি রাজরাণী হবার সাধ তোমার থাকে এলাই, তাহলে পিনাকীর ওপর নজর রাখো। ওকে বেঁধে ফেলো এখন থেকেই।

সত্যব্রতর কথাগুলি যেন মন্ত্রের মত এলাইকে বিহ্বল করিয়া দিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল যে, পিনাকীর মত এই ছেলেটি তাহাকে বাজে কথা বলিয়া ধাপ্পা দেয় নাই, কথাগুলি তাহা হইলে সত্য ; পিনাকীর বাবা তবে সত্য সত্যই কোন ছাইমাথা সাধুবাবা নয়—তিনি একটা রাজ্যের মাথা আর পিনাকী সেই রাজ্যের······কথাগুলিই ভাবিতে অপ্রত্যাশিত একটা আনন্দের আবর্ত্তে এলাইয়ের মাথা বুঝি ঘুরিয়া গেল, চক্ষুর উপর একটা উজ্জ্বল ছবি ভাসিয়া উঠিল :—যেন মস্ত এক মিছিল চলিয়াছে, মিছিলের মধ্যস্থলে মণিরত্নে সুসজ্জিত এক অতিকায় হাতী—তাহার পীঠে সোণার সিংহাসন, সেই আসনখানি পূর্ণ করিয়া বসিয়াছে রাজবেশে মিষ্টার পিনেস, আর তার পাশে রাজরাণীর পরিচ্ছদ পরিয়া যে সুন্দরী মেয়েটি বসিয়া আছে, সে আর কেহ নয়—সে মূর্ত্তি মিষ্টার পিনেসের 'বাটারফ্লাই' এলায়ের !

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ ! পিনাকীর অপহৃত কাগজপত্রগুলি যে এখনো তাহার সঙ্গে রহিয়াছে। অমনি সে সবেগে একেবারে সত্যব্রতর প্রায় বুকের কাছে গিয়া ভাবার্দ্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মিনতির সুরে কহিল : তাহলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি মিষ্টার ব্যানার্জ্জী ?

এলাইয়ের মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া

স্নেহার্দ্রস্বরে সত্যব্রত উত্তর করিল : অন্তরের সহিত। ঘটনাচক্রে যদি কোন দিন তোমাকে আমার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয় পিনাকীর জন্য, তথাপি আমার দিক থেকে কোন ক্ষতি তোমার হবে না মিস বাটারফ্লাই!

গুড ইভ্‌নিং মিষ্টার ব্যানার্জ্জী!

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মেয়েলিস্বরে এই সম্ভাষণ শুনিয়াই সত্যব্রত মুখখানি তুলিয়া সামনের দিকে চাহিতেই দেখিল, কেতা দুরস্ত ভাবে এদেশীয় সান্ধ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত লম্বা ছিপছিপে গৌরবর্ণ এক যুবা মাথার টুপিটি বামহাতে ধরিয়া ডান হাতখানি বাড়াইয়া তাহাদের প্রায় সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছেলেটির চোখ দুটি ঈষৎ কটা ও ঘোলাটে হইলেও তাহার ভিতরে বুদ্ধির একটা দীপ্তি এবং দৃষ্টিশক্তির আলো যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। সমস্ত মুখখানা এমন একটা বিচিত্র হাসিতে ভরিয়া আছে যাহার আভা মনে আনন্দ না জাগাইয়া তিক্ততায় বিষাইয়া দেয়। হাসিরও একটা রূপ আছে এবং হাসির বহু রূপ সত্যব্রত দেখিয়াছে, কিন্তু সুন্দর মুখের হাসির এমন হিংস্র রূপ বুঝি সে এই প্রথম দেখিল।

এই সময় সত্যব্রতর ডান হাতখানা মিস্ এলাইয়ের মাথার উপরে ছিল এবং তাহার বাম হাতখানি দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়াছিল এলাই। উভয়ের অবস্থা ও অবস্থিতি অন্যের চক্ষুতে দৃষ্টিকটু হইলেও সত্যব্রত সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই ঘাড় নাড়িয়া প্রত্যাভিবাদনে 'গুড ইভনিং' বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। এ মুখ সে যেন কোথায় দেখিয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁ করিয়া মনে

পড়িয়া গেল—অভিনয়-রাত্রিতে রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠ হইতে রেবাদেবীর দুই পার্শ্বে যে দুইটি যুবকের মুখ সে দেখিয়াছিল, আগন্তুক তাহাদেরই একজন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলিবার আগে মুখের হাসিটা আরো তীক্ষ্ন করিয়া আগন্তুকই বলিল: বুঝতে পেরেছি, আপনি খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছেন হঠাৎ আমি এভাবে এখানে এসে পড়াতে—

আগন্তুকের হাসি সত্যব্রতর ভালো লাগে নাই, কথাগুলিও বুঝি তাহার নির্ম্মল অন্তরে সূচের মত বিধিল; তাই তাহাকে কথাটা সমাপ্ত করিবার অবসর না দিয়াই তীক্ষ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল: আলাপ করতে এসে এমন করে খোঁটা দিয়ে কথা বলচেন কেন বলুন ত? এটা যখন পার্ক—পাবলিক প্লেস, আপনি আসাতে বিব্রত হব কেন?

আগন্তুক হাসিয়া কহিল: তাহলে আপনি চটছেন কেন, স্যর?

সত্যব্রত উত্তর করিল: আমি চটিনি, আপনার কথাটার প্রতিবাদ করছি।

পূর্ব্ববৎ হাসিয়া আগন্তুক কহিল: আচ্ছা আমি মেনে নিচ্ছি যে হঠাৎ এখানে আসাতে আপনি বিব্রত হন নি এবং চটেও যান নি। এখন দয়া করে শুনবেন কি—কেন আমাকে আসতে হয়েছে আপনাদের এই সুন্দর সান্ধ্য আনন্দে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে? … চিবাইয়া চিবাইয়া কথাগুলি শেষ করিয়া চটুল দৃষ্টিটি মিস্ এলাইয়ের মুখের উপর বুলাইয়া পরক্ষণে সত্যব্রতের মুখে নিবদ্ধ করিল সে।

বক্তার অভদ্র দৃষ্টি সত্যব্রতর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, মুখখানা

শক্ত করিয়া সে কহিল : আপনার কথার ভঙ্গি থেকে বুঝতে পারছি, আপনি আমাকে চেনেন আর কোন উদ্দেশ্য নিয়েই দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে আমার সঙ্গে এই মেয়েটিকে দেখেই আপনার মনটি বিকৃত হয়ে গেছে। আপনার গায়ে এদেশের অভিজাত-শ্রেণীর যোগ্য আধুনিক পরিচ্ছদ থাকলেও রুচিটা কিন্তু একেবারে সেকেলে। নিশ্চয়ই আপনি এদেশে নবাগত ?

এরূপ শিষ্ট আঘাতেও বক্তার মুখের হাসি ম্লান হইয়া গেল না, বরং আরও তীক্ষ্ণতর হইল। হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া সে কহিল : ঠিক ধরেছেন, আমি নতুনই এসেছি; তবে বিলেতে আসা যাওয়াটা আমাদের বংশের পক্ষে ওদেশের তুলনায় এপাড়া ওপাড়া বেড়িয়ে আসার মতই সোজা হয়ে গেছে। আমার বাবা, কাকা, দাদারা সবাই বিলেতের গ্র্যাজুয়েট, আমিই কেবল নজির ভেঙেছি। কলকাতার প্রেসেডেন্সী কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে এই প্রথম এসেছি বিলেতে—

আপনার নামটি দয়া করে বলবেন ?

নাম বললে ত আপনি চিনবেন না। তবুও জিজ্ঞাসা যখন করেচেন—জবাব না পেলে হয় ত আপনার মন আবার বিগড়ে যাবে। এলাহাবাদে থাকতে আপনি বোধ হয় আই এম্ এস্—ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জ্জীর নাম শুনে থাকবেন—

সত্যব্রত বলিল : জষ্টিস স্যর সৌরীন্দ্র মোহনের আত্মীয়, বুয়ার ওয়ারে যিনি আফ্রিকায় গিয়েছিলেন—

বক্তা বলিল: হ্যাঁ, আমি তাঁরই নাতী। আমার বাবাও

এক আই, এম, এস। আমার মেজদা স্তর সৌরীনের এক নাত্নীকে বিয়ে করেছেন, তাঁর নাম হীরেন চ্যাটার্জ্জী—বিলেতে এসেছেন ডাক্তারী পড়তে, আমার নাম নৃপেন; আমি আই, সি, এস হবার আশা করি। মাত্র হপ্তা খানেক হোল আমরা লণ্ডনে এসেছি।

মৃদু হাসিয়া সত্যব্রত বলিল: আপনাদের নাম ও মোটামুটি বৃত্তান্ত আমার জানা ছিল, তবে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। খুবই সুখের কথা যে আপনারা বিলেতে এসেছেন, আমাদের দলপুষ্টিই হোল—

কথার সুর অনুরূপ করিয়া নৃপেন বলিল: কিন্তু আমার মুখে ব্যাপারটা শুনলে আপনি হয়ত সুখী হবেন না!

কেন বলুন ত?

স্তর সৌরীন্দ্রমোহন রিটায়ার্ড করচেন, এবং বিলেতে এসেছেন তাঁর নাতনী রেবা দেবীকে নিয়ে, তিনিও কেমব্রিজে বি-এ পড়বেন।

সত্যব্রত বলিল: আপনি তো দেখছি সুসংবাদই এনেছেন, এতে দুঃখিত হবার কি আছে?

মুখের হাসিটুকু সহসা সম্বরণ করিয়া নৃপেন উত্তর করিল: ব্যাপারটা শুনলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু আপনার এই বান্ধবীর সামনে সেটা বলা শোভন হবে কি?

কথাটা বলিয়াই সে মিস্ এলাইয়ের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু এলাই এ ব্যাপারে কিছুমাত্র দমে নাই, বরং তাহাকে বেশ কৌতূহলীই দেখা যাইতেছিল। ইহাদের বাংলা ও ইংরাজীতে মিশ্র সংলাপ হইতে মোটামুটী ভাবে সে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছে যে,

নবাগত ব্যক্তিটি মিষ্টার ব্যনার্জ্জীর অপরিচিত হইলেও সে তাহাকে চেনে এবং এভাবে নির্জ্জন স্থানে বিদেশিনী মেয়েটীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছে। তাই সে খপ্ করিয়া ইংরাজীতে বলিয়া ফেলিল: আমি তাহলে কটেজে যাই মিষ্টার ব্যনার্জ্জী?

তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এলাই ব্যানার্জ্জীর হাত খানি ছাড়িয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই প্রশ্ন বোধ হয় সত্যব্রতর আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। সে অমনি হাত বাড়াইয়া খপ করিয়া এলাইয়ের একখানা হাত ধরিয়া দৃঢ়ভাবে বলিল: না, কি হয়েছে যে তুমি চলে যেতে চাইছ মিস এলাই—থাকো এখানে।

পরক্ষণে নৃপেনের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু তিক্ত কণ্ঠেই সে বলিল: দেখুন মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী, গোড়াথেকেই আপনি আমাকে যেন বেঁকা চোখে দেখেচেন মনে হচ্ছে। সম্ভবত এই মেয়েটি আমার সঙ্গে থাকাতেই আপনি এমন একটা কিছু সাব্যস্ত করে নিয়েছেন যেটা আমার অনুকূল নয়। কাজেই, আপনাকে জানানো আবশ্যক মনে করচি যে, এই মিস এলাই আমাদের কটেজের ল্যাণ্ডলেডী মিসেস ফ্রাণ্ডাসের মেয়ে—আমার ছোট বোন এক হিসাবে।

মুখখানার এক বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া নৃপেন বলিল: এখানকার অনেক ল্যাণ্ডলেডী আর তাদের বাড়ীর মেয়েদের গল্প আমি জানি মিষ্টার ব্যানার্জ্জী। এই মেয়েটির সঙ্গে আপনার যে সম্বন্ধই থাক, আজ আমরা যেটা দেখেছি তাতে কিন্তু খুসী হতে পারিনি। তাহলে বলি শুনুন—রেবাদেবীও আমার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন—

বাধা দিয়া সত্যব্রত বলিয়া উঠিল : রেবা এসেছিল নাকি ? কিন্তু কোথায় গেল সে ?

নৃপেন বলিল : সেই কথাইত বলছি আপনাকে, শুনুন না দয়া করে। আমরা ঐ লনটার ধারে ঝাউগাছের নিচেয় পাতা বেঞ্চিটায় বসেছিলাম। হঠাৎ আপনাকে দেখেই রেবা এইদিক ছুটে আসেন, বুঝতেই পারছেন—আমিও তাঁর পিছু নিয়েছিলাম। পরের কথা আর নাইবা শুনলেন।

সত্যব্রত বলিল : তাহলে রেবাও আমাকে ভুল বুঝেছে—এই কথা আপনি আমাকে বোঝাতে চান ?

নৃপেন বলিল : ভুল বুঝেছেন কিনা তিনিই জানে, তবে আমাকে যে কথা বলেছেন আপনাকে আমি তা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—যদি আপনি শোনেন।

মুখখানা শক্ত করিয়া সত্যব্রত বলিল : রেবার কথা অন্যের মুখে শোনবার প্রবৃত্তি আমার নেই মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী, তার যা জানাবার সে যেন নিজের মুখে আমাকে জানায়।

সত্যব্রতর কথাগুলি বুঝি নৃপেনকে স্তব্ধ করিয়া দিল। কথাটার উত্তর যে এমন ভাবে তাহার তরফ হইতে আসিবে তাহা সে ভাবে নাই। বদ্ধ দৃষ্টিতে মিনিট খানেক সত্যব্রতর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে কহিল : তাহলেও তাঁর কথাটা আমাকে বলতে হচ্ছে, দয়া করে শুনুন—স্যর সৌরীন্দ্রমোহন বা তাঁর নাতনী রেবা দেবীর সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আপনি যেন আর কৌতূহলী না হন। যোগাযোগের যে বন্ধনটী রেবাদেবী নিজেই ছিঁড়ে দিয়ে গেলেন, আপনি যেন আর

ঘোড়াতালি দিয়ে সেটা সেলাই করতে বৃথা হাত বাড়াবেন না। আমার আর কিছু বলবার নেই—এখন গুডবাই।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই নৃপেন ঠিক যেন চপল বালকের মত ছুটিবার ভঙ্গিতেই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল—যাহাতে সত্যব্রত তাহার কথার প্রতিবাদে কিছু বলিবার সুযোগটুকুও না পায়।

প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না সত্যব্রতর। তাহার চক্ষুর উপর তখন ছায়া-ছবির মত পর পর ভাসিয়া যাইতেছিল কতকগুলি পরিচিত মুখ, ওই সঙ্গে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল তাহাদের প্রকৃতি ····· রেবা, স্যর সৌরীন্দ্রমোহন, নবাগত মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী—এমন কি ছাত্রজীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী কুমারসিং, মিস্ এলাই, পিনাকী······তাহার মনে হইতেছিল প্রত্যেকের মুখেই যেন হিংসার আভা জ্বল জ্বল করিতেছে।

"হিংসা ও অহিংসার" পরবর্ত্তী অংশ স্বতন্ত্র খণ্ডে মুদ্রিত হইতেছে। পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যাঁহারা এক টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া নাম রেজিষ্টারী করিয়া রাখিয়াছেন দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইবামাত্র তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

আর, চ্যাটার্জ্জী
হিংসা ও অহিংসার প্রকাশক।